



အမေရိက မြန်မာ

ဝိဇ္ဇာသင်တန်း



মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মণ্ডু থেকে আকিয়াব হয়ে দেশটির যতই গভীরে যাবেন প্রকৃতি ও সমাজের সৌন্দর্যে ততই বিমুগ্ধ হবেন। আয়তনের তুলনায় দেশের জনসংখ্যা কম। নারী-স্বাধীনতা বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। ব্যবসার এক বিশাল পরিসর জুড়ে নারীর কর্তৃত্ব। আর সর্বত্র তারা নিরাপদ, কুমারীত্ব হরণের ভয়ে তটস্থ নয়, ফুটফুটে বালিকারাও দৈহিক শ্রম দেয় পথে-প্রান্তরে, পাহাড়-অরণ্যে, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল তাদের চলাফেরা, মেয়ে বা ছেলে প্রাণের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে না কোথাও কখনও। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী হতে পারে, কিন্তু খুন-খারাবি বা ফতোয়াবাজি নয়, চুরি-রাহাজানিও না। অং সান সুচি কেমন আছেন? কেমন করে তিনি এত বিশাল ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন? সামরিক শাসনে বর্মীরা কি সুখী? সংখ্যালঘু সমস্যা, পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতা এসবের হাল-হকিকতাই-বা কি? কৃষি, পাখি ও পশুসম্পদ কেমন? মিয়ানমারের খাদ্যাভ্যাস? সোনা, মূল্যবান পাথর, কেনাকাটা ও বিদেশীরা? দেশ দেখার সূত্রে দেশের এইসব সুলুক-সন্ধান আর অত্যাশ্চর্য সব প্যাগোডার সৌন্দর্যসুধা পান করেছেন লেখক। লেখকের স্বপ্ন ও নিসর্গদর্শন, ভালোবাসা ও যৌবনবন্দনা, রাজা-রাজড়া কিন্নরী-অঙ্গরী এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রেঙ্গুন সব মিলিয়ে রূপ-অরূপ, বাস্তব-পরবাস্তবের ব্যতিক্রমী দেশালেখ্য অপরূপ মিয়ানমার, ভিন্নতর এক ভ্রমণগাথা।



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

অপরূপ মিয়ানমার

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

সাহিত্য প্রকাশ



প্রচ্ছদ-শিল্পী : অশোক কর্মকার
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০০৬, আষাঢ় ১৪১৩
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, ফাল্গুন ১৪০৯
ISBN 984-465-336-3

মূল্য : একশত পঁচাত্তর টাকা

প্রকাশক মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
হরফ বিন্যাস কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

উৎসর্গ

মুইন থি

মা তি ডা

মা তা না

টে টে

খিন থিডা টুন

সাগরিকা বড়ুয়া

পামেলা বড়ুয়া

এই ভ্রমণকাহিনী ঐশ্বর্যশালী-করা

বর্মী-বাঙালি রমণীরত্ন

জু মি কা

মিয়ানমারের সামাজিক বন্ধন ও রীতি এক অদৃশ্য সূত্রে গভীরভাবে আবদ্ধ ও স্বাভাবিক। সামরিক শাসনে এত বছর ধরে দেশটি শৃঙ্খলিত হলেও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষয় সেখানে তীব্র হয় নি এখনও, সমাজবিদরা এর জন্য ধর্মীয় বন্ধনকে উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন—জ্ঞানি না তা কী করে এখনও অটুট থাকা সম্ভবপর হল। মিয়ানমারের পথে-ঘাটে কোথাও অশালীন কিছু আমার চোখে পড়ে নি। সিটউইতে নদীর ধারে সন্ধ্যায় তরুণ-তরুণীদের অন্তরঙ্গ হয়ে বসে থাকতে দেখেছি কিন্তু অশালীন কিছু দেখি নি। আমি ভেবে অবাক হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি—বইপত্র পড়ে ও কাউকে কাউকে প্রশ্ন করে জেনেছি এটিই মিয়ানমারের জন্য স্বাভাবিক।

মংডু থেকে সড়ক ও জলপথে সিটউই বা আকিয়াব, সিটউই থেকে আকাশপথে ইয়ানুন কম পথ নয়। সেই ইয়ানুন শহর থেকে সড়ক পথে ভোরে যাত্রা করে শেষ বিকেলে পৌঁছেছি চেকটিউর পাহাড় শীর্ষে, প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজপুরীতে—সেখানে গোল্ডেন রক প্যাগোডায় মেঘ-বৃষ্টি-হাওয়ার দিগ্বালিকা বা আকাশ সুন্দরীদের দেখা কি এত সহজ সৌভাগ্যের! শিল্প-সংস্কৃতির শহর মান্দালয়ের আশ্চর্য-সুন্দর প্যাগোডাগুলো এখনও আমাকে শিহরিত করে ও স্বপ্ন দেখায়। প্রাচীন শহর মিথিলা ঘুরে আবার ইয়ানুন ফিরে আসা, একটানা ৪৯ ঘণ্টা ভ্রমণ করেও অস্বাভাবিক বন্যার কারণে পাগান (বাগান) না দেখে প্রত্যাবর্তন কত মর্মবেদনার! পথে পথে অজস্র রেস্টুরাঁ বা প্যাগোডায় মিয়ানমারের রমণীকুলের আতিথেয়তা কী করে ভুলি?

শাক্যমুনি বুদ্ধকে তারা ভক্তি-ভরে কত বিচিত্র ও বর্ণময় করে জীবনধারার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে তা চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না। অজস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবিকা ও জীবন ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলে। পালি ভাষার চর্চা তারা অব্যাহত রেখেছে গভীর অনুরাগে।

শোয়েডাং প্যাগোডাকে মিয়ানমারবাসী বলেন বিশ্বের চতুর্দশ বিস্ময়। বাকি তেরোটোর একটিও আমি দেখি নি, শোয়েডাং দেখে আমি একই সঙ্গে ওই তেরোটাকে দেখেছি ও বিস্ময় উপলব্ধি করেছি। এত জাঁকজমক, এত শাস্ত ও সমাহিত, এত বিস্ময়কর ও কল্পনাপ্রসারী যে শুধু মুগ্ধই হয়েছি। একবারে শোয়েডাংর কিছুই দেখা হয় না, দশ-কুড়ি পৃষ্ঠার বর্ণনায় কিছুই বলা হয় না—সেই অর্থে আমার দেখাও অসম্পূর্ণ। অন্যসব প্যাগোডাও এভাবে আমার চোখে দেখতে পাবেন। প্যাগোডার আশপাশের তরুণী ও তরুণদের কলহাস্য শুনতে পাবেন, কিনুরীদের দেখবেন, ওদের প্রাণ-প্রাচুর্য ও জাড্যতা আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে, অথৈ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে, তবে সেখান থেকে অক্ষত ফিরে আসতে পারি নি।

মিয়ানমারের অনুজ্জ্বল বা কালো দিকটার চেয়ে তার উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় দিকটাকে আমি দেখার চেষ্টা করেছি বা দেখতে পেয়েছি। আমার আনন্দময় অনুভবকে দিয়েছি প্রাধান্য, অথবা বলা চলে আমার বাড়ির পূর্ব দিকের পড়শিকে দেখা দীর্ঘকালের লালিত স্বপ্নপুরাণকে তুলে ধরেছি। কাজেই আমার ব্যর্থতা আমার প্রতিবেশীকে না জানা ও চেনার ব্যর্থতা।

মিয়ানমারের ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে এই দেখার সুযোগ পেয়েছি, কাজেই তাদের নির্ধারিত স্থানগুলোই আমাদের দেখতে হয়েছে। আমি কখনও ভুলি নি যে এই সুযোগ আমার জন্য কত বড় পাওনা ও সৌভাগ্য, অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা মিয়ানমার সরকার ও জনগণের প্রতি—সক্সে সত্তা সুখিতা হজু।

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪০৯

ঢাকা

বিশ্বদাশ বড়ুয়া

হাসি কুড়িয়ে মংডুর পথে

সন্ধের আলো-আঁধারিতে, ২৪ মে, ২০০১, মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে আমার নোখ, চোখ, কান ও হৃদয় অচেনা এবং নিজের কাছে বিভ্রান্তিকর আবেগে উপচে পড়ল। দলের কোনো রকম শাসন সে মানতে চাইল না। আমি এই হঠাৎ-পাওয়া আবেগ-সম্পদে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম যা থাকে কপালে বলে। আমি জানি না ঘরের পাশের চুল-খোলা তব্বী তরুণী-যুবতীদের কথা বলব নাকি আমার কৌমার অনুভবের কথা বলব। অথবা রাস্তায় হেঁটে যাওয়া মানুষদের নিয়ে আমার আবেগ, অনুভব ও ভালোবাসা জেগে ওঠার কথা চেপে যাব। জানি না।

মংডু আমাদের টেকনাফের ওপারে। মাঝখানে নাফ নদী। মংডু বার্মার পশ্চিম সীমান্তের শহর। ব্রিটিশ যুগের বহু আগে থেকেই চট্টগ্রামের সঙ্গে তার যোগাযোগ। কখনো ছিল, কখনো নিরবচ্ছিন্ন। পাদরি মেস্ট্রো সেবাস্টিন মানরিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পথে 'দ্য ল্যান্ড অব গ্রেট ইমেজে'র দেশ অর্থাৎ বার্মা বা মিয়ানমার এসেছিলেন। তিনি ছিলেন পর্তুগালের খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। ১৬২৯ সালে কোচিন থেকে যাত্রা করে সে-বছর জুন মাসে তিনি হুগলিতে পৌঁছেন। সেপ্টেম্বর মাসে আরাকান যাত্রা করেন। তারও একশ' বছর আগে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদের বসতির জায়গাকে ব্যাভেল বলত। চট্টগ্রামে এখনো ব্যাভেল রোড তাদের স্মৃতি বহন করছে। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান যাওয়ার পথে মানরিক বাঘের পাল্লায় পড়েছিলেন। এই পর্তুগিজরা পরে আরাকানের রাজার নৌ-সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় এবং কেউ কেউ স্বাধীনভাবে জলদস্যুবৃত্তি করত বাংলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে। এরা স্থানীয় মেয়ে-পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বানাত। তাদের অত্যাচারে চট্টগ্রাম ও বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। চট্টগ্রামের কবি আলাওলের পিতা ফিরিজি জলদস্যুদের হাতে নিহত হন। আলাওল কয়েকবার সেই কথা লিখেছেন

কার্যহেতু পশ্চক্রমে আছে কর্মলেখা।

দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ॥

বহু যুদ্ধ করিয়া শহিদ হৈল বাপ ।

রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাপ॥

বাহাদুর শাহ কি এই পথে রেঙ্গুনে নির্বাসিত জীবনে গিয়েছিলেন? না, ইংরেজদের জাহাজে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে বাঙালিরা এই নাফ নদী পার হয়ে দেশে চলে এসেছিল ক্ষুধা-রোগ-শোকে জর্জরিত হয়ে। আমার 'সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা' উপন্যাসের নায়ক মোবাম্বেরের বাবা মোজাহের এই পথে যৌবনে বার্মায় এসেছিল। শরৎচন্দ্র গিয়েছিলেন জাহাজপথে রেঙ্গুনে।

সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে আসার পর আমরা অভিবাসন ও শুষ্ক দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম। কিন্তু পাসপোর্ট দিল না। বলল, ইয়ান্গুন থেকে কোনো নির্দেশ এসে পৌঁছায় নি, কাজেই ইয়ান্গুনের সঙ্গে যোগাযোগ হোক আগে। রাতটা কাটাও ইউনাইটেড হোটলে, কাল সব হবে। অথচ আমরা থ্রেটিস ভিসা পেয়েছি। এই পথে বিদেশিদের মিয়ানমারে প্রবেশের ভিসা সাধারণত দেওয়া হয় না। প্রায় দু' ঘণ্টা বাইরে ও ঘাটের পুলে বসে বঙ্গোপসাগরের অনেক হাওয়া খেয়ে ছাড়া পেলাম।

মিয়ানমার ১৯৬২ সালে সামরিক যান্ত্রিক পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার বার্মার মহান জাতীয়তাবাদী সৈনিক নেতা অং সানের আদর্শবাদী সৈনিক-শাসক এরা নয় কি? তার ওপর এই পথে বার্মা যাওয়ার কোনো নিয়ম নেই। ঢাকার বর্মী দূতাবাস থেকে কেন যে একখানা এই সম্পর্কিত বিশেষ চিঠি মংডুর জন্য আনা হলো না আমাদের! এই পথে আসতে পেরে খুশি হয়েছি, পথে আরাকান পড়বে, আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী ম্রাউক-উ দেখতে পাব। এক সময় আরাকান বার্মা থেকে আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল। তার পরিধি ছিল উত্তরে ফেনী নদী থেকে আন্দামান সাগরের কাছাকাছি পুরো বঙ্গোপসাগর উপকূল। সেখানে এসে পড়েছি এখন। আরাকান রাজ্যের রাজসভায় দৌলত কাজী, আলাওল সাহিত্যচর্চা করেছেন।

আমাদের দলনেতা ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ মহাধেরো। তিনি বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সভাপতি ও ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ। ২৭ জনের এই দলে আমারও ঠাই হলো মহাধেরোর মৈত্রীময় করুণায়। ছেলেবেলা থেকে চট্টগ্রামের পাশে কুমারী অপরূপ মিয়ানমারের কথা শুনে এসেছি রূপকথার গল্পের মতো বা স্বপ্নে কেনা ভালোবাসার মতো, আজ তা বাস্তবে ভেসে উঠল সন্ধের আলোছায়ায়। অন্ধকার প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘের কোলে সৌন্দর্যের দেবীর বক্ষসম্পদের মতো গুরুপক্ষের চাঁদ। আমার হাতে ও কাঁধে ঝোলাঝুলি। শুষ্ক অফিসের চৌহদ্দি পরিয়ে পঞ্চাশ কদম না যেতেই বাঁ দিকে পড়ল বড় রেশুরা, প্রায় জনমানবহীন। ডান দিকে মোড় ঘুরতেই এক মিয়ানমার কুমারী পানীয়ের পসরা নিয়ে বসেছে। একেবারেই ঝুপড়ি দোকান। নানা ধরনের টিন ও বোতলে

কোমল-কঠিন পানীয়। আমি কী আর অত ছাইপাশ জানি! এখানে স্বপ্নের মতো সস্তা বিয়ার। ওই কুমারী ডাকছে! আমাকেও যে ডাকছে তা কি করে বুঝব! আমি যাব কি যাব না, উচিত কি অনুচিত ভাবছি। আমার চোখ আটকে গেছে ওই কুমারীর সৌন্দর্যে ও বিয়ারের বোতল, হুইস্কির গোলাপি-লাল রঙে। আমার পেছনে মৃদুল বড়ুয়া চৌধুরী ওরফে পিন্টু চৌধুরী। পাশ দিয়ে চলে গেল ড. প্রণবকুমার বড়ুয়া। আমি মুগ্ধ চোখে চারদিকে তাকাছি কোথাও কোনো রহস্য আড়ালে পড়ে গেল কিনা! আমার অবহেলায় যদি আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু নজর এড়িয়ে যায়!

কুমারীর বিয়ারের দোকানের পাশেই আর একটি সে-রকম দোকান। তারপর সামনেই শুরু হয়েছে বাড়িঘর ও দোকান। পথে নেমে পড়েছে তরুণ-তরুণী, মেয়ে-পুরুষ। এমন সময় দলের সবচেয়ে ছোট সদস্য পুলক বড়ুয়া আমার হাতে হিম-শীতল একটি টিন গুঁজে দিল। কানের কাছে ছোট্ট করে বলল, খেয়ে নিন। টিনের ঠাণ্ডা মসৃণ স্পর্শে শরীরে শিহরণ খেলে গেল। সারা দিনের গরম, ক্লান্তি ও বাস যাত্রার পর এমন আকুল অন্তরঙ্গ পরশ! বিজলি বাতির অল্প আলো-আঁধারিতে অমরাপুরীর আবেশ নেমে এলো। পথে পথে মিয়ানমারের রঙ্গিলা যুবতী-তরুণীরা। কলহাস্যে মুখর। বাড়ির সামনে, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ। যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। আমরা বোঁচকা-বুচকি হাতে ও কাঁধে নিয়ে ছুটি-হওয়া স্কুলের বালক-বালিকার মতো কলকল করছি। মিয়ানমারের সবাই লুঙ্গি পরে। মেয়েদের পরনে লুঙ্গি ও ঝলমলে ব্লাউজ-জাতীয় জামা বা গেঞ্জি। গালে সেনেকার (Thanekar), ঠোঁটে হাসি ও কথা। ওষ্ঠে রঞ্জনীও আছে। চুলে ফুল গোঁজা, চিরুনি ও রিবন-ফিতে। তবুও ভালো যে বিজলি বাতি আছে। পরে জেনেছি না থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। সারাদিন নয়, সন্ধ্যা থেকে নয়টা পর্যন্ত থাকে। ব্যাস্, তারপর নিজের ব্যবস্থা নিজের। তার মধ্যে লুকোচুরি চলে। কে জানত এই পড়শি দেশটি এত অন্ধুত। আমাদের পত্র-পত্রিকায় মিয়ানমারের খবর থাকেই না, যেন লৌহ যবনিকার দেশ। পুলিশ ও মিলিটারি নাকি এক কদমও এদিক-ওদিক হতে দেয় না। কই, তেমন কিছু তো দেখছি না! নিন্দুকের কাণ্ড আর কি!

টিনটা খুলে নিয়েছি হাঁটতে হাঁটতে। ফুস করে শব্দ করে জানান দিয়েছে যে সে কুমারী। ভাগিস ওপাশ থেকে ড. বিকিরণ বড়ুয়া বা পিন্টু চৌধুরী শুনতে পায় নি। চুমুকে টেনে নিলাম তৃষ্ণাবারি। এত আকুল তেষ্ঠা পেয়েছিল বুঝতেই পারি নি। চোখ মিয়ানমারের কুমারীদের দিকে। স্বল্প আলোয় ওদের অপ্সরা মনে হলে কার ক্ষতি! আমার দুই বোঝা দু' কাঁধে। হাত মুক্ত করার জন্য এই ফন্দি। একটিতে ক্যামেরা, পাসপোর্ট, তামাক ইত্যাদি টুকিটাকি। অন্যটিতে কাপড়। তরুণীদের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? আলোছায়ায় সবকিছু মায়াদার লাগে আপনিও জানেন। তিন তরুণী আমার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। কী এত কথা!

ওপাশে পুলক, আরেক পাশে সিদ্ধার্থ ও দেবাশিস। দলের মধ্যে এরাই বয়সে সবচেয়ে তরুণ। বয়োবৃদ্ধ সাংবাদিক, বয়স্ক শিক্ষক এবং তাদের পত্নীরাও আছেন। ওদের মনের কথা এবং মুখের কথা শুনতে পেলেও এই মুহূর্তে নিজের কথাই বলব।

প্রায় সবার মুখে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্নার নজর পড়ছে জাফরি-কাটা নারকেল-সুপুরির পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে। এবার আমি হলফ করে বলছি, সঙ্গীদের মনেও এই মুহূর্তে নতুন দেশ, অচেনা পরিবেশ ও যৌবন জলতরঙ্গের কলরোল উত্থালপাতাল করছে। পাশ দিয়ে একটা পাইক্যা চলে যাচ্ছে। তিন চাকার রিকশা, যেমন মোটর বাইকের পাশে আর একটা চাকা লাগিয়ে ক্যারিয়ারে বউ-বাচ্চা বসতে পারে, এও প্রায় তেমনি। কলকাতায় এ রকম বাইক আছে। সারা মিয়ানমারে আমাদের রিকশার বদলে পাইক্যা। স্থানীয় মুসলমানেরা এর একচেটিয়া চালক। মংডুর ব্যবসাও প্রায় ওদের দখলে, আর হিন্দুরাও আছে। এরা চট্টগ্রাম থেকে এসেছে, দীর্ঘদিন ধরে আছে।

এক চুমুকেই যদি এক গ্রাস পানি খেয়ে নেন আপনার তেষ্ঠা মিটবে না। রয়ে-সয়ে খেয়ে তেষ্ঠা নিবারণ করতে হয়। কিন্তু এক চুমুকে খেয়ে তিনটা আমি ফেলে দিয়েছি। রাস্তা দিয়ে তরুণী-বৃদ্ধা-যুবকেরা আমার ভাবনা টেনে-টুনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এগিয়ে যাওয়া তিন তরুণী ফিরে ফিরে দেখছে বোঝা-টানা উজ্জ্বল আমাদের। ছেলেবেলার সেই দুটি লাইন মনে পড়ছে :

রেঙ্গুন শহরের বার্মার মাইয়া কত ঠমক জানে,

ঝুঁড়ার (খোঁপার) আগাত্ পানের খিলি ইশারাতে টানে।

আমি ঠাণ্ডা পানীয়ের দৌলতে লাইলি-কাতর হয়ে ওদের পিছে পিছে চললাম। হাসি কুড়োতে কুড়োতে। কেউ অবহেলায়ও বাড়তি যৌবন-সম্পদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, কেউ কেউ খরচই করতে জানে না। মিয়ানমারের কুমারীরা অমনিতেই হাসি ছড়ায়। এমন মধুর হাসি অযত্নে পথের পাশে পড়ে থাকবে প্রাণে সহিবে না। এত অরসিক আমি কখনও হতে পারব না। বিশাল বৃষ্টি-শিরীষ গাছের তলায় জমেছে কারুকাজ করা ছায়া, ওখানে কুমারীদের কাছাকাছি চলে গেলাম। না, এক বর্ণও বুঝলাম না ওদের কথা। ওদের কলহাস্যে বুঝলাম, দুঃখের কোনো কিছু নেই। ওই আলো-আঁধারিতে স্বপ্নমায় প্রথম হৃদয় হারালাম।

ওই করতে করতে প্রায় সবার পিছে পড়ে গেলাম। ইউনাইটেড হোটেলে যখন পৌঁছলাম দেখি জায়গা হলো না। আগে-ভাগে যারা গেছে তারা জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রায় অনাথের মতো বোঁচকা-বুচকি নিয়ে নতুন হোটেলের উদ্দেশে চললাম। নিজেদের খুঁজে নিতে হবে থাকার জায়গা। দলের দায়িত্ববানেরা বলে দিয়েছে, হোটেল খুঁজে নাও। তাহলে কি যতদিন এখানে থাকব আগেভাগে গিয়ে লড়াই করে ভালো জায়গাটি নিতে হবে? আমি তো জানি এক রাতের ব্যাপার,

বাসযোগ্য হোটেল হলেই হলো। কিন্তু ইউনাইটেড হোটেলের যে-অবস্থা দেখলাম তাতে আঁতকে উঠলাম।

খোঁপার করবী

আমরা খুঁজে-পেতে যে হোটেল পেলাম তার অবস্থা শোচনীয় বললে কম বলা হয়। বেড়ার ঘরের দোতলার মাঝবারান্দায় বসেই টের পেলাম এটা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেল হতেও পারে। কাঠের মেঝে। কাঠের যেমন-তেমন দেয়াল। বিছানায় গিয়ে পরখ করে দেখি উঁচু-নিচু চষা জমির মতো তোশক। মশারিতে বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ। মাথার উপরে পাখা আছে। কিন্তু রাত নয়টার পর তো বিজলি থাকবে না। তখন গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার অবস্থা হবে। কয়েক দফা দরকষাকষি ও বচসা হয়ে গেল সুযোগ-সুবিধা ও ভাড়া নিয়ে। হোটেলের মালিক ভাড়ার টাকা আগে নেবেই। বাথরুম নিচে। দেখতে গেলাম। না দেখেই থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। সমস্ত স্নায়ু ও সহ্যশক্তি এক সঙ্গে 'না না' বলে উঠল। শরৎচন্দ্রের প্লেগ রোগের ইঁদুরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আলবেয়ার কাম্যুর 'দ্য প্লেগ' উপন্যাস পড়ে ভালো করি নি মনে হলো। তবে ইঁদুরগুলো টলমল পায়ে হাঁটছে না, তীরের বেগে ছুটছে ধমক খেয়ে। ওদিকেরগুলো ভদ্রভাবে সহবত দেখিয়ে হাঁটছে। সজ্জন ভঙ্গিতে খাবার খুঁজছে। শৌচাগারের পেছনে মালিকের পরিবারের এলাকা। মেয়ে, ছেলে, মা নিয়ে সংসার।

উপরে উঠে এলাম এক রকম ছুটে, কী করব বুঝতে পারছি না। এর চেয়ে ভালো হোটেল নাকি আর নেই, অন্য একজন হোটেল-বাসিন্দা বললে। কণককান্তি বড়ুয়া, সিদ্ধার্থ, দেবাশিস ও পিন্টু চৌধুরী একটা একটা কক্ষে ঢুকে পড়ল। আমি নিলাম ফ্যান-ছাড়া একটা কক্ষ। পরে মনে পড়ল ফ্যান থাকলেই-বা কি! আমার তো রাতে ফ্যান সহ্য হয় না। বাতিও থাকবে না রাতে।

মাঝবয়সী সুন্দরী এক রমণী আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে যেতে বাকি তার রয়েল রেস্টরায়, রাতের খাওয়ার জন্য। ইউনাইটেড হোটেলের যারা উঠেছে তারা নাকি ওদিকে এক মুসলিম রেস্টরায় খেয়ে নিচ্ছে। নয়টা বাজলে খাবার শেষ হয়ে যাবে, বাতিও জ্বলবে না। রমণী আগে আগে চলল। লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরা, মধুঝরা হাসি। না জানি অমন যার হাসি তার রেস্টরা কেমন হয়। না, সুন্দর ঝকঝকে টেবিল-টুল। বাসন-কোসন ভদ্র। ভাতের দোকান বলেই উঁচু টেবিল ও প্লাস্টিকের টুল। সম্ভবত চীন থেকে আমদানি ওই টুল। সাধারণ বর্মী রেস্টরায় নিচু টেবিল ও টুল থাকে। জাপানিদের মতো নিচু টেবিল ও নিচে পা ফেলে বসার ব্যবস্থা নয়। দেয়ালে মিয়ানমারের মডেল মেয়েদের হাসি-ঝরা ছবিসহ টাইগার বিয়ার, লন্ডন সিগারেট, মিয়ানমার ও মান্দালয় বিয়ার, রাম, জিন ও নানা রকম হুইস্কির

বিজ্ঞাপন। পানির মতো সস্তা এসব জিনিস। এক টিন বিয়ার আমাদের টাকায় পঁচিশ, এক বোতল পঁয়ত্রিশ। এক বোতল হুইস্কি ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। বিদেশি হলে দাম বেশি। শুধু পান আমাদের মতো এক টাকা। সব জিনিস সস্তা। ভূ-বিশ্বে এই একটি দেশের হদিস পেলাম, যেখানে আমাদের টাকার দাম অনেক। নিশ্বাস নিলাম বেশ গর্ব ভরে।

রেস্তারার রাখাইন মালকিনের বয়স প্রথমে বুঝতে পারি নি। বলে কি! ওর বড় ছেলে কলেজে পড়ে! কব্জবাজার ও পটুয়াখালিতে রাখাইন আছে। এখন বুঝতে পারলাম আমার দেশের রাখাইনদের কত কম জানি। তাদের খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। তাহলে কী করে দেশের সব মানুষের সঙ্গে আমার সখ্য নিবিড় হবে। ওদের বয়স কী করে লুকোয় ওরা, যৌবন-সম্পদকে এত নিবিড় করে ধরে রাখে সারা অঙ্গে! আর হাসিমাখা চোখ যেন আনন্দ-মন্দির সাগর।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটি মেয়ে। বাঙালি। লুঙ্গি এবং কোমর-ঢাকা ব্লাউজ পরেছে। না, এখানে পেট বের করে দেখায় না কোনো মেয়ের ব্লাউজ। পেট ভরে খেলাম। মেয়েটি দিব্যি চট্টগ্রামী ভাষায় এটা-ওটা আছে জানিয়ে রাখতে লাগল। ওর নাম স্বরনা। পূর্বপুরুষের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজান। আমার পাশের থানা। ওর মতো আরো একজন বাঙালি মেয়ে রান্নাবান্না করে। চেহারা ও স্বাস্থ্য গরিব ঘরের রোগা-পটকা নারীর মতো। আর মালকিন রাখাইন রমণীর হাসি সুন্দর বলব না? আমি পারব না। হাসলে চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে যায়। ওটা মঙ্গোল বৈশিষ্ট্য। ওতে বাণ নিক্ষেপের সব আয়োজন আছে। তবে জমা রেখে দিয়েছে। অপাত্রে দিয়ে কি লাভ?

পোড়া লঙ্কা কচলে নুন-তেল দিয়ে ভর্তা করল। একটা প্রুটে তার সঙ্গে দিল কচি লেবু পাতা। বাঃ। খাস চট্টগ্রামের খাবার। আসলে এদের থেকে চট্টগ্রামের বড়ুয়ারা এই খাবার নিয়েছে। চাকমা-মারমারা ধানি লঙ্কা পুড়ে নুন ও পিঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে। পোড়া বা সেদ্ধ ধানি লঙ্কা কুইজ্যায় বা মাটির হামানদিস্তায় পিষে নেয়। মাছ, মুরগি আছে। আছে চর্বিদার পোর্ক। বিয়ারের বোতল তো আছেই। ছিপি খুলে ওমর খৈয়ামের নামে কয়েক ফোঁটা উৎসর্গ করে ফেলে দিলেই হবে। কি করব, তিনি তো বলেই দিয়েছেন তার বিখ্যাত এক রুবাই-এ,

চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন সাকির পাশ

পেয়ালা একটু উল্টে দিও স্মরণ করে খৈয়ামে।

সুবোধ ও বিকিরণ এলো হোটেলে। ওরা আরেক হোটেলে উঠেছে। সেটা নাকি গোয়ালঘরের মতো। আমাদেরটার চেয়ে খারাপ হোটেল আরও আছে কল্লনা করতে বাধল।

পেট ভরলে মনও শরিফ হয়ে যায়। গলা পর্যন্ত টলটল করছে কাসাভা বা আখ

থেকে তৈরি রসের সারাংশারে। টেকুর উঠছে। মিয়ানমারের সামরিক সরকার কি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে বলার সুযোগ দেবে না এসব খাইয়ে-দাইয়ে। এত সস্তায় এত সব খেলায়, মেজাজ এত খোশ হয়ে গেল যে বদনাম কী করে করি। খুব সস্তায় তাম্রকূট সেবন।

মিয়ানমারবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে লুন্ডির নিচে অন্তর্ভাস পরে না। আধুনিক তরুণীদের কথা আলাদা। গান্ধীও ধুতির নিচে অন্তর্ভাস পরতো না। বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, যিশু, বাহাউল্লাহ—কেউ পরতো না। ক্রিওপাতরা, হেলেন, রাধা, দ্রৌপদী, সীতা, পার্বতীর সময়ও অন্তর্ভাসের প্রচলন ছিল না। সেই যুগ আর অমন সুশীল সময় এখন থাকার কথা নয়।

মিয়ানমারের মেয়েরা চুল খুলে পিঠে ছড়িয়ে রাখে। গার্ডার দিয়ে চুলের গোড়ায় বাঁধে, কিন্তু হর্স টেল বা পনি টেলের মতো টানটান ও মাথার উপর-অংশে নয়। সেই দীঘল চুল কখনোবা হাঁটু পর্যন্ত ছুঁতে চায় আর শুদ্ধ মেঘে বিদ্যুৎ-নাচের ভঙ্গি দেখায়। আর ওদের বক্ষে অচল শিলার মতো ছোট কুচয়ুগ। ঝোঁপা বা গার্ডারে ফুল দেবে, সেই করবী ফুল কবিতার মতো পেছনে ওড়ে, তবে খুব সম্ভবত কুটিল ফণা বিস্তার করে না। বিকেলে কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত, প্রায় সবাই পিছে চুল খুলে প্যাগোডা বা বিহারে যাবে।

টির স্বাধীন ও চলিষ্ণু বর্মীরা

টেকনাফ থেকে মংডু গেছি মাঝি সৈয়দ আলমের ইঞ্জিনের বোটে চড়ে। ওর বাবা বোটের মালিক। টেকনাফ থেকে একবার মংডু যেতে বাংলাদেশ সরকারকে ১০০ টাকা কর দিতে হয়। নাফ থেকে মংডু মি (মি অর্থ নদী) পূর্ব দিকে একটু ঢুকেই মংডু শহরের জেটি। কাঠের জেটি-ঘাটের ওপরে টিনের ছাউনি। ওখানে গিয়ে বোট থামল। শুষ্ক ও পুলিশের লোক আমাদের ধরে তুলল। নদীতে জোয়ার। ঘাটের কাছেই মিলিটারি। আবদুর রহমান নামে একটি বারো বছরের ছেলে আমাদের বোঁচকা টানল নিজের থেকেই। সে চট্টগ্রামের, পরিষ্কার চট্টগ্রামী টানে কথা বলছে। আবার শুষ্ক বিভাগের মিয়ানমারবাসীর সঙ্গে দিব্যি ওদের ভাষা বলছে।

আমাদের দলে প্রীতিকণা, অমিতা, স্মৃতিরেন্ধা, মীরা, আলপনা ও দেবী বড়ুয়া জেটি-ঘাটের সঙ্গে সংযুক্ত কাঠের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা দিচ্ছে। এরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আবদুর রহমানকে দিয়ে ওরা বাদাম ও শিমবিচি ভাজা কিনে এনে খাচ্ছে। বাংলা এক-দুই টাকা ছাড়া ওপর দিকের নোট চলে। পাঁচ টাকার নোট দিয়ে প্রীতিকণা বড়ুয়া আরেক দফা আনিয় নিল। আমার হাতেও এসে পড়ল। ভালোই তো। আচার পাওয়া যায়। সেই আচার পাচার হয়ে টাকা

শহরেও চলে আসে। আচারের পুরিয়াতেও মিয়ানমার সুন্দরীদের ছবি আছে। টক, ঝাল, মিষ্টি। কুল, তেঁতুল, আম। লোকে বাংলাদেশ থেকে এসব খাবার আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমেরিকা ও লন্ডনেও পাঠিয়ে দেয়।

আবদুর রহমানের বাবা মানুষ খুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল বউ-বাচ্চাদের ফেলে। কক্সবাজার থেকে গোপনে ফিরে এলে ধরা পড়ে যায়। ভুচিদং জেলে সাজা ভোগ করছে। এক বছর শেষ, আরও দু' বছর সাজা বাকি আছে। আবদুর রহমান নামাজ পড়ে। না পড়লে পাড়ার বড়রা বকে। তিন ভাই, পাঁচ বোন। মা বর্মীদের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়। দিনে ৫০০ চ্যা Kyat পায়। আমাদের ৪৫ টাকার মতো। আবদুর রহমান ঘাটে কুলিগিরি করে। টেকনাফ থেকে একদিনের অনুমতিপত্র নিয়ে মংডু আসে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। আবার দিনে দিনে ফিরে যেতে হয়। মংডু থেকেও এভাবে টেকনাফ যাওয়া যায়। বিকেল শেষ হতে যাচ্ছে। ঘাটের শুষ্ক বিভাগের লোকের গায়ে হালকা জ্যাকেট। ওরা একটু বৃষ্টি বা এক পলকা বাতাস দেখলেই কোমর পর্যন্ত ঢাকা বর্মী কোট বা হালকা জ্যাকেট পরে নেয়।

একটা রাত কেটে গেল অখ্যাত বা কুশ্রী হোটেলে। সকালে উঠে নিচের শৌচাগারে গেলাম। সেই কুড়ি-তিরিশ বছর আগে যেমন আমাদের খাটা পায়খানা ছিল তেমন ঘরে ঢুকতে হলো। বাড়ির মালিক এসে নলকূপ দাবতে লাগল। বড় বড় মটকায় পানি ধরে রাখে। বেড়ার ঘর। দরজা নেই। গায়ে সাবান মাখতেই হবে। মাথায় গতকাল অনেক ধুলো জমেছে। দিনের বেলায়ও ইঁদুর মুখ বের করছে, চোখ পাকিয়ে দেখছে দ্য প্লেগ বইয়ের পাঠককে। ও জানতে চাইল, আমি কি এতই অবহেলার? ওয়াল্ট ডিজনির মিকি মাউজ আমাদের পূর্বপুরুষ। আমি হার মানলাম।

অজস্র জাতিসত্তার অন্তর্মুখী জাতি

২৫ মে, দ্বিতীয় দিন। মহাধেরোর সঙ্গে পুলক ও আমি মংডুর প্রধান সড়ক ধরে চলেছি। বাজার। দু'পাশে বাড়ি, বাড়ির নিচে দোকান। ভেতরের বাড়িগুলো সেগুন কাঠের থাম বা পাকা থামের ওপর। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা পথ। গাছপালার পাতা চকচক করছে ধাতব নতুন টাকার মতো। বৃষ্টি শিরীষ, আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া সবই আমাদের মতো। পদাউকের পাতা লকলক করছে। পদাউকের সোনারঙ ফুল ফোটার এটিই সময়। রমনা পার্কের পুবদিক সংলগ্ন হেয়ার রোডের দু' পাশে দু' সারি শতবর্ষী পদাউক আছে। ওরা আমাকে বলেছে মিয়ানমারে ওদের নাম সেন্না। মংডুর কিছু গাছ ব্রিটিশ আমলের। ওদের বয়স

শতাব্দী বা তারও বেশি। বৃষ্টি শিরীষ, তেঁতুল এবং একটু কম বয়সী নারকোল গাছ। আছে কাঠগোলাপ ও সোনালা। নারকোল সর্বত্র। বাড়ির সামনের নারকোল গাছটির গোড়ার দিকে মাথা সমান উঁচুতে অর্কিড করেছে। তাতে রঙিন ও সাদা ফুল। পরে সারা মিয়ানমারে এ রকম দেখেছি। জাপানিরা এভাবে অর্কিডের চাষ করে।

পাইক্যায় বোরকা পরা মহিলা। তার ওপর মাথায় ছাতা। ছবি তুলতে যেতেই ছাতা দিয়ে আড়াল তুলে দিল। হাঁটতে হাঁটতে শহরের পূর্ব দিকে শেউইজার সেতু পার হয়ে গেলাম। নদীর নাম সুধার ডিয়ার। এপারে মংডু, ওপারে সুধার পাড়া। মুসলিম গ্রাম। তরুণ হাফেজ আহমদ বাজার করে ঘরে ফিরছে। সুধার পাড়ায় ওর বাড়ি। হাজার সাতেক বাসিন্দা। সবাই মুসলিম। গতবারের দাঙ্গায় হাফেজ আহমদরা গ্রাম ছেড়ে যায় নি। কোনোমতে ভিটে আঁকড়ে পড়েছিল। অনেকে পালিয়ে গেছে। চলে গেলে জমিজমা বেদখল হয়ে যাবার ভয় ছিল। বাড়িঘর নষ্ট হয়ে যেত। ওরা রক্ষা পেয়েছে প্রতিবেশী বর্মীদের সহযোগিতায়। আল্লাহ মেহেরবান।

সেতুর কাছেই পাঁচ-সাতজন মাছ নিয়ে বসেছে। তরিতরকারি নিয়ে বসেছে কয়েকজন। গ্রামের ছোট্ট বাজার। পাঁচ-ছয়টা বেড়ার দোকান। বুড়ো আঙুলের সমান চিংড়ির কিলো ৪ থেকে ৫ শ' চ্যা। আমাদের তুলনায় পানির দাম। টাকার হিসাবে ৪০-৪৫ টাকার মধ্যে। নদীর উজান দিকে বিলে দেখা যাচ্ছে চিংড়ির ঘের। অটেল মাছ পাওয়া যায় ওখানে। চায়ের দোকান থেকে লোকজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মংডুতে এখনো প্যান্ট দেখি নি। শুধু আমাদের পরনে প্যান্ট। মহাথেরো চীবর পরেছেন। বর্মীরা সবাই লুঙ্গি পরেছে। অফিস-কাছারিতেও লুঙ্গি। গতকাল শুষ্ক অফিসে দু' জনের প্যান্ট দেখেছি। ওরা পুলিশ। অন্যদের লুঙ্গি। লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোডা এই তিন নিয়ে মিয়ানমার। ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু। ক্যাং, টং, ভং, ছোয়াইং (ভিক্ষুদের দান করা ann), গম (ভালো), ছাম্মান বা সাম্পান, ছা (শাবক), চাং, ডাং (চট্টগ্রামে প্রচলিত কাঠ দিয়ে খেলা), থামি (বর্মী রমণীদের সেলাইবিহীন লুঙ্গি) ইত্যাদি অনেক শব্দ বার্মা ও আরাকান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাভাষায় ঢুকেছে।

বাসের চালে যাত্রীদের সঙ্গে ফুঙ্গি। পথে-ঘাটে ফুঙ্গি। সকালে তাঁরা খালি পায়ে ভিক্ষে করতে বের হন। ভিক্ষে ছাড়া ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের চলবে না। ভিক্ষাই তাঁদের জীবিকা। ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো। গায়ে আলাদা অন্য এক টুকরো চীবর থাকে। হাত কাটা ও এক কাঁধ কাটা একটা গেঞ্জি থাকে, কোমরে বেল্ট জাতীয় অর্থাৎ সেলাই করা কাপড়ের কোমর-বন্ধনী থাকে। এসব মিলে ত্রিচীবর। আর হাতে থাকে ছাবাইক বা ভিক্ষাপাত্র। আদিতে এটি কাঠ বা লোহার হতো। এখন লাক্ষা দিয়ে তৈরি হয়। কাবুল মিউজিয়ামে গৌতম বুদ্ধের ব্যবহৃত

একটি ঐতিহাসিক ছাবাইক ছিল। সেটি অন্য সব বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার সময় তালেবান শাসকরা নষ্ট করে ফেলেছে। আড়াই হাজারেরও বেশি বয়সী সেই ছাবাইক এবার শেষ হয়ে গেল। ভিক্ষুদের চীবর বিশেষ মাপে এবং অনেক জোড়া দিয়ে সেলাই করা হয়। এটি নিয়ম। সাধারণত লাল ও লালের কাছাকাছি রঙে চীবরে রঙ করা হয়। এক সময় এই রঙ ভিক্ষুরা আহরণ করতেন ফুল বা গাছের নির্যাস থেকে। চীনে একটি গোলাপ ফুলের নাম 'বৌদ্ধ চীবর সুবাস'। অর্থাৎ এই গোলাপের রঙ নিয়ে তখন ভিক্ষুরা চীবর রাঙাতেন। বার্মায় ফুঙ্গিদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়।

ছেলে-বুড়ো-যুবক-যুবতী সবার পরিধান লুঙ্গি। স্কুলের পোশাকও লুঙ্গি ও জামা বা শার্ট। বর্মী-মুসলমান-হিন্দু-বড়ুয়া-খ্রিষ্টান সবার লুঙ্গি। বর্মীরা শার্টটি লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয়। মংডুর মুসলিমরা শার্ট পরে লুঙ্গির বাইরে। বার্মা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে লুঙ্গি প্রবেশ করে। মাত্র একশ' বছরের মধ্যে সারা বাংলা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত লুঙ্গি চলে গেছে। লুঙ্গি, শার্ট ও বর্মী কোট, মাথায় বর্মী টুপি, পায়ে দুই ফিতির মজবুত স্যান্ডেল বর্মীদের জাতীয় পোশাক।

লোকজন আমাদের দেখছে। আমাদের পোশাক ও চাল-চলন ওদের থেকে ভিন্ন। সব দেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে। পুলকের চেহারার মধ্যে পুরো বর্মী ছাপ, তাতেও সে বাঙালিত্ব লুকোতে পারে না। সেতু পেরিয়ে ফিরে আসছি। কিছুদূর এসে মূল রাস্তা থেকে ডান দিকে বর্মী পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। একটি বাড়ির নিচের খালি অংশকে কোচিং ক্লাস বানিয়ে পড়াচ্ছে এক শিক্ষক। প্রথম মনে করেছিলাম প্রাইমারি স্কুল। একই সঙ্গে বসা বিভিন্ন বয়সের ছাত্র-ছাত্রী দেখে ভুল ভাঙল। শিক্ষকের সঙ্গে মহাথেরো কথা বললেন। শেষে ছাত্রদের টিউশন নিয়ে কথা হলো। বি.এ. পাশ শিক্ষক। ইংরেজিতে কথা হলো। ছাত্র-ছাত্রী পিছু চারশ' চ্যা অর্থাৎ ৪০ টাকা। কাঠের গোল থামের উপরের বাড়িটি শিক্ষকের। মজবুত কাঠের থাম, সেগুন কাঠই হবে।

মহাথেরো ইউনাইটেড হোটেলে চলে গেলেন। কণককান্তি বড়ুয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি (এখন জয়েন্ট সেক্রেটারি)। পাশে পিন্টু বড়ুয়া, শার্ট গুঁজে দিয়েছে লুঙ্গিতে, বর্মীদের মতো। সিদ্ধার্থ ও দেবাশিসসহ দলটি এলো। রাস্তার মোড়ে খালি জায়গায় বড় বৃষ্টি শিরীষ গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নুডল্‌স্ বিক্রি করছে। ভাসমান দোকান। সকালের টিফিন এ রকম এক দোকানে পুলকসহ খেয়েছি। নুডল্‌স্, পোড়া লঙ্কা গুঁড়ো, তেঁতুলের টক, কলার খোড় ইত্যাদি সবজি দিয়ে স্যুপ, ডিমসেদ্ধ মিশিয়ে খেয়েছি। ডিমের খোসা ফেলে কাঁচি দিয়ে টুকরো-টুকরো করে ক্ষিপ্ত গতিতে। আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছে। স্বাদটা পানসে ধরনের। প্রথম বলে খুব জমে নি বলব? তাছাড়া নুন, লঙ্কা ইত্যাদির পরিমাণ ঠিক করতে পারি নি বলেই হয়তো স্বাদটা জমপেশ করে তুলতে পারি নি।

সকালের জন্য আদর্শ খাবার বলা যায়। সঙ্গে বিনি-পয়সায় দুধ-চিনি ছাড়া চা দিয়েছে। দোকানি মাঝবয়সী মহিলা। ইঙ্গিতে, ইংরেজিতে কোনোমতে এক রকম করে কথা হলো। বুঝতে পারছি সারা ভ্রমণ এভাবে অপূর্ণ কথাবার্তা বলতে হবে। মনের সুখে দু' দণ্ড ওদের কাছে নিজেদের প্রকাশ করব তা বোধহয় হয়ে উঠবে না। কে জানে!

দোকানটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মাথার উপর ছত্রাকার শিরীষ গাছের নিচে পলিথিন টাঙিয়ে দিয়েছে। লম্বা বেঞ্চিতে খাবারের বড় বড় ডেকচি। টুল আছে বসার। তরুণী বলল বিকিকিনি শেষ। নুডল্‌স্‌ আছে, কিন্তু মশলাপাতি ও তেঁতুলের খোল ফুরিয়ে গেছে। ওখান থেকে একটু এগিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকলাম। মালকিন বসে আছে চেয়ারে। রোয়াইংগা মুসলিম বয় আছে দু' জন। ওরা মূলত চট্টগ্রামের। মালকিনকে বুঝিয়ে দিল আমাদের কথা। কিন্তু বিস্কুট বা সে-রকম কোনো খাবার নেই। দুধ- চিনির চা ও বিনি-পয়সার চা আছে। দোকানের ভেতরে আরেক মহিলা চুরুট-সিগারেট ও পান বেচতে বসেছে। অন্য মহিলারা আছে রান্নাঘরে। চা বানিয়ে দিচ্ছে। মহিলারা চির স্বাধীন। দোকানের মালিক তারা। মুখে সেনেকার, খোলা বাহুযুগল, পিঠে চুল খোলা, আর আধ খোলা ঠোঁটে হাসি। আমার ঠোঁটের ফাঁকে দেওয়ার জন্য ভালো চুরুট এখানেও পেলাম না। সবই খুব সাধারণ মানের। চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

মংডু জামে মসজিদে ঢুকে দেখি ইমাম বাইরে গেছেন। অন্য একজন খাদেমকে পেলাম। আমার পরিচয় দিলাম। সামনে বেশ বড় বাঁধানো চত্বর। এক পাশে পুকুর। জরাজীর্ণ চেহারা। সবকিছু অসমাপ্ত। টিনের ছাউনি। ভেতরে দেয়াল উঠছে, যেটুকু উঠেছে তাও প্লাস্টার হয় নি। মেঝেও এবড়োখেবড়ো, বহুদিন আগে করা বলে মাঝে মাঝে সিমেন্ট উঠে ইট বেরিয়ে আছে। কে একজন বুড়ো কাজা নামাজ পড়ছেন। জুতো বাইরে রেখে এসেছি। সদর গেটে কণককান্তিরা অপেক্ষা করছে। পিন্টু চৌধুরী ওদিকটা দেখছে। খাদেম লোকটির নাম মোহাম্মদ জাকারিয়া; মাঝবয়সী, জীর্ণশীর্ণ চেহারা। বেশ আন্তরিক কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করবে কী করবে না খুব ভাবনায় পড়েছে। তার ওপর আমি বিদেশি এবং বড়ুয়া। আবার বলার জন্য খুব উৎসুক। বারবার বলছে ইমামকে ডেকে আনতে যাবে কি না, তিনি সব তথ্য দিতে পারবেন। জাকারিয়ার বাড়ি শহরতলির জামাইক্যা গ্রামে। সে-গ্রামে চার-পাঁচ হাজার মুসলিম। মসজিদ পাঁচটি। মংডুর পূবে কাইন্দা পাড়ায় দশটি মসজিদ আছে। শহর থেকে পাইক্যার ভাড়া ৫০ চ্যা। জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ বন্ধ। কথা বলতে বলতে একজনকে পাঠিয়েছে ইমামকে ডাকতে। শহরের প্রাচীনতম এই জামে মসজিদ। কত পুরনো সে জানে না। ছোটকাল থেকেই দেখছে। ইমাম সব জানে। সময় বয়ে যাচ্ছে। ইমাম আসছে না। বুঝতে পারলাম ইমাম ভয় পাচ্ছে। কে না কে আমি! আবার কোন ফ্যাসাদে পড়ে।

সরকারের চোখে যদি পড়ে যায়।

সকালে রাস্তার দোকানের সামনে এক মুসলিমকে পেয়েছিলাম। বর্মী বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠল। কোনো মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করলে একজন বর্মীকে মুসলিম হতে হয় কিনা। মুসলিম মেয়ে যদি বর্মীকে বিয়ে করে? এক বর্মী যুবক পরে অন্য সময় বলেছিল তাকে বৌদ্ধ হতে হবে। দোকানের সামনে যাকে পেয়েছিলাম সেই জাকারিয়া বলেছিল, আমি তো আর ভেসে আসি নি, আমি এ দেশের মাটির সন্তান। রক্ত দিয়ে রক্ষা করব আমার অধিকার। আমি মুসলিম, এটা আমার গর্ব। বিষয়টি এত স্পর্শকাতর যে সব কথা আমাদের দেশে লিখে বলাও মুশকিল। আমার উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থা দেখা। মসজিদ দেখে অনুমান করা। আমি তো জানি সংখ্যালঘুরা কি বেদনায় সব অপমান সহ্য করে! এখানে মাইকে আজান দেওয়া হয়। ভোরের আজান আমি শুনেছি। শব্দ নিয়ন্ত্রিত আজান বলে শুনতে খুব ভালো লেগেছে। আমাদের ছেলেবেলায় গ্রামে খালি গলায় আজান শোনার মতো তত সুমধুর বলতে পারব না। সে অনেক বেশি মধুর ছিল।

ওপাশে সাইনবোর্ডে লেখা 'জেলা ইসলামিক রিলিজিয়াস এফেয়ার্স কাউন্সিল'। ইংরেজিতে লেখা। মংডুর অন্য সব সাইনবোর্ড বর্মী ভাষায় লেখা। মসজিদে বর্মী ভাষা লেখে না। আরবি লেখা থাকে। খ্রিষ্টানরাও গির্জায় ইংরেজিতে লেখে। যুবক জাকারিয়ার সঙ্গে অনেক কথা হলো। সব লেখার নয়। সত্য অনেক সময় অপ্রিয় হয়। মাঝে মাঝে কোনো কোনো সত্য কথা শুনতেও ইচ্ছে হয় না। সত্য এমন যে তার কপালেও অনেক সময় দুঃখ জোটে। সফ্রেটিস ও ক্রনোর ওপর এজন্য মৃত্যু-খাড়া নেমে এসেছিল।

প্রত্যেক নাগরিককে পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হয়। দেশের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে তা দেখাতে হয়। বিমানে টিকিট করতে দেখাতে হয়। ডিজেল-পেট্রোল রেশনে বিক্রি হয়। রেশনে পেট্রোলের দাম ২০০ চ্যা হলে কালো বাজারে হয়তো ১০০০ চ্যা। আবার রেশনে ইয়াঙ্গুনে এক রকম দাম, মংডুতে পরিবহন বাবদ একটু বেশি। আর ইয়াঙ্গুন থেকে মান্দালয় যাওয়ার সময় পথে পথে ড্রাম থেকে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে দেখেছি।

মংডুতে বাংলাদেশের টাকা সবখানে অবাধে চলে। ১ টাকায় ১১ চ্যা। হিসেবের সুবিধার জন্য একশ'-তে ১১শ না ধরে এক হাজার হিসাবে লিখে যাচ্ছি। সোনা দেড় ভরি ৯৫ হাজার চ্যা। বার্মার সোনার অলঙ্কার হয় ২২ ক্যারেট। ২৪ ক্যারেটের গয়নাও পাওয়া যায়। তার দাম বেশি। মংডুতে সোনার বড় দোকানের মালিক মুসলিম। সে বলল, বাংলাদেশ থেকে আসা সুইস বার সোনা দিয়ে তারা গয়না তৈরি করে। মূল্যবান রুবি বা ক্যাটস্ আই ইত্যাদি রত্নের দোকান নেই। এর রাজত্ব ইয়াঙ্গুন, মান্দালয়, মিথিলা বা পাগান। সেখানেও আমাদের নিয়ে যাবে।

পনেরো-ষোলো দিনের ভ্রমণ। মিয়ানমারের ধর্ম মন্ত্রণালয় আমাদের জিম্মাদার। আবার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ও তার সঙ্গে যুক্ত। দেখা যাক কি হয়, পাসপোর্ট এখনো পাই নি, ইয়াঙ্গুন থেকে কোনো খবরও আসে নি। না আসুক মংডু দেখা আগে শেষ করি।

মিয়ানমারে ১৩৫টি ছোট-বড় জাতিসত্তা আছে। বড় জাতিগুলো হলো বামার, চিন, কাচিন, কায়াহ, কায়িন, রাখাইন ও শান ইত্যাদি। বামার ৬৯ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৮০ লক্ষ। দু'-আড়াই হাজার বছর ধরে এখানে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের মূলধারা নির্মিত হয়েছে এবং তার শ্রেষ্ঠ দাবিদার মনে করে তারা। ইতিহাস থেকে জানা যায় বর্মীরা মূলত অন্তর্মুখী জাতি। ঐতিহ্যগতভাবে তারা মনে করে দেশের রাজধানী হলো 'বিশ্বের কেন্দ্রভূমি।' ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বহির্বিশ্বের সংস্পর্শে আসে। তার আগে ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। অর্থনৈতিকভাবে মিয়ানমার হলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য এই দেশ কাঁচামাল সরবরাহ করত। অর্থনীতি ছিল ব্রিটিশদের হাতে। তবে সে-সময় ভারতীয়দেরও প্রভূত আধিপত্য ছিল ব্যবসা ও চাকরিতে। বর্মীরা এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপর সেই অন্তর্মুখী স্বভাবের আবার চর্চা শুরু হয়। আজও মিয়ানমার বাইরের বিশ্বের প্রভাব থেকে সযত্নে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশি জাপান, চীন ও কোরিয়ার সঙ্গে। বিদেশি ভ্রমণকারীর স্বর্গভূমি হতে পারে এই দেশ, কিন্তু পথে-ঘাটে আশ্চর্যজনকভাবে কম দেখা যায় বিদেশিদের।

মিয়ানমারকে প্রাচীনকাল থেকে বলা হয় গোল্ডেন ল্যান্ড বা সুবর্ণভূমি। অজস্র জাতিসত্তা নিয়ে এই দেশটিকে এখনো বলা চলে গ্রাম্যমুখী। প্রাচীনকাল থেকে অধিবাসীরা জুম চাষের স্বভাব অনুযায়ী দেশের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় সঞ্চারণশীল। এখনো সেই স্বভাব একেবারে মুছে যায় নি। তাদের চেহারা, নাক, চোখ, মুখ ও ত্বকের লাবণ্য দৃষ্টিযোগ্য। বলতে দ্বিধা নেই বর্মীরা নিজেদের দেশে সঞ্চারণশীল জাতি, যেন এক জায়গায় স্থির থাকতে ভালো লাগে না। অনবরত চলমান। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূর্বে। চাকমারাও প্রাচীন ভিয়েতনাম বা চম্পা থেকে বার্মা হয়ে কক্সবাজার দিয়ে বাংলায় এসেছে। বর্মীরা তেমনি একরকম চির স্বাধীন ও চলিষ্ঠু।

লেক্ট-রাইট

পাখি জাগার আগেই ২৬ মে আমরা উঠে সাজগোজ শুরু করলাম। মানুষ বেশি শৌচাগার কম। তাও আদিম যুগের শৌচাগার। বিশাল বিশাল মটকায় নলকূপ

চেপে নালাব মতো করে বাঁশের ফালি দিয়ে পানি এনে ভরানো হয়। বাড়ির মালিক ভোরে উঠে চাপতে শুরু করেছে। শব্দ হচ্ছে। বিদ্যুৎ নেই, মোমবাতি সহায়। তাড়াতাড়ি সব সেরে রেক্তরায় চা-টা কোনোমতে খেয়ে পিক-আপ গাড়িতে চড়ে বসলাম। বসা নিয়ে কত শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে এক দফা বচসা হয়ে গেল। ইয়াঙ্গুন থেকে নির্দেশ এসে গেছে। সরকারি গাইড পেয়ে গেছি। আকাশে মেঘ, চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া। দু' রাত্রি মংডুতে চষে প্রায় কিছুই বাকি রাখি নি দেখার।

পিক-আপের পেছন খোলা। সাতজন করে মুখোমুখি দু' সারিতে বসেছি। ড্রাইভারের পাশে দু' জন। ওই দুটি আসনের দিকে আমারও লোভ আছে। গাইড, হেলপার মিলে আমরা বত্রিশজন হলাম। পাখিরা আমাদের বিদায় দিল। শহরের টাওয়ার ঘড়ি ফেলে বেরিয়ে আসতেই দেখি বিলে চিংড়ির ঘের। গ্রাম, চেকপোস্ট, পাহাড় ফেলে যাচ্ছি। খুব কম লোক চোখে পড়ছে। এত কম মানুষ দেখতে অভ্যস্ত নই আমরা। মিনিট চল্লিশেক গিয়ে ভুচিদং, সেখান থেকে স্টিমারে সিটউই, সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন বিমানে করে ইয়াঙ্গুন। শুনেছি মোটরযোগে ইয়াঙ্গুন গেলে দু' রাত পথে থাকতে হবে। কেউ কেউ বলে এক রাত। ভালোই তো, পথে পথে নতুন জায়গা দেখা হয়ে যাবে। নতুন কোনো ধর্মশালা বা হোটেলে থাকব। পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে যাওয়ার আনন্দ পাব। কিন্তু অন্যরা রাজি নয়।

মাইল পাঁচেক পরে পড়ল মিলিটারি চেকপোস্ট। গাইড নামল। সেই অকৃত্রিম লুঙ্গি ও শার্ট, শার্টের উপরে বর্মী কোট। এখন আবার খাটো হালকা কোটের ফ্যাশন এসেছে। হাত লম্বা ও ঢিলে। হাতার আগায় এক প্রস্ত ভাঁজ করে গোটানো। খাকি বা সাদা রঙ, কোমরের অর্ধেক পর্যন্ত ঝুল। ঐতিহ্যবাহী বর্মী টুপি এখন আর কারও মাথায় ঠাঁই পায় না। ভাস্তে শুদ্ধানন্দ মহাথেরো সামনে থেকে নামলেন। একখানা চেয়ার এনে দিল মিলিটারি পুলিশ। আমরা গাড়িতে। পাসপোর্ট ও ২৬ জনের নামের তালিকা নিল। তামাক খাওয়ার জন্য আমাদের নামতে হলো। তিনজন ছাড়া গাড়িতে সবাই অধুমসেবী। আমাদের ছাড়া বাকি একখানা গাড়ির বর্মীদেরও নামতে হলো। তাদের পরিচয়পত্র ও মালামাল তল্লাশি হবে। আমাদের প্রচুর খাতির করল। না, ওদের দোষ দেওয়া যায় না। দেশের কানুনের জিম্মাদার তারা, তাদের কাজ তারা করবে। দেশকে তো আর রসাতলে যেতে দিতে পারে না তারা। যে মিলিটারি শাসন আমি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দেখেছি তার তুলনায় এরা এখনও পর্যন্ত দেবদূত।

গাড়ি আবার চলল। দু' পাশে ধানজমি। বিল আর বিল। এত জমি যে চাষ করার লোক নেই। লোকসংখ্যা ৪,৫০,০০,০০০, আর দেশটি বাংলাদেশের সাড়ে চার গুণ বড়। জমি তাই বেশি। ইংরেজদের প্রায় দু' শ' বছর শাসনামলে আধুনিকতার ছোঁয়া পায়, ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশ করে। বড় বড় রাস্তাঘাট তৈরি হয়। পথের পাশে এখনো শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলো গৌরব ঘোষণা করেছে।

আস্বে আস্বে পাহাড়ের চড়াই শুরু হলো। দু' পাশে পাহাড়। ক্রমে উঁচু হচ্ছে রাস্তা। গাছপালা পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো। বুনো লেন্টানিয়া, আসাম লতা, শেয়াল কাঁটা, তুরুম কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়। মূল্যবান কাঠের অরণ্য শুরু হয় নি। অরণ্য-সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা অপার। জনসংখ্যা কম বলে খেয়োখেয়ি ভাগাভাগি লুটপাট নেই অরণ্যের ওপর। ইংরেজ আমলের একটি সুড়ঙ্গ অতিক্রম করলাম। মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি লেখা। সাল ১৯১৯। আসামেও এ রকম সুড়ঙ্গ আছে। সেগুলো দেখেছি রেলপথ সুড়ঙ্গ। গাড়ির সামনে হেডলাইটে আলোকিত, পেছনে অন্য গাড়ি নেই বলে ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্নাতসেঁতে দেয়াল, টুপটুপ পানি ঝরছে পাকা দেয়াল থেকে। অন্ধকার অনুভূতিকে স্বাগত জানাতে সবাই হৈ-চৈ করে উঠল। বাংলাদেশ এমন সুড়ঙ্গ পথ কোথাও নেই। একটু পরে একই কোম্পানির তৈরি আর একটি সুড়ঙ্গ পড়ল। এটি ছোট।

লোকালয়ের নাম কে বলবে? গাইডকে একটা কথা বোঝাতে দশটা কথা খরচ করতে হয়। দু' পাশে বাঁশঝাড়। জুমচাষ হয় না। এই বনে হাতি আছে। ফেরার পথে গাড়ি থেকে একটা বুনো মাতঙ্গ দেখেছি। পুলকও একটা দেখেছে। জানি না ওটা মাতঙ্গিনী কি না। শ্বেতহস্তীর কি দেখা মিলবে। সবাই বলে শ্বেতহস্তী সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। মিয়ানমারের প্রাচীন রাজাদের শক্তিমত্তা প্রকাশ পেত শ্বেতহস্তীর মালিকানা দিয়ে।

আর একটা সামরিক চেকপোস্ট পড়ল। আবার একটা। রাষ্ট্র মানেই তাহলে, 'লেফ্ট-রাইট লেফ্ট-রাইট...।'

সাড়ে ছটায় ভুচিদং পৌঁছলাম। নদীর নাম মায়া, কর্ণফুলীর মতো, আকিয়াব পৌঁছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। সামরিক ও পুলিশের লোক ঘাটের পাশে বাঁধানো চত্বরে আমাদের স্থপ করল। জিনিসপত্র একপাশে গাদাগাদি করা। ঘাটের সঙ্গে এক শতবর্ষী হিজল বৃক্ষ মহোদয়। কী তার তেজ! ফুল ফুটে শেষ হয়ে সারা পুষ্পদণ্ডে বীজ ঝুলছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১২ তারিখ চলছে। ওপাশে তিনটি বিশালকায় বৃষ্টি শিরীষ। মহৎ দুটি তেঁতুল। কূলের রাস্তায় বাজার। মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি সব বিক্রি হচ্ছে। আর অটেল টেকি শাক। এই প্রাক-বর্ষার শাক। বাঁশের শলায় শুয়োরের শিক পোড়া। স্টিমারে বিক্রি হবে, দূরের বাজারে যাবে। সবই থুরুং বা কল্লোং-এ ভরা। পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো। নদীতে প্রচুর মাছ। লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। যেখানে-সেখানে জাল পেতে রেখেছে। হাত জাল বাইছে কূল থেকে। জেলেরা প্রায় সবাই মুসলমান। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বর্মীরা স্টিমারে উঠছে। কুলি অধিকাংশ মুসলমান, তাদের মাঝি বর্মী। কুলির মাথায় জিনিসপত্র দিলে আপনি নিশ্চিন্ত, নিরাপদ। কেউ পালিয়ে যাবে না। আমাদের টেকনাফের কুলিরা আকাশচুম্বি দর হাঁকে, পকেট থেকে সর্বস্ব প্রায় কেড়ে নেয়। ত্যাদরামো নেই এদের, ঝগড়া-ঝাঁটিও না। নাফ নদীর এপার-ওপারে কত পার্থক্য।

এক কুলি বলল, জিনিস নিয়ে পালিয়ে গিয়ে জেল খাটব নাকি! মাঝিকে নিয়ে কুলি নিলে আপনি ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ে দিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের মতো চলতে পারবেন। দরকষাকষি না করতে চাইলে কুলির মাঝিকে বলুন, লেঠা চুকে গেল। ভাড়াও নগণ্য। বাংলাদেশের টাকায় একটা বাকসো এক-দু' টাকা। এবার ভাবুন।

পাসপোর্ট ও কাগজপত্র দেখিয়ে ছাড়া পেলাম। আমাদের লোকজনের ছবি তোলার ধুম পড়েছে। লেফট-রাইট দলে তরুণই বেশি। কারও কারও গৌফ গজিয়েছে মাত্র। নৌকোর মাঝির চুল-দাড়ি দেখে বোঝা যায় জাত-ধর্ম। ঘাটের হুন্টা বাঙালির মতো। চাষবাস, কুলিগিরি, গাড়ি ও পাইক্যা চালানো, দোকানদারি বাঙালিদের জীবিকা। উচ্চ শিক্ষা খুব কম। এমনকি হাই স্কুলেও পড়ে কম। পরিবার পরিকল্পনার বালাই কোথাও নেই। মন্ত্রণালয়ও আছে বলে মনে হয় না। বাঙালির ঘরে ঘরে ৮-১০ জন ছেলেমেয়ে। ঘর থেকে বের হলেই বোরকা ও ছাতা মেয়েদের নিত্যসঙ্গী। আবার মুসলমান মেয়েরা আকিয়াবে বোরকা ছাড়া দোকান করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্মায় ১.৯%। জন্ম-হার বেশি রোহিঙ্গাদের মধ্যে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এটি অন্যতম সর্বনিম্ন হার। ১৯৬৫ সালে বার্মার মোট জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৭ লক্ষ। নামমাত্র বললেও কম হয়। তখন বার্মার স্বর্ণযুগ। সারা বিশ্বে তার চাল রপ্তানি হয়। সুখ তখন বার্মার ঘরে ঘরে।

স্টিমারে চারটি কেবিন ও গোটা সেলুন হলো আমাদের। কেবিনে ঢুকে দেখি হাওয়া ঢোকে না। তিন দিক বন্ধ; জাহাজে যেমনটি হয়। সেলুনের সামনের কাচ তুলে দিলে হাওয়ার তুলকালাম। আকাশ মেঘলা মেয়ের সাজ পরেছে। শাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে রোদের ঝিলিমিলি তীব্র। কূলের ধানজমিতে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি। গ্রাম খুব কম। গরু চরছে। ভাবুক মোষেরা নদীতে নাক ডুবিয়ে পেট ভাসিয়ে, জাবর কেটে তাকিয়ে আছে সুদূরে। বিলের জলায় গা ভাসিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সোনালি লোমের মোষ। কাদা মাখা ধূমল সাদা। এদের মালিক মুসলমান, তাদের গ্রামও চেনা যায় দূর থেকে।

স্টিমারের ডেউয়ের আঘাতে লাফিয়ে উঠছে মাছ। কূলে উঠে যাচ্ছে। এখান থেকে চিংড়ি পাচার হয়ে কক্সবাজারে আসে। সেগুলো বিদেশে রপ্তানি হয় বাংলাদেশি বনে গিয়ে। বাংলার চিংড়ির স্বাদ অনন্য, বিশ্বজোড়া নাম। ওই দেখা যাচ্ছে চিংড়ির ঘের, ওই যে আরও কয়েকটি।

স্টিমার ঘাটে ভিড়তেই চিংড়ি ভাজা, সরু ফালি ফালি করে ছাগলের মাংস ভাজা, গোর্ক ভাজা, পোনা মাছ ভাজা। পলিথিনের মোড়কে বেঁধে শিশু, তরুণী ও যুবতীরা ছুটে আসে বেচতে। বেচাও হয়ে যায়। ঠাণ্ডা বলে খেয়ে দেখার ইচ্ছে চেপে গেছি। তিন ঘাটে স্টিমার ভিড়ল। মিষ্টি পাকা আম টাকায় ৬টি। দু' কিলো তো হবেই। আমাদের এক টাকা দাম, ভাবা যায়? ওদের ১০ চ্যা। হিমসাগর বা লক্ষণভোগের মতো মিষ্টি। প্রায় সবখানে এই লম্বাটে জাতের আম। ঘাটের

দোকানে টেবিল পেতে বিয়ার বিক্রি হচ্ছে। স্টিমারের ছাদে টিনে ভর্তি টাইগার বিয়ার ও বোতলে ভরা মান্দালয় বিয়ার খাচ্ছে তরুণেরা। সুতোর পুলে দাঁড়ানোর মতো টলমল অবস্থা আমার। কলাপাতায় মোড়া নারকোল ও চিনিমাখা চিনি ভাত। পরে জেনেছি এর নাম মো ফে টো। সুস্বাদু। আর আছে ভাজাভুজি। নাপ্পি ও শুয়োরের মাংসের ভাজার গন্ধে ডেক উন্মত্ত। ওপরের ক্লাসে যাওয়ার ঢালাও ছাড়পত্র স্টিমারের এসব বিক্রেতাদের নেই। যাত্রীরা কিনে নিয়ে খেতে পারে।

ওদিকে পাহাড়ের উপর মেঘের রূপসী-নৃত্য। বৃষ্টিও টেনে তুলতে চাইছে পাহাড়ের চূড়া। প্রায় প্রতিটি চূড়ায় চৈত্য। সোয়েডাগঁ প্যাগোডার অনুকৃতি। সোনালি রঙ তার বৈশিষ্ট্য ও গর্ব। এজন্যই তো সুবর্ণভূমি।

ডেকে মাছির রাজত্ব। গন্ধের সাম্রাজ্য। চৈচামেচির সমুদ্র। তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধ মেয়েরা মিলে নারীস্থান। সেখানে টুল ও বেঞ্চিতে খাবার ব্যবস্থা। টেঁকি শাক সেদ্ধ দিয়ে ভাত। অপূর্ব। ভাত প্রায় বিনিভাতের মতো আঠালো। স্যুপে নাপ্পি দিয়েছে। অথচ ঘি এরা খেতে পারে না, বলে দুর্গন্ধ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পরিবারের প্রমদারঞ্জন রায়ের বিখ্যাত 'বনের খবর' বইতে এর মজার বর্ণনা আছে।

মাছি, গন্ধ ও কলহাস্যের ভিড়ে বসে খেলায়। টেঁকি শাক সেদ্ধই একমাত্র উপাদেয়। মুরগির চামড়ায় ছোট ছোট পালক রয়েছে গেছে। নাপ্পির গন্ধ অপ্রতিরোধ্য। অফুরন্ত তার পরাক্রম। তার মধ্যে বলমলে পোশাকে বর্মী মেয়েরা। দেখে বোঝা যায় চেনা যায় না বিবাহিত না অবিবাহিত। গুরু নিতম্ব, ছোট বক্ষসম্পদ, গার্ভারে বাঁধা দীর্ঘ এলোচুল। আর সবার পায়ে দু' ফিতির মজবুত স্যান্ডেল। গরিব কিসানীদের গ্রাম-গঞ্জে চেনা যায়। মাথায় টোকা থাকে, হাতে কাস্তে-কোদাল, কাদা-ধুলোয় মাখামাখি। দেখেছি সূর্যাস্তের আগে সারি বেঁধে ঘরে ফিরছে। কঠোর পরিশ্রমী। শহরেও তারা পরিশ্রমী, তবুও তাদের পোশাক ও মুখের সেনেকার, আর পেলব বাহুতে চেনা যায়।

সেনেকার হলো এক রকম চন্দন কাঠ। চন্দনের মতো পাথরে ঘসে তরল করে মুখে, কাঁধে, বাহুতে, পায়ে মাখে। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি থেকে কোমল ত্বককে রক্ষা করে। এজন্য বর্মী মেয়েদের ত্বক কোমল, লাবণ্যময়, পেলব, দাগহীন। অনেকেরই দুধে-আলতা রঙ। দুধে-আলতা রঙের কথা বইয়ে পড়েছি। এখন চোখে ও মনে দেখছি। মিলিয়ে নিচ্ছি। স্পর্শ কেমন হবে? আচ্ছা, পরে স্পর্শ করলে তার বর্ণনা দিতে কার্পণ্য করব না। কিন্তু করমর্দন বা গায়ে হাত রেখে কথা বলা বর্মার রীতি নয়। দেশি-বিদেশি সবার জন্য এই নিয়ম। ওদের লাবণ্যময় ত্বকের কোনো বর্ণনা তার তুল্য হবে না, তা হবে অনুকৃতির অনুকৃতি। এজন্যই কি প্রোটোর মতে কবিরী (শিল্পীরা) নিকৃষ্ট! বর্মার তন্বী, যুবতীরা নিজেদের ত্বকের এমন পরিচর্যা করে বলেই গর্ব করার অধিকার রাখে। অনেকে ত্বক নিক্কলঙ্ক ও কোমল রাখার জন্য সারা শরীরে সেনেকা মাখে।

রাস্তায়, দোকানে, নাপিতের দোকানে, চায়ের রেস্টুরায় সুন্দর-সুন্দরী মডেলদের কেবল সুরার বিজ্ঞাপন। আমার কাঁধের ব্যাগে এখন লন্ডন সিগারেট স্থান করে নিয়েছে। কুড়ি টাকায় কুড়িটা। ঢাকা থেকে মার্লবোরো দেশলাই নিয়ে এসেছি পাঁচ-ছয় বাকসো। লেফট-রাইট সরকার হয়তো বলতে চাইছে খাও-দাও মৌজ করো, নেতা হতে চেয়ো না। রাজনীতি থেকে সরে যাও। মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন তুলে রাখো তাকিয়ায়। আগে দেশ, পরে ব্যক্তি।

আকিয়াব বা সিটউই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা-গুরু কর্মীর হাতে পড়লাম ঝামেলায়। ছোট ঝামেলা। দেশলাই নিয়ে বিমানে চড়া নিষেধ। পকেট থেকে একটা দেশলাই নিরাপত্তা কর্মীর হাতে তুলে দিলাম। মার্লবোরোর বিজ্ঞাপন মার্কী দেশলাইয়ের বাকসোটা প্রজ্ঞাপতি দেয়াশলাই বাকসো থেকে দ্বিগুণ বড়। কাঁধের খলে থেকে আরেকটা বের করে দিলাম। হেসে রেখে দিল। দিল ধন্যবাদ। আর একটি দিলাম। বলল ধন্যবাদ। আর একটা তুলে দেই হাতে। বলল ধন্যবাদ। ওর টেবিলের একপাশে পাঁচটি জমা হলো। বললাম লন্ডন জ্বালব কী দিয়ে? সে হাসে। বলল, ইয়াসুনে অনেক আছে। বললাম, ধন্যবাদ।

মিয়ানমার এয়ারওয়েজের ফকার ২৭ বিমান আকাশে উঠল দৌড়ে! নিচে প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় বন্দর, পুরনো আকিয়াব বন্দর। বদ্বীপ, পাহাড়-ঘেরা মোহনা। কচ্ছপের মতো দীর্ঘ মুখ বলে এই নদীর নাম কচ্ছপমুখ। আকাশ থেকে ভারি সুন্দর। মোহনা থেকে বের হওয়া পাহাড় সমুদ্রে গিয়ে দ্বীপ হয়ে আছে। ঢেউয়ের ফেনায় তটরেখা সাদা। নীল জলরাশি দক্ষিণ থেকে ঢেউয়ের অলঙ্কার। মাইলের পর মাইল শুধু দ্বীপ, বদ্বীপ, পাহাড়, নদী-মুখ, উপদ্বীপ। কখনো পাহাড়ি, কখনো সমতল। গাছপালায় ঠাসা। অন্তহীন যেনবা। আকাশে তরতর করে উঠে যাচ্ছি। কম জলীয় বাষ্প নিয়ে শুভ্র মেঘের টুকরো বিমানের গায়ে আছড়ে ছিটকে যাচ্ছে। এবার মেঘের উপরে চড়ে বসেছি। এবার হালকা ধূসর চলিষ্ণু মেঘ এসে নিচের সাদা মেঘ আড়াল করে দিয়েছে। পাশ দিয়ে নীল পোশাক পরা বিমানবালা লাস্য সামলে-সুমলে ছোট্টাছুটি করছে। সামলাতে চাইলেও কি সব ঠিকমতো আয়ত্তে থাকে। এ সময় ওরা খুব ব্যস্ত। অকারণে হাসি খরচ করারও সময় নেই। কফি দিয়ে গেল হাসিসহ। আগে দিয়েছে হাসিছাড়া খাবার। সব মিশিয়ে চুমুক দিলাম। আহ, উষ্ণ ও আরামদায়ক। খিদেও পেয়েছে, তৃষ্ণার্তও।

একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে। জগতের সব শিশু ও বড়দের কান্নার ভাষা এক রকম। সব মা বাচ্চার কান্না শুনে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ নিচে চোখ পড়তেই দেখি জলরেখা। সেই হাজারো নদীর জাল। তার উপরে মেঘের বিচিত্র কারুকাজ।

ইয়াসুনের কাছাকাছি এসে পড়েছি। একটি শতছিন্ন হ্রদ। অদূরে কুয়াশা-

গোত্রের মেঘ দৃষ্টি আটকে দিয়েছে। আরও একটি বিশাল হ্রদ বা জলাভূমি। ওপাশে বিশালপ্রায় অরণ্য। বোধহয় খারাবড়ির অরণ্য। ১৯৩০ সালে বর্মীরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে কার্যকরভাবে। খারাবড়িতে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। বজ্রধ্বনি উঠল, 'বার্মা একমাত্র বর্মীদের।' ডা. সায়াসান নেতা। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পরাজিত হয়ে বর্মীদের জয় ও স্বাধীনতা ঘোষণা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কুটিল ও খল ইংরেজ পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে। শক্তি সঞ্চয় ও সংহত করে নানা ছলচাতুরিতে বর্মীদের ওপর ফের দমননীতি চালিয়ে দেয়।

কয়েকটি বর্মী টিপস নিন। লোকজনের সামনে দিয়ে যেতে বা পার্টি ও উৎসবে মানুষের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় একটু নিচু হয়ে হেঁটে যাওয়া ভদ্রতার সংজ্ঞায় পড়ে। উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার মোটেই শোভন মনে করে না বর্মীরা। শান্তভাবে কথা বলুন, দেখবেন অনেক বিপদ ও খারাপ অবস্থা থেকে চমৎকারভাবে বেরিয়ে এসেছেন। বার্মায় অর্ধনগ্ন হয়ে কেউ চলে না, আপনি বিদেশি হলেও পোশাক ভদ্র করুন। পথঘাটে নিজ দেশের সঙ্গিনীকেও চুমু দিয়ে সোহাগ জানাতে নেই, গভীর আলিঙ্গন অচল। রেস্টুরায় বেয়ারাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিৎকার করে ডাকতে নেই। দেরি করছে বলে রাগারাগি করা অশোভন। এই স্বভাব বর্মীদের অপছন্দ। আঙুল দিয়ে ওয়েটারকে ডাকবেন না। বরং হাত তুলে বুড়ো আঙুল তুলে ধরুন। 'ওয়ে' বলে ডাক দিন। ওতেই কাজ হবে, আর মৃদু হাসি বা এক গাল হাসি খরচ করলে আপনার লাভের অঙ্ক বেড়ে যাবে।

প্রত্যেক দেশের খাবারে সে-দেশের স্বকীয় সুবাস আছে। এই স্থানীয় সৌরভ তার পরিচয়। কাজেই বাড়ির মতো বা নিজের রুচিসম্মত হয় নি বলে চিৎকার করার চেয়ে নতুন খাবার গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে চেষ্টা করুন। হাসি মুখে বলুন, ওদের মেয়ে ওয়েটারদের মন জয় করতে পারবেন। কুমারীর মন পেতে হলে আনুগত্য দেখাতে কার্পণ্য করবেন না। আত্মসমর্পণ করুন, কাজ হবে। আপনার অসুবিধা দূর করতে তৎপর হয়ে উঠবে।

শোয়েডার্ম প্যাগোডা

২৭ মে। ইয়াঙ্গুন পৌঁছেই খাইয়ে-দাইয়ে আমাদের নিয়ে গেল শোয়েডার্ম প্যাগোডায়। বাসে ওঠার সময়ও বুঝতে পারি নি আশ্চর্য এক বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। শোয়েডার্ম প্যাগোডা বিশ্বের বিস্ময়, মিয়ানমারের হৃৎপিণ্ড। তেমনি রহস্যময় ও বোধের অতীত।

এই প্রসঙ্গে কিংবদন্তির পল্লীগীতি গায়ক আব্বাস উদ্দীনের কিছু কথা তাঁর আত্মজীবনী 'আমার শিল্পীজীবনের কথা' বই থেকে তুলে ধরতে চাই। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে এসেছি—যেটা হচ্ছে খুব বড় বড়

মুসলমানবিদ্বেষী হিন্দু বন্ধুদের বাড়িতে মগরেবের নামাজের সময় যখন নামাজ পড়বার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছি তখন তাঁরা অতি সমাদরে বাড়ির সবচাইতে ভালো কামরাটায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তোয়ালে বা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে নামাজ পড়তে বলতেন। এই জায়গায় হোঁচট খেয়েছি। কারণ এক ঘণ্টা আগে বন্ধুর কাকার সাথে ধর্মালোচনা করতে গিয়ে কী বাগবিতণ্ডাই না হতে যাচ্ছিল আর যেই নামাজ পড়বার জন্য মনোভাব ব্যক্ত করেছি অমনি বাড়ির সবচাইতে ভালো ঘরটাতেই তার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো।

“নামাজ পরে শান্ত সমাহিত চিন্তে বন্ধুর কাকার সাথে কথা বলতে গিয়ে কাকা বলে উঠলেন—কী বাবা, ধর্মের তর্ক আর করবে? বাইরেই আমরা মিছামিছি তর্ক করে মরি। চোখ বুজে ভগবানকে ডাকতে গিয়ে তুমিও যাকে ডাক আমিও তাঁকেই ডাকি, কাজেই ও-সময়টা বড় শান্তির সময়। আর এ কাজ যারা করে আমরা সত্যিই তাদের ভালোবাসি।

“আমার মনে একটা জিজ্ঞাসার আজো কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। ১৯৫৫ সালে আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় যাই। সেখান থেকে ফেরার পথে রেঙ্গুন আসি। রেঙ্গুনে প্যাগোডা দেখবার মতো জিনিস। লাখে লাখে টাকার হীরা মোতি মাণিক্যের মুকুট চন্দ্রহার দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে এক একটা বুদ্ধমূর্তি। এমনি এক বুদ্ধমূর্তির সামনে এক নবীন দম্পতি চোখ বুজে জোড় হাত করে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। চিরকালই প্রার্থনারত লোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার বড় ভালো লাগে। নামাজরত নামাজীর দিকে চেয়ে থাকতে ভালো লাগে। প্রতিমার সামনে পুরোহিতের একাধিচিন্তে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে চেয়ে থাকতে দেখা ভালো লাগে। বৌদ্ধ দম্পতির দিকে তেমনি চেয়ে আছি। অকস্মাৎ দেখি ওঁদের চোখ বেয়ে নেমেছে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রুর ঢল। তেমনি মূর্তি আর জীবনে দেখি নি। বুদ্ধের মূর্তির সামনে শান্ত-সমাহিত দম্পতি-যুগল চোখের পানিতে সেই মূর্তিকে করছে স্নানসিক্ত।

“আমি খোদাকে তখন মনে মনে ডেকে বলেছি—খোদা এরা চোখ বন্ধ করে চোখের পানিতে তোমাকে ডাকছে, এদের তুমি উদ্ধার করবে না, যারা চোখে চেয়ে ধর্মের নামে ডাকাতির বেসাতি করছে তাদের তুমি বেড়া পার করবে?”

আকৃতি বিস্তার ও মহনীয়তায় প্যাগোডা হিসেবে এটা কম্বোডিয়ার এ্যাংকর ওয়াট, ইন্দোনেশিয়ার বোরবুদুর বিহার ও বাংলাদেশের পাহাড়পুর বিহারের সঙ্গে তুলনীয়। তবে জন্মকালো সাজসজ্জার জন্য শোয়েডার্গ প্যাগোডা অনন্য। বিশ্বের চতুর্দশ আশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়। ‘শোয়ে’ অর্থ সোনালি, ‘ডার্গ’ হলো ইয়াঙ্গুনের পূর্বতন নাম। কাজেই শোয়েডার্গ প্যাগোডা হলো মিয়ানমারের সোনার প্যাগোডা। মিয়ানমারের আর কয়েকটি বিখ্যাত প্যাগোডা হলো পাগান বা

বাগানের শোয়েজিগ, বাগের শোয়েমদউ এবং পিয়ের (Pyoy) শোয়েসানদ
প্যাগোডা, মান্দালয়ের শাক্যমুনি।

মিয়ানমারবাসীদের বিশ্বাস শোয়েডাগ ২৬০০ বছর আগে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের
আমলে নির্মিত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাচীন বার্মার দুই ব্যবসায়ী তপসু ও
ভল্লিক মন (Mon) রাজ্য থেকে জাহাজ ও ৫০০ শকট নিয়ে ভারতে ব্যবসা করতে
যান। তাঁরা গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের ৪৯ দিনে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি
তখন পিয়াল গাছের নিচে বসে ধর্মকথা বলছিলেন। বুদ্ধের কাছে দুই ভাই দীক্ষা
গ্রহণ করেন। তাঁরা গৌতম বুদ্ধকে মধুমাখা চ্যাওয়েট চ্যা নামক পিঠে দান করেন।
বুদ্ধ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আট গাছি চুল দান করেন। দুই ভাই ব্যবসা-বাণিজ্য
করে নিজ শহর উক্কালপা (ইয়াঙ্গুনের প্রাচীন নাম) ফিরে আসেন। উক্কালপার রাজা
এই পবিত্র চুল জেদি বা প্যাগোডা অর্থাৎ শোয়েডাগ স্থাপন করে তাতে স্থাপন
করেন।

প্রথম যখন শোয়েডাগ নির্মিত হয় তার উচ্চতা ছিল ৬৬ ফুট। পাহাড়টির নাম
ছিল সিন্ধুস্তর। কথিত আছে এখানে আগের তিন বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত
ছিল। সেগুলো হলো ককুসন্ধ বুদ্ধের জল ছাঁকনি, কোনাগমন বুদ্ধের চীবর ও
কাস্যপ বুদ্ধের ব্যবহৃত দ্রব্য। বৌদ্ধমতে গৌতমের আগে ২৭ জন বুদ্ধ পৃথিবীতে
আসেন।

বর্তমানে এই প্যাগোডার যে উচ্চতা তা ১৪-১৫ শতাব্দীতে মন রাজা ও রানীর
পুনর্নির্মাণের ফল। প্যাগোডার চূড়ার নতুন ছাতা, বৃহদাকার ঘণ্টা, মণি-মাণিক্য ও
সোনার জৌলুস, বিশ্রামাগার, মিউজিয়াম ও প্রার্থনাঘর একে একে স্থাপন করা হয়।
বর্তমানে মূল প্যাগোডার উচ্চতা হলো ৩২৬ ফুট এবং ভিত্তিমূলের পরিধি ১,৪২০
ফুট।

বানয়া-উ (Banyau-১৩৫৩-১৩৮৫) হানথাওয়াঙ্গি বা বাগের রাজা হলেন।
তিনি শোয়েডাগকে ৪০ কিউবিটস (১কিউবিটস হলো ১৮' থেকে ২১') বড়
করেন। তিনি চারদিকের ঘেরা তুলে আরো বড় করলেন। মন রাজা এসে আরো
বড় করলেন। সবচেয়ে বড় আকার পায় রানী শিন্সবুর (Shinsawbu ১৪৫৩-
১৪৭২) সময়। তিনি ছিলেন বানয়া-উ রাজার পৌত্রী। তিনি হানথাওয়াঙ্গি বংশের
স্রষ্টা। তাঁর পিতার নাম রাজাধিরাজ (১৩৮৫-১৪২৩)। মন মহাকাব্য 'আক্রাম
কামরাও লেউই রাজাধিরাজ' (রাজাধিরাজের যুদ্ধ)-এর বীর ছিলেন এই
রাজাধিরাজ। শিন্সবু ১৪৫৩ সালে ৫৯ বছর বয়সে হানথাওয়াঙ্গির সিংহাসনে
বসেন। মৃত্যুর ১৯ বছর আগে তিনি ধর্মীয় কাজ শুরু করেন। তাঁকে সাহায্য করেন
তাঁর জামাতা ধম্মজেদি। শোয়েডাগ-র ইতিহাসে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।
শোয়েডাগ প্যাগোডার চারদিকের দেয়াল পাহাড় সমান করে নতুন করে নির্মাণ
করেন। সীমানার মধ্যে নারকোল গাছ রোপণ করেন। প্যাগোডার ব্যয়ভার

চালানোর জন্য তিনি ২,২৫,০০০ একর (৯,০০০ হেক্টর) জমি দান করেন। তাঁর শেষ জীবনে তিনি প্যাগোডার পাশে রাজবাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করেন। তিনি প্যাগোডার দিকে তাকিয়ে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজা ধম্মজ্জেনি ও তাঁর রানী শরীরের ওজনের সমান সোনা দান করে প্যাগোডায় ব্যবহার করেন। তিনি ৮ কিউবিট মাপের মুখ এবং ১২ কিউবিট উঁচু একটি বিশাল ঘণ্টা দান করেন।

বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূবে অবস্থিত মিয়ানমার তখন রুবি পাথরের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য থেকে ব্যবসায়ীরা আসতে থাকে। ১৬ শতাব্দীতে শোয়েডার্গ প্যাগোডা পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাসপারো বালবি (Gasparo Balbi) নামক ভেনিসের এক রত্ন ব্যবসায়ী ১৫৮৩ সালে শোয়েডার্গ দেখে তার উচ্চশিত প্রশংসা করেন। ডি ব্রিটো (De Brito) নামক এক পর্তুগিজ ১৬০০ থেকে ১৬১৩ পর্যন্ত থানলিন (বা সিরিয়াম) দখল করে নেন। তিনি প্যাগোডার বিশাল ঘণ্টা দিয়ে কামান তৈরির জন্য সেটি জাহাজে তোলেন। কিন্তু ইয়াঙ্গুন ও সিরিয়াম মধ্যবর্তী নদীতে সেটি ডুবে যায়। সেটি আজও নদীতে রয়ে গেছে।

রাজা আনauকপেটলান (Anauketun ১৬০৫-১৬২৮) ইনওয়ার রাজা হয়ে ডি ব্রিটোকে হটিয়ে দেন। ১৬১৩ সালে তিনি থানলিন দখল করেন এবং সেই স্মৃতির স্মারক অনুযায়ী শোয়েডার্গ প্যাগোডার জন্য একটি বিশাল ঘণ্টা ও ছয় বছর পর প্যাগোডার শীর্ষের জন্য ছাতা দান করেন।

ইতিমধ্যে দু' বার ভূমিকম্প হয়ে শোয়েডার্গ প্যাগোডার ক্ষতিসাধিত হয়। শেষটি হয় ১৭৬৮ সালে। এতে প্যাগোডার মোচাকার চূড়া পড়ে যায়। রাজা সিনবাইউশিন (Hsinbyushin ১৭৬৩-১৭৭৬) প্যাগোডা পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দেন। তিনি রাজা আলুংপায়ার (Alaungpaya) পুত্র ও কনবাযুং রাজবংশের তৃতীয় রাজা। তিনি বীর যোদ্ধা নামে খ্যাত। ১৭৬৭ সালে তিনি শ্যামদেশের অযোধ্যা (Ayutthaya) জয় করেন। তিনি শোয়েডার্গ প্যাগোডার বর্তমান আকৃতি দান করেন। তিনি তাঁর শরীরের ওজনের সমান ১৭০ পাউন্ড সোনা (৭৭ কিলো) দান করেন। ১৭৭৫ সালের ১৫ মার্চ প্যাগোডায় নতুন ছাতা স্থাপন করেন। তিনি নতুন একটি ঘণ্টা দান করার ঘোষণা করলেও মৃত্যু তাঁকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যায়। তাঁর পুত্র সিন্ধু (১৭৭৬-১৭৮১) পিতার আরন্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। এই ঘণ্টার ওজন ২৫ টন, ১৭৭৯ সালের ১৭ জানুয়ারি সেটি স্থাপন করেন।

সিনাবাইউশিনের প্যাগোডা সংস্কার কাজের ৫০ বছর পর ইয়াঙ্গুন হয়ে পড়ে যুদ্ধবিগ্রহের স্থান। এছাড়া সীমান্তে অনেক সংঘর্ষ হয়। মিয়ানমারের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ শুরু হয়। এ সময় স্যার আরচিবোল্ড ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ অভিযান হয়। ১৮২৪ সালের ১১ মে আরচিবোল্ড ইয়াঙ্গুনের শোয়েডার্গ

প্যাগোডায় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন। শোয়েডার্গ প্যাগোডা তখন ইয়াঙ্গুনের এক পাশে অবস্থিত ছিল এবং সেখান থেকে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা ছিল সুবিধাজনক। বিখ্যাত মিয়ানমার জেনারেল মহাবঙ্গুলকে তখন চট্টগ্রাম ফ্রন্ট থেকে ডাকা হয়। তিনি সেখানে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। তাঁকে ইয়াঙ্গুনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ডাকা হয়। ১৮২৪ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে এসে তিনি ইয়াঙ্গুন ফ্রন্টের দায়িত্ব নেন। তিনি ইয়াঙ্গুনের চারদিকে পরিখা খনন করান। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তাঁর অভিযান শুরু করেন। লেফটেন্যান্ট মহামিনহ্লায়াজা উত্তর দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেন। সেদিকে ছিল গাছপালা-ঘেরা অঞ্চল। মহামিনহ্লায়াজা ছিলেন মহাবঙ্গুলের চট্টগ্রাম অভিযানের লেফটেন্যান্ট। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলেও তাঁরা ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্রবল এবং সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য এঁটে উঠতে পারেন নি। মহাবঙ্গুল তখন ৬০ মাইল দূরে ইয়াঙ্গুনের উত্তর-পশ্চিমে ডানুবাইউতে (Danubyu) সরে যান।

ব্রিটিশরা এ সময় শোয়েডার্গ প্যাগোডার বাইরের সব মূল্যবান জিনিসপত্র খুলে আত্মসাৎ করে। এছাড়া তারা সিঙ্গু রাজার দেওয়া ঘন্টাও দাবি করে বসে। কিন্তু এই ঘন্টাটিও নদীপথে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়ার সময় ডুবে যায়। ব্রিটিশরা এটি উদ্ধার করতে পারে নি। পরে ইয়াঙ্গুন কর্তৃপক্ষ এটি উদ্ধার করে।

পরে রাজা থারাওয়াদি (Tharyarwady ১৮৩৮-১৮৪৬) ১৯৪১ সালের অক্টোবরে এসে পাঁচ মাস ইয়াঙ্গুন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি শোয়েডার্গ প্যাগোডার সংস্কার করেন। তিনি তাঁর শরীরের ওজনের সমান ১১৫ পাউন্ড (৫২ কিলো) সোনা দান করেন প্যাগোডার সজ্জার জন্য। তিনি ৪২ টন ওজনের লোহার একটি ঘন্টা দান করেন।

দশ বছর পরে থারাওয়াদি আবার ইয়াঙ্গুন আসেন। এ সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয়। ব্রিটিশরা শহর আক্রমণ করে শোয়েডার্গ প্যাগোডা আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেয়। ১৮তম আইরিশ রেজিমেন্টের কর্নেল কুট (Colonel Coote) পূর্ব দিকে প্যাগোডা আক্রমণ করেন। তিনি এই যুদ্ধে আহত হন। ব্রিটিশরা প্যাগোডা দখল করে নেয়। মিয়ানমার সৈন্যরা ইয়াঙ্গুন ছেড়ে চলে যায়।

ব্রিটিশরা দ্বিতীয়বার প্যাগোডা লুট করে। ব্রিটিশ মেজর ফ্রাসের (Fraser) প্যাগোডার অভ্যন্তরের গুহায় প্রবেশ করেন। পরে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি এজন্য একটি ডিক্রি জারি করেন এবং ভবিষ্যতে কোনো প্যাগোডা অপবিত্র করার জন্য শাস্তি ঘোষণা করেন। কারণ অভ্যন্তরের গুহায় পবিত্র চুল রক্ষিত আছে। বর্মীরা সেখানে ব্রিটিশদের প্রবেশে চরম অপমান বোধ করেন।

তারপর আস্তে আস্তে ব্রিটিশরা মিয়ানমার সম্পূর্ণ দখল করে নেয়। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সঙ্গে প্যাগোডার ইতিহাসও জড়িত। ১৯২৯ সালে শোয়েডার্গ প্যাগোডা মিয়ানমারের হাতে যায়। ১৮৫২ সালের পর প্রায় ৮০ বছর

এভাবে ব্রিটিশদের হাতে থাকে। ১৯৩০ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিম দিকের সিঁড়ি খোলা হয় ভক্ত জনসাধারণের জন্য। পরের বছর ৬ মার্চ একটি অস্থায়ী নির্মাণ কাঠামোতে আগুন ধরে গেলে পশ্চিমের সিঁড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ২৩টি নির্মাণ কাঠামো ধ্বংস হয়। ফলে উ অউং গী নামক পশ্চিমের প্রার্থনা ঘর পুড়ে যায়। এ সময় মিয়ানমারে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। পরে সবগুলো কাঠামো নির্মাণ করা হলেও কোনো কোনোটি আগের সৌন্দর্য ফিরে পায় নি।

১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালে শোয়েডার্গ প্যাগোডার প্রভূত সৌন্দর্যসাধন ও বিনির্মাণ কাজ চলে। এ সময় সিঙ্গুস্তর বাগান নির্মাণ করা হয় ৮.৫ মিলিয়ন চ্যা খরচ করে। মিউজিয়াম, লাইব্রেরি ও আর্কাইভস নির্মাণে ৩৭.৫ মিলিয়ন চ্যা খরচ হয়। বুদ্ধ মিউজিয়ামে খরচ হয় ১৮ মিলিয়ন চ্যা।

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভূপাল থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত সাঁচী স্তূপের আদলে শোয়েডার্গ তৈরি। আবার শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরের থুপরাম প্যাগোডার আদলও নিয়েছে। শ্রীলঙ্কার রাজা দেবানামপিয় তিস্স (২৪৭-২০৭) খ্রি. পূ. সালে থুপরাম নির্মাণ করেন। তাঁকে দীক্ষা দেন মহামতি অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ভিক্ষু। এই দুই স্তূপের অনুকরণে নির্মাণ করার কারণ নির্মিতব্য শোয়েডার্গ প্যাগোডায় বুদ্ধের পবিত্র চুল রাখা হবে।

শোয়েডার্গ প্যাগোডা তিনটি মৌলিক বিশেষত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলা যায়। এর মূল ভিত্তিভূমিতে তিনটি চত্বর আছে। পরে ওপরে উঠে সেগুলো বিলীন হয়ে গেছে। এই চত্বরগুলো চারকোণা বেসের ওপর দাঁড়ানো। এই চারকোণা বেসগুলো ২১ ফুট করে উঁচু। এই চত্বরকে বলে ‘পচ্চায়া’ বা ভারবহনকারী। প্যাগোডার এই একটি মাত্র অংশের নাম পালিতে আছে। শোয়েডার্গের চত্বর আট কোণবিশিষ্ট। এরপর আছে আটটি খাঁজ। তারপর ক্রমান্বয়ে চাকর বেড়, কোমরবন্ধ, পাঞ্জাই বা ফেস্টুন বা ঝোলানো মালা, উদগত কুণ্ডলী বা হপাউং ইট, কমণীয় পদ্ম, ওল্টানো পদ্মপাপড়ি, কাচের গোলক, উদগত পদ্মপাপড়ি, কমণীয় পদ্ম, কলার মোচা, ছাতা, পাইনের কুঁড়ি, পবিত্র পাখির বিশ্রামাগার এবং সবশেষে হীরের কুঁড়ি। সব মিলে উচ্চতা ৩২৬ ফুট।

ভিত্তির ওপর অন্যান্য যত ভবন আছে তাদের নাম তাজাউংস্। সেগুলো নানা আকৃতি ও স্টাইলের। এগুলো প্রার্থনার জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয়। চারটি প্রধান প্রার্থনাঘর আছে। এগুলো সাধারণত ইটের তৈরি। মিয়ানমারের ঐতিহ্য অনুযায়ী এগুলো নির্মিত। অনেকগুলো ছাদবিশিষ্ট এসব প্রার্থনাঘর এক কথায় অপূর্ব।

হলগুলোতে কাঠের কাজ বিস্ময়কর সুন্দর। এই কাঠের কাজে জাতকের কাহিনী চিত্রিত রয়েছে। বুদ্ধের জীবনী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাও আছে। দ্বিতীয় রকম কাঠের কাজে চিত্রশিল্পেরও মিশেল থাকে। সমতল কাঠের ওপর এসব চিত্রিত। কাঠের স্ক্রিন কারভিংগুলোও সুসজ্জিত। এখানেও বুদ্ধের জীবন, জাতক,

ঐতিহাসিক কাহিনী চিত্রিত। চিত্রিত পারাবেইক (ফোল্ডিং-বই) মিয়ানমারের শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এসব কাজে মান্দালয়ের সয়া থান্ট (Saya Thant) এবং উ শয়ে তাউং (U Shwe Taung), উ বা থিন (U Ba Thin) বিখ্যাত।

কিছু কিছু প্রার্থনা হলের স্তম্ভ ও ছাদ কাচের মোজাইক দিয়ে চিত্রিত। এই কাজও মিয়ানমারের নিজস্ব। অথবা থাইল্যান্ড থেকে এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এর অসাধারণ সৌন্দর্য ও জৌলুস আপনাকে মুগ্ধ করবে। আর পরবর্তীকালের ও আধুনিক কালের কাচের মোজাইকের কাজ ঝলমল সৌন্দর্য ও দ্যুতিকে কেউ কেউ বাড়াবাড়ি বলেও মনে করে থাকেন। তবে প্রাচীন কাজগুলোর মধ্যে উত্তর প্রান্তের প্রার্থনা ঘর, ধারাওয়ার্দি হলঘরের ঘন্টা, ড. উ ন্যু (Dr. U Nyo) হল প্রসিদ্ধ এই অসাধারণ কাচের মোজাইক কাজের জন্য। এর রঙ ও জৌলুস অপরূপ।

শোয়েডার্গ প্যাগোডার প্রাটফরমে অনেকগুলো বুদ্ধ রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হল চারটি। চারটি প্রধান কোণে চার বুদ্ধ-পূব দিকে ককুচ্ছন্দ বুদ্ধ, দক্ষিণে কোনগমন বুদ্ধ, পশ্চিমে কাস্যপ বুদ্ধ ও উত্তরে আছে গৌতম বুদ্ধ। এছাড়া আরও বড় বড় বুদ্ধমূর্তিও আছে। ভক্তরা তাঁদের কাছে বর প্রার্থনা করে এবং জীবন্ত বরদাত্তী বলে বিশ্বাস করে।

পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ সচরাচর আমরা দেখি। বাঁ হাত কোলে এবং ডান হাত থাকে ভূমিতে স্পর্শ-করা। এর নাম ভূমিস্পর্শ মুদ্রা। সিদ্ধার্থ যখন জ্ঞানলাভ করেন তখন এভাবে ধরিত্রীকে সাক্ষী করেছিলেন তাঁর অধীত জ্ঞান সম্পর্কে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই বুদ্ধমূর্তির আবির্ভাব হয় গান্ধারায়। বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তান অঞ্চলে গ্রিক ও ভারতীয় ভাস্কর্যের সম্মিলনে গান্ধারা শিল্পের উদ্ভব। সেই আফগানিস্তানে এখন আর বুদ্ধমূর্তি নেই। ২০০১ সালে তালেবানরা আফগানিস্তানের সমস্ত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের যাবতীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন যা বিভিন্ন মিউজিয়ামে ছিল সব ধ্বংস করে ফেলে। সে অন্য প্রসঙ্গ, তা এখানে লেখার বিষয় নয়। মিয়ানমারে গান্ধারা শিল্পের প্রভাব আসে ৫ম শতাব্দীতে শ্রীক্ষেত্রে (Sriksetra)। ইয়াঙ্গুন থেকে এর দূরত্ব ২৯০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে।

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ যখন ধরিত্রীকে সাক্ষী করেন তখন ধরিত্রী দেবী বসুন্ধরী মাটি থেকে উঠে এসেছিলেন বলে মিয়ানমারবাসী মনে করেন। বসুন্ধরীর চুল থেকে তখন ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। এর আগেও বুদ্ধ বসুন্ধরীর অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব মুহূর্তে বুদ্ধ মার নামক অপশক্তির সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। বসুন্ধরী তখন মাটি থেকে উঠে এসে পাঁচটি প্রবল জলধারায় মার সৈন্যদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মিয়ানমারের মূর্তি-শিল্পে এই বসুন্ধরীর আলাদা মূর্তি আছে। তাঁর চুল থেকে পানি পড়ার দৃশ্য তাতে পরিস্ফুট।

বুদ্ধের শরীরে থাকে সাধারণ চীবর। তাঁর ডান কাঁধ খোলা থাকে। বাঁ কাঁধ থেকে চীবরের একাংশ নিচের দিকে নেমে আছে দেখা যায়। অল্প কিছু বুদ্ধের গায়ে

দেখা যায় চীবর দুই কাঁধ থেকে নেমে বুকের দু' দিকে অতিক্রম করে গেছে।

বাংলাদেশে ১০ম শতাব্দীতে বজ্রযান ধারার কালে মুকুট পরিহিত বুদ্ধ দেখা যায়। মিয়ানমারে এই বুদ্ধের আবির্ভাব হয় বাগান অঞ্চলে। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কনবাউং (Konboun) শাসনামলে এই বুদ্ধ বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

শোয়েডাং প্যাগোডায় ঢোকার জন্য চার কোণে চারটি সিঁড়ি রয়েছে। পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়ে রানী শিনসাবু (Shinsawbu) শোয়েডাং প্যাগোডা দেখতে ও প্রার্থনা করতে আসতেন। এই পথে এখন সাধারণত বিদেশিরা প্যাগোডায় আসেন। বর্তমানে এখানে লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে। আমরা এই পথে প্যাগোডা দর্শন করতে যাই। এখানে বিদেশিদের জন্য রেজিস্ট্রেশন খাতা আছে। এর পাশেই আছে সিন্ধুস্তর বাগান। এটি ১৯৯০ সালে নির্মিত।

চারটি প্রবেশ পথের মধ্যে পূব দিকের সিঁড়িটিই সবচেয়ে দীর্ঘ। এটি বাহান বাজারের দিকে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই বাহান গ্রামে প্যাগোডা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নারী-পুরুষেরা বাস করতেন। এই পথের পাশে আছে ডুরিয়ান বাগান (Durian Garden)।

উত্তর দিকের সিঁড়িটি খুব প্রাচীন। প্রাচীন ইয়াঙ্গুন শহর থেকে এই পথে পুণ্যার্থীরা প্যাগোডা দর্শনে যেতেন। নদীর কাছেই এই পথ। এই পথ দিয়ে ভেনিসের বণিক গ্যাসপারো বালবি (Gasparo Balbi) ১৭৮৩ সালে প্যাগোডা দর্শন করেন। আগে এদিকে ধর্মজৈদী ঘন্টা ছিল। সেটি পর্তুগিজ ভ্রমণকারী ফিলিপি ডি ব্রিটো (Filipe de Brito) নিয়ে যান। এই সিঁড়ির গোড়ায় আছে দুটি বড় সিংহ। এগুলো একান্তভাবে মিয়ানমারের বলা হয়। বালবি যে বাঘের কথা বলেছেন তা এগুলো নয়। কারণ এগুলো ১৮৮৭ সালে নির্মিত। সিংহ শুধু রাজাদের শৌর্যবীর্যের প্রতীক নয়, সিংহ বৌদ্ধ ধর্ম ও শিল্পে প্রবলভাবে উপস্থিত। গৌতম বুদ্ধকে বিভিন্ন সময়ে শাক্যসিংহ বলা হয়, কারণ তিনি শাক্যবংশে জন্মেছিলেন এবং তিনি শাক্যদের মধ্যে ছিলেন সিংহ। প্রাচীনকাল থেকে এই সিংহ ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্তূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

পশ্চিম প্রবেশ দ্বারের শেষে আছে পশ্চিম দিকের হলঘর। একে দু' খণ্ড হলঘরও বলে। এই প্রবেশপথের নিচে আছে বিখ্যাত সুরতি বাজার। এই বাজারটি ২.৪ কিমি দীর্ঘ।

পশ্চিমের প্রবেশপথের হলের উল্টো দিকে আছে পশ্চিমের নিবেদন হলঘর। উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে আট বুদ্ধ ও আট গ্রহ। প্যাগোডার কুলুঙ্গিতে আটটি গ্রহের আটটি প্রাণীর প্রতীক রয়েছে। এই সঙ্গে ছাব্বিশ জন বুদ্ধের মধ্যে আট বুদ্ধের প্রতিকৃতি আছে। তাঁরা হলেন—শিখি (২৩তম) উত্তর-পূবে, ককুচ্ছন্দ (২৫তম) পূবদিকে, দীপঙ্কর (৪র্থ) দক্ষিণ-পূবে, কৌণ্ডিয়া (৫ম) দক্ষিণে, বিপাস্মি

(২২তম) দক্ষিণ-পশ্চিমে, পদুমুত্তর (১৩তম) পশ্চিম দিকে, কোনাগমন (২৬তম) উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং গৌতম বুদ্ধ (২৮তম) উত্তর দিকে।

পশ্চিম দিকে আছে সিঙ্গুর বিখ্যাত ঘণ্টা। এই ঘণ্টা দান করেন রাজা সিঙ্গু (১৭৭৬-১৭৮১)। তিনি কোনবাউং বংশের চতুর্থ রাজা ছিলেন। ১৭৭৯ সালের ১৭ জানুয়ারি এই ঘণ্টা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পালি নাম মহাঘনটা বা বৃহৎ ঘণ্টা। এর ওজন ২৫ টন, উচ্চতা ৭ ফুট, ঘণ্টার মুখের বিস্তার ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি। ১২ ইঞ্চি পুরু। এর গায়ে ১২ লাইনে সিঙ্গু রাজ্য ও রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এতে তিনি ভাবী মৈত্রেয় বুদ্ধ হয়ে জন্মাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। বুদ্ধ-ইতিহাস অনুযায়ী আর একজন বুদ্ধ ভবিষ্যতে জন্ম নেবেন। তাঁর নাম হবে মৈত্রেয় বুদ্ধ।

এছাড়া শোয়েডার্গ প্যাগোডায় আছে বুদ্ধ মিউজিয়াম, পাঠাগার এবং আর্কাইভস। আর আছে সমৃদ্ধ হলঘর, উ পো থাউংস্ হল, শিনসাবু মন্দির, বিজয় চত্বর, চান মাহ্ ফি হলঘর, উত্তর দিকের প্রার্থনা হলঘর, বুদ্ধের পবিত্র চুল ধোয়ার হলঘর, বুদ্ধের পদচিহ্নের হলঘর, জাদুর হলঘর, বড় ভাইয়ের প্যাগোডা, স্বল্প বা ছোট প্যাগোডা, মহাবোধি মন্দির, স্ট্রান্ড মার্কেট টু-পিস হল, অজাগোনা হলঘর, থারাওয়াদি ঘণ্টার হল, সিনবাইয়ুশিনের ছাতা, মিন্দনের ছাতা, বো বো অং মন্দির, দ নগুই যিন হল, পুর্বের প্রার্থনা হল, ড. উ ন্যু হল, ফ্যাগস্টাফ অব দ্য হংস, উৎসব হলঘর, উর্বরতার মন্দির, রুবিচক্ষু বুদ্ধ মন্দির, দক্ষিণের প্রবেশ হলঘর, দক্ষিণের প্রার্থনা হলঘর, সোনালি ও রুপালি পাহাড়ের হলঘর, সূর্য ও চন্দ্র মন্দির, চীনাদের উৎকর্ষতার হলঘর, ইউনিভার্সিটি বয়কটকারীদের মেমোরিয়াল, উ থিন-দঅ থেট পাইন্ হল, রাখাইন হল, বোদউ থাগায়া ও শোয়েডার্গ বো বো গী মন্দির, দঅ পুইন্টস্ হল, খো চেইন কান-মা খী খী হল ইত্যাদি। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে শোয়েডার্গ আসলে বিশাল এক কমপ্লেক্স। মূল প্যাগোডা বা চৈত্যকে ঘিরে আশ্চর্যসুন্দর এক বিস্ময়। এর শিল্পকলা-নৈপুণ্য, সৃজনশীল পরিকল্পনা এবং সৌন্দর্য ভ্রমণকারী ও পুণ্যার্থীদের মুগ্ধ করে। অভিভূত না হয়ে কোনো উপায় আমারও ছিল না। কিন্তু এত কম সময় আমাদের জন্য বরাদ্দ ছিল যে প্রায় ছুটতে ছুটতে দেখেছি, হাঁটতে হাঁটতে ছবি তুলেছি, আরেক দৌড়ে চলে গেছি দু'-একটা ইংরেজি বই খুঁজতে সিঁড়ির নিচের দোকানে। সেখানে গিয়ে আরেক বিস্ময় বর্মী সুন্দরীদের ফুল বিক্রির দোকান দেখে। ও গৌতম, ও শাক্যসিংহ, হে তথাগত, হে অনন্তপুণ্য, হে শান্ত সৌম্য দৌম্য, গৌতমী-পালিত গৌতম, মায়াদেবী-সুত, যশোধরা-পতি, রাহুল-পিতা, হে সিদ্ধার্থ-আমি পাগল হয়ে যাব। বুদ্ধ গয়া, কপিলাবস্তু, সারনাথ, রাজগৃহ, নালন্দা, কাঠমাণ্ডুর সয়ম্ভু বৌদ্ধমন্দির, পাহাড়পুর, ময়নামতী বা আর যেসব প্যাগোডা বা ক্যাং বা বৌদ্ধ ঐতিহ্য দেখেছি সব শোয়েডার্গর কাছে ম্লান। বিশ্বের এক বিস্ময় শোয়েডার্গ, মিয়ানমারবাসীর গর্ব। এই প্যাগোডা যারা দেখেন নি, যারা যাবেন বলে স্থির

করেছেন, যারা এখনো জন্মায় নি বা জন্মাবে—সবার জন্য শোয়েডার্গ স্বপ্ন। আমি দেখেও স্বপ্নাচ্ছন্ন। আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম, বিস্ময়ে মুগ্ধই হয়েছি শুধু। দেখেও আমার কিছুই দেখা হয় নি।

শোয়েডার্গ তার বিশালত্ব থেকেও বিশাল। মিয়ানমারের শিল্পকলার অপূর্ব সংমিশ্রণ। প্রাচীন ও আধুনিকতার সুসমন্বয়। ধর্মীয় স্থান ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে তখন এখানে এসে তারা একত্র হয়েছিল। সেজন্য এখানে আছে ইউনিভার্সিটি বয়কটকারীদের মেমোরিয়াল। বর্মীরা জাদুটোনায় বিশ্বাস করে এজন্য এখানে আছে জাদুর হলঘর (Hall of the Wizards)। আবার উর্বরতার হলঘরও আছে। কেন থাকবে না? যে-নারীর সন্তান নেই তার দুঃখ কে বুঝবে? তার আশ্রয় কোথায়? তাকে আশ্রয় ও আশ্বাস দেওয়ার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছে দেবতা, সেই দেবতার হাতের ছোট্ট শিশুর কাছে সন্তানকামী নারী চায় সে রকম একটি শিশু। আর সত্যিই, কতজন যে সন্তানবতী হয়েছে তা তো কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখে নি, আর কতজন পায় নি তাও লিখে রাখে নি। দুই-ই সত্য? এখানে গৌতম বুদ্ধ হয়ে গেছেন বরদাতা, অতিমানব বা দেবতা। কিন্তু তিনি কখনো নিজেকে মানুষ ছাড়া অন্যকিছু ভাবেন নি বা প্রচার করেন নি।

দ ন্তই যিনি হলের অযুত বুদ্ধের কথাই ধরুন। হলঘরে অজস্র বুদ্ধ তো আছেনই। মহাপরিনির্বাণ-শায়িত বুদ্ধ পাবেন। মুকুটশোভিত বুদ্ধকে বলে লাভমুনি বুদ্ধ, অর্থাৎ প্রার্থনা অনুযায়ী লাভ হয় এই বুদ্ধের কাছে। এসব বিশ্বাসের ব্যাপার। এই হলে প্রবেশ করার সময় এক পাশে দণ্ডায়মান পাথরের সিলিভার আছে। এর উচ্চতা পাঁচ ফুট। এটি একক পাথর নয়। এটি সাতটি সিলিভারের টুকরো দিয়ে গঠিত। একটির ওপর অন্যটি বসানো। এটি অযুত বুদ্ধ নামে খ্যাত। এর গায়ে ৩৬৫টি উপবিষ্ট বুদ্ধ আছে। এটি ১৯৮৪ সালে স্থাপিত। এ এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম। এতে বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে প্রদর্শিত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।

রুবীচক্ষু বুদ্ধও দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। জীবন্ত বা বরদানকারী বুদ্ধ হিসেবে এর খ্যাতি রয়েছে। বুদ্ধের লাল চোখ—একবার ভাবুন ভক্তদের হাতে বুদ্ধের কি দশা!

আরও কত কাহিনী যে প্যাগোডার হল ও মন্দিরে ছড়িয়ে আছে বলা কঠিন। বো বো অং ছিলেন গুহা ও জাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি গুট-বিদ্যার দ্বারা এই বিষয়ে একটি প্রাচীন পুঁথি লাভ করেন। এভাবে তিনি হয়ে ওঠেন জাদুশক্তির অধিকারী। রাজা বোধপয়া (১৭৮২-১৮১৯) তাঁর জাদুশক্তিকে ভয় করতেন। তাঁর ভয় পাছে বো বো অং তাঁর সিংহাসন দখল করে নেন। বো বো অং বন্দি হয়েও রাজার দেওয়া সব শাস্তি একে একে ছিন্‌ভিন্‌ করে দেন। তখন বো বো অং বললেন, রাজার কোনো শক্তি নেই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এমনকি রাজা আমার

লেখা একটি অক্ষরও মুছে ফেলতে পারবেন না।

কী? এত বড় কথা? আঁকো তোমার অক্ষর, আমি মুছে দেব।—রাজা বললেন।

বো বো অং তখন একটি গোলাকার অক্ষর (মিয়ানমার ভাষায় ‘ওয়া’) মাটিতে এঁকে দিলেন। রাজা এসে তা মুছে দিতেই পাশে আরও একটি অক্ষর অর্থাৎ দুটি অক্ষর হয়ে গেল। এভাবে যত মুছতে যান অক্ষর দ্বিগুণ হয়ে শেষে সমগ্র রাজবাড়ির মেঝে এই অক্ষরে ছেয়ে যায়। এখন লোকে বিশ্বাস করে বো বো অং এখনো জীবিত আছেন। তিনি ভক্ত লোকজনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এখনো কাজ করে যাচ্ছেন অদৃশ্য থেকে। তাঁর নামে তৈরি হয় বো বো অং শ্রাইন বা মন্দির।

ব্রিটিশদের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধকারী মিয়ানমারের সংগ্রামী মানুষ এখানে আশ্রয় নিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো আইন রদ করার জন্য বয়কটকারী ১১ জন ছাত্রের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কটকারীদের মেমোরিয়াল।

এভাবে শোয়েডার্গ প্যাগোডা হয়ে গেছে মিয়ানমারের হৃৎপিণ্ড। শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম, বুদ্ধের কাছে বর প্রার্থনা থেকে ধর্মের কঠিন ধ্যানসাধনা শিক্ষা, শ্রামণ ও শ্রামণী হওয়া থেকে নব পরিণীত স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা—সবার আশ্রয়স্থল শোয়েডার্গ প্যাগোডা। কিন্তু কোথাও অশীল কিছু দেখতে পাবেন না। কেউ আপনাকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন বা ধর্মকর্মে বাধা দেবে না, চাঁদা চাইবে না বা দিতে বাধ্য করার বিষয় কল্পনাই করা যায় না। এত বড় প্রাক্তন মানুষের নগ্ন পদভারেও নোংরা হয়। এজন্য স্বেচ্ছায় প্যাগোডা-প্রাক্তন ঝাড় দেওয়ার জন্য আছে অজস্র ঝাড়ু। আপনি দেখবেন তরুণ-তরুণী, দেশি-বিদেশি মিলে এক পাশ থেকে ঝাড়ু দিয়ে যাচ্ছে একই সঙ্গে অনেকে। ওদের হঠাৎ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। পিঠে চুল খোলা তরুী তরুণীরা হাসিমুখে তাকাচ্ছে আমার ছবি তোলা দেখে, কেউ কেউ মাথা নিচু করে কাজে মগ্ন, কেউ-বা নীরবে জপ করছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণ...। অথবা সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তির কী উপায় আছে? অথবা তার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। নাকি মায়ের অসুখ থেকে মুক্তির প্রার্থনা জপ করছে? প্রার্থনারত মানুষেরা যেমন সুন্দর এরাও তেমনি নম্র ও দীপ্যমান, জীবনীশক্তিতে ভরপুর হয়েও সংযত। না, এখানে অসংযত কিছু খোঁজা বৃথা, সাংবাদিক বার্থ হবে। আমি আবার পুলকিত ও শিহরণ অনুভব করলাম। ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রিতে তাবাউং উৎসব হয়, তওথালিন বা ভাদ্র পূর্ণিমায় পূর্ণচাঁদের মায়ায় উৎসব হয়। কেমন হবে এসব পূর্ণিমার রাতে সাদা ধবধবে মন্দির চূড়াগুলো, রঙের প্রাচুর্য ও সোনায় মোড়া শোয়েডার্গ প্যাগোডার চূড়ার ঠিকরে-পড়া সৌন্দর্য? আমার সেই সুযোগ হয় নি। এমনকি দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগও আমি নিতে পারি নি। আষাঢ়ের ওয়াসো পূর্ণিমা কেমন হয়? শোয়েডার্গ প্যাগোডা

তখন নিশ্চয়ই হয়ে ওঠে রহস্যময় ও বোধের অতীত বা অতীন্দ্রিয় ও দুর্বোধ্য। সবই আমার কল্পনাপ্রসূত, অবিশ্বাসীর শত যুক্তি ও মতবাদ। তারপরও আমি সাত দিনের সাতটি গ্রহ শান্তিকারী মূর্তিগুলোর মাথায় পানি ঢেলেছি সকলের সঙ্গে। সাত দিনে যারা যারা জন্মেছে তাদের সবার জন্য অর্থাৎ সকল প্রাণীর জন্য মঙ্গল কামনা করেছি। একথা যখন দেশে ফিরে এসে আমার ধর্মপত্নীকে বলেছি সে তখন বলল, হয় কপাল, তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের জন্ম-বারটিও মনে রাখতে পার নি? এজন্য সবগুলো দিনের গ্রহশান্তি করেছে? তোমাকে নিয়ে আমি কী করব বলা তো!

আমার পথপ্রদর্শক কীন্তি পঞ্চগ্রা ডিস্কুও আমাকে এই অভিযোগ করেছিলেন। আর আমি তো জানিই এভাবে গ্রহশান্তি হয় না, হতে পারে না। বিশ্বাসীগণ আমাকে ক্ষমা করবেন না জানি, গ্রহরাজগণও। তবে তাই হোক। আর আপনাদের বিশ্বাস মতে যদি কল্যাণ হয় তাহলে জগতের সকল প্রাণীর জন্য আমি প্রার্থনা করেছি। সাত দিনে জন্ম নেওয়া সকল প্রাণী, যারা জন্মেছে, যারা জন্মেছিল এবং যারা জন্মাবে সকলের জন্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী অনবশেষ সুখ হোক, গ্রহশান্তি হোক।

মিয়ানমারের ইতিহাস ও অং সান সুচি

বার্মায় ঐতিহাসিকভাবে জনবসতি শুরু হয় ১১,০০০ বছর আগে। মধ্য ইরাবতী (Irrawaddy) নদী উপত্যকায় প্যু (Pyu) নামের তিব্বতি-বারমান ভাষাভাষী একদল মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করে। তারা প্রাচীন ধারায় নগরকেন্দ্রিক রাজ্য স্থাপন করে উত্তর বার্মায়। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় ৮০০ অব্দে সেই রাজত্বের জমজমাট অবস্থা। প্যু-দের দক্ষিণে মোন-রা (Mons)। তারা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলত। থাটনে তারা বন্দর-নগরী স্থাপন করে। অর্থাৎ তারা সমুদ্রের কাছাকাছি সালউইন নদীর তীরে নগর-রাজ্য গড়ে তোলে। এভাবে মোন রাজ্যের উত্থান ঘটে। ৯ম শতাব্দীতে প্যু রাজধানী হেলিসি উত্তরের রাজ্য নানচা ও-র অন্তর্ভুক্ত হয়। নানচাও দক্ষিণ চীনের রাজ্য। তারপর বারমানরা তিব্বতি-বারমান জনগোষ্ঠী নিয়ে পাগানে (বর্তমান নাম বাগান) রাজধানী স্থাপন করে। এ সময় বার্মার নাম বার্মা ছিল না।

১০৪৪ সালে রাজা আনাওয়াথা (Anawatha) পাগানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বছরের মধ্যে তিনি সমস্ত বার্মাকে একত্র করেন একই সাম্রাজ্যের ছায়াতলে। এটিই প্রথম মিয়ানমার সাম্রাজ্য। ১২৮৭ সালে মঙ্গোলরা এই সাম্রাজ্য হারবার করে দেয়।

১৬ শতাব্দীতে আবার মিয়ানমার একত্র হয় টাঙ্গু রাজবংশের উত্থানে। এই রাজ্য ১৭৫২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তখন মোন রাজ্য আবার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। জনপ্রিয় রাজা আলুংপায়ার (Alaungpaya) অধীনে মিয়ানমার একত্র হয়। তিনি ১৭৫৯ সালে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে মিয়ানমারকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর সাম্রাজ্য পার্শ্ববর্তী রাজাদের আতঙ্কিত করে তোলে। এ সময় আসাম মিয়ানমারের অধীনে আসে। তারপর দুটি ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ হয় ১৮২৪-২৬ এবং ১৮৫২ সালে। শেষে ১৮৮৫ সালের যুদ্ধে মিয়ানমার ইংরেজদের সম্পূর্ণ অধিকারে চলে যায়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, বার্মায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করে সিংহলের মাধ্যমে। সিংহল থেকে বুদ্ধঘোষ ৪৫০ সালে এসে প্রথম বৌদ্ধধর্ম বিস্তার করেন। কিন্তু বার্মার ইতিহাস বলে গৌতম বুদ্ধ বার্মায় গিয়ে তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। এই মতটিই এখন প্রবল।

বার্মার প্রসঙ্গে এখানে আসামের কথাও একটু বলা দরকার। ১৯০১ সালের আসাম আদমশুমারিতে ৯০৬৫ জন বৌদ্ধ পাওয়া যায়। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.১৬ জন বৌদ্ধ। এক সময় সম্পূর্ণ ব্রহ্মপুত্র বৌদ্ধ অধ্যুষিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাইরা (Tais) আসাম আক্রমণ ও দখল করে নেয়। তারা এই অঞ্চলের নাম দেয় আহোমস্ (Ahoms), তার থেকে আসাম নামের উৎপত্তি। শানরা (Shans) আসামকে বলত ওয়েসালি-লং (Wehsali-long) এবং বৌদ্ধ নাম হলো ওয়েসালি বা বেসালি। থাই রাজা Hso Hkan-hpa এই রাজ্য আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। এভাবে ব্রহ্মপুত্র এলাকায় শানরা রাজ্য স্থাপন করে। আস্তে আস্তে তারা আসামের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নেয়। এভাবে আসামে বৌদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। তবে পাহাড়ি অঞ্চল তখন পর্যন্ত বৌদ্ধদের দখলে আসে নি। ৪০০ বছর এভাবে আসামের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম পালন করে। ১৬১১ সালে তাদের রাজা চু-চেং-পা (Chu-Cheng-hpa) হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেন। চু-চেং-পা নামটি থাই নাম। রাজা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলে জনগণও আস্তে আস্তে রাজার ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। আসামের অধিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলের মতো যাদের চেহারা তারা আদি আসামি। আর থাই ভাষাও আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অল্প কিছু সংখ্যক প্যাগোডা এখনো আসামে দেখা যায় যা শানদের মতো। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কালিতাস (Kalitas) নামে এখনো হয়তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকতে পারে। কালিতাসদের বৌদ্ধ প্যাগোডা চিরন্তন শান প্যাগোডা ও বিহারের মতো। তার মধ্যে কিছু কিছু ভারতীয় ছাপ পড়েছে এবং কাঠের মন্দির হলেও তাতে শানদের স্থাপত্য-রীতির প্রভাব কমে এসেছে। এই নতুন এমনকি কালিতাসদের বৌদ্ধ বিহারে ভারতীয়, এসিরিয় ও মধ্য এশিয়ার প্রভাবও পড়েছে। এগুলোতে নিনেভের (Nineveh) কাঠের ইমারত ও রাজা সলোমানের কাঠের মন্দিরের প্রভাব আছে। এগুলো তৈরি হতো লেবাননের সিডার গাছ দিয়ে, আর আসামের বৌদ্ধ প্যাগোডা

ও মন্দির তৈরি হয়েছে সেগুন দিয়ে। অন্যান্য ধর্মের মতো বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ধর্ম নয় বলে এমন ঘটেছে, যেমন খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে মিশনারীরা, তেমন কোনো প্রয়াস বৌদ্ধদের মধ্যে নেই।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয়কে বর্মীরা কখনো মেনে নিতে পারে নি। আজকের মিয়ানমারের সামরিক সরকারও অং সান সুচির স্বামী ব্রিটিশ হওয়াতে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অং সান সুচির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় অভিযোগ সুচির স্বামী ইংরেজ, বর্মী নয়। আর ইংরেজরা কখনো বর্মীদের বন্ধু হতে পারে না।

সুচি-র সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিয়ানমারে অবস্থানরত এক বাঙালি তরুণ ভিক্ষুকে সুচির সঙ্গে দেখা করার কথা বলাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠেন। বললেন, চুপ করুন, হাওয়ার কান আছে, দেয়ালেরও কান থাকে। ও-কথা মনেও আনবেন না।

আমি তখন শোয়েডার্গ প্যাগোডা দেখে বাসে করে ফিরছি। আমার পাশে বসেছেন উ কীত্তি পঞা (বা উ কীর্তি প্রজ্ঞা)। তিনি রাস্তাঘাট চিনিয়ে দিচ্ছেন। ঝকমকে পথঘাট। দু'পাশের গাছপালা, বহু বছর তাদের বয়স, বহু ঘটনার সাক্ষী তারা, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আছেন, অনেক তাদের অভিজ্ঞতা। অং সান সুচির বাড়ির রাস্তাটা দেখিয়ে দিতেই আমি তৎপর হয়ে উঠলাম। দূর থেকে তিনি বাড়িটি দেখিয়ে দিলেন। আমাদের বাসের রাস্তা থেকে সেটি বেরিয়ে ঘুরে গেছে সামনের দিকে। আমাদের গাড়ি চলছে আর দেখছি। সুচির বাড়ির রাস্তার প্রবেশপথে সামরিক প্রহরা। সাদা পোশাকে তার চেয়ে বেশি সৈন্য থাকা স্বাভাবিক। আমি ওই রাস্তার ছবি তুলতে চাইলাম। তিনি হাত দিয়ে আমার ক্যামেরা চেপে ধরলেন আমার কোলের ওপর। আমাকে ক্যামেরা তুলতেই দিলেন না।

উ কীর্তি প্রজ্ঞা বললেন, ভুলেও এমন কাজ করবেন না। ওখানে-এখানে ঝাকি ও সাদা পোশাকে অনেক প্রহরা।

বললাম, বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে পারলে চুপ করে ছবি তুলে নিতাম। সুচি আমাদের কাছে গণতন্ত্রের প্রতীক। সংগ্রামের আদর্শ।

তিনি বললেন, বিদেশি সাংবাদিকরা বা কোনো বিদেশি সুচির সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। সুচির নামটিও উচ্চারণ করা এখানে অন্যায়।

অং সান সুচি এমন এক জ্বলন্ত আগুন যে তাঁর ধারে-কাছে যাওয়াও কঠিন। ভ্রমণের পুরো পনেরো দিন কতবার তাঁর কথা ভেবেছি। মান্দালয়, আকিয়াব, মংদু, টাঙ্গু সর্বত্র ভেবেছি সুচির কথা। আর কবি বাহাদুর শার কথা। কিন্তু সুচির কথা দুই বর্মীর সঙ্গে দু'বার বলেই থেমে গেছি। তারা আমার সঙ্গে সুচির বিষয়ে আলাপ করতে চায় না। ওরা সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠেছে। যদি হাওয়া গুনতে পায়, যদি

দেয়াল জানতে পারে, পাশের কেউ যদি শুনে ফেলে? আমারও তাই চুপ করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি তো বিদেশি, তার ওপর লেখক, সঙ্গে ক্যামেরা আছে, জুম লেন্স আছে। আমাদের গাইড একবার বলেই দিয়েছেন কীর্তি প্রজ্ঞাকে যে, আমি সাংবাদিক, আমার হাতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা আছে। কাজেই আমাকে তারা চোখের আড়াল করতে চান না। আমি নাকি বিপজ্জনক।

বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা অং সান। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি স্বাধীনতার লড়াই করেছেন। তাঁর কন্যা অং সান সুচিকে ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমাভো বন্দরনায়ক ও আমাদের দেশের শেখ হাসিনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। পাশে দাঁড় করানো যায়। যদিও সুচি এখনো সেই অর্থে ক্ষমতায় যেতে পারেন নি, বলতে গেলে কিছুই উপার্জন বা দেশবাসীকে দিতে পারেন নি। সুচি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন। ইয়াঙ্গুন, দিল্লি ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। নিউইয়র্ক ও ভুটানে জাতিসংঘের হয়ে কাজ করেছেন, বিয়ে করেছেন ব্রিটিশ নাগরিককে। ভারতে পড়াশোনার সময় ভারতের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছেন। ‘আনন্দমঠ’ সম্পর্কে দেশপ্রেম বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মধ্যপন্থী নিখিলেশের মত প্রকাশ বিষয়ে লিখেছেন, “দেশের জন্য অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা।” নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত সন্দীপ নৈতিকতার বাতিক নিয়ে উপহাস করত। সে ছিল সুযোগ সন্ধানী ও অসূয়াপরায়ণ—ইত্যাদি কথাও বলেছেন।

বাংলার রেনেসাঁকে সুচি গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বঙ্কিমচন্দ্র ও নীরদ চৌধুরী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে ১৯৬২ সালে। আমি তখন ভারতে একজন ছাত্রী, আমার মা সেখানে বার্মার রাষ্ট্রদূত। সরকারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহজ ছিল না। সরকারের মধ্যকার কোনো কোনো ব্যক্তি আমার বাবার প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যবশত তাঁর পরিবারের প্রতিও উষ্ণ মমতা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অন্যদিকে এমন অনেকে ছিলেন যারা তাঁর নামটুকু ব্যবহার করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেন। কিন্তু দেশের ভালোর জন্য বাবা যেমন নীতিমালা অনুসরণের কথা বলতেন তাঁরা তা কখনো পালন করতেন না।” ১৯৭৪ সালে সুচি বার্মা সফরে এলে সরকারি কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে জানতে চেয়েছিল তিনি সরকারবিরোধী কাজে নিজেকে জড়িত করবেন কিনা। সুচি বলেছিলেন, “তা যদি করি তা কখনো দেশের বাইরে থেকে নয়, দেশের ভেতরে থেকেই করব।”

সুচি দেশের বাইরে থাকতেই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের সঙ্কট গভীরভাবে অনুধাবন করেন। আজ তিনি ভোটে জিতেও গৃহবন্দি। ১৯৯০ সালে ভোটে জিতে

ক্ষমতায় যেতে পারেন নি। ১৯৯৬ সালের ১৪ অক্টোবর সুচি নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। সুচি এশিয়ায় সাহসিকতার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তিনি নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। তাঁর বাবা করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে, তিনি করছেন সমরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই।

সুচি বলেছেন, “গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক আদর্শ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসের কাছে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদের ভয়ভীতি দেখানো কিংবা বিপদে ফেলা যাবে না। প্রত্যেকে স্ব-স্ব লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা চালাবে। আপনার শক্তি আছে বলেই শক্তিহীনের ওপর আপনি চড়াও হতে পারেন না।”

ঠিক এমন লেফট-রাইট দিন বাংলাদেশের ওপরও ছিল। আজ বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের কিছু সুবিধা ভোগ হয়তো করছে, কিন্তু সুচির ওই যে বলা, “আপনার শক্তি আছে বলেই শক্তিহীনের উপর চড়াও হতে পারেন না” কথাটি এখনো আমাদের জন্য প্রযোজ্য। এখনো বাংলাদেশ গণতন্ত্রের মৌলিক সংজ্ঞা থেকে অনেক দূরে, অনেক অনেক। আর কে না জানে গণতন্ত্রের জন্য দরকার দীর্ঘ অনুশীলন, সরকার ও জনগণের সহনশীল অনুশীলন।

আমাদের বাস চলছে। সুচি আস্তে আস্তে মনের গভীরে চলে গেল। তাঁর পিতা অং সানের নামে ইয়াঙ্গুনে প্রশস্ত এভেন্যু আছে। আরো নানা কিছু থাকবে। সে সব কার কাছে জিগ্যেস করব? আমাদের গাইড মিয়ানমার সরকারের প্রতিনিধি। না, তারা কবি বাহাদুর শার সমাধিতেও আমাদের নিতে চান না। নেবেন না। একজন জীবিত, অন্যজন মৃত। দু’জনকেই দেখতে পাই নি। দু’জনই আছেন ইয়াঙ্গুনে। সুচি ও বাহাদুর শা। একজন গণতন্ত্র ও রাজনীতির কবি, অন্যজন সম্রাট হয়েও মনে-প্রাণে কবি।

মান্দালয়ের পথে

ইয়াঙ্গুনের কাবায়ে টেম্পল ধর্মশালা থেকে পরদিন ২৮ মে ভোর ছয়টায় যাত্রা শুরু। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ভোর চারটায়। ১৯৫৪ সালের ১৭ মে এখানে ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি শুরু হয়। এরই অংশ কাবায়ে টেম্পল ধর্মশালা। এখানে আমাদের ২৬ জন যাত্রীর থাকার জায়গা নির্দিষ্ট হয়। ডান পাশে বিশ্বশান্তি প্যাগোডা। আরেক পাশে হস্তশিল্প প্রস্তুতকারী অফিস ও দোকান। সঙ্গীতির প্রাক্কালে প্রধান মন্ত্রী উ নু তিন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ভিক্ষুদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

গাছপালা-ঘেরা অঙ্গন। দোয়েল ও শালিক ডাকাডাকি করছে। পাশেই ভিক্ষুদের নির্ধারিত ভোজনশালা। মেঝেয় বসে নিচু গোল টেবিলে প্রাতরাশ করতে হয়।

তারপর গাড়িতে ওঠা। আমাদের সঙ্গে দুই গাইড। আর একজন চালক ও একজন সহায়ক। মোটাসোটা চালক আর তেমনি ছিপছিপে সহায়ক।

তিন নম্বর জাতীয় মহাসড়ক ধরে চলছি। গুরুতেই গাড়ির চাকা ছিদ্র হয়ে গেল। চাকা ঠিক করতে করতে এক কাপ চা খেয়ে নিলাম। ডিস্কু শুদ্ধানন্দ মহাথেরো সামনে বসেছেন। গাড়ি ভালো নয় বলে তিনি বিরক্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রী অমলেন্দু দোকান থেকে কিনে এক বোতল করে পানি দিলেন। এটা তাঁর কাজ। মেয়েরা ও অনেকে গাড়িতে বসে আছে। কয়েকজন নেমে পড়েছে। সকাল থেকে অফিসে যাওয়া শুরু। বর্মী মেয়েরা গার্ডার বাঁধা চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে হাতে টিফিন বাস্ক নিয়ে ছুটেছে। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। স্কুলে যাচ্ছে দু'-চারজন করে শিশু। তাদের সবুজ লুঙ্গি ও শাদা শার্ট। মেয়েদেরও লুঙ্গি ও ব্লাউজ। শাদা ব্লাউজ বর্মীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। রঙিন লুঙ্গির সঙ্গে লম্বা হাতা শাদা ব্লাউজ দেখলেই ছেলেবেলার দেখা বর্মীদের ছবির কথা মনে পড়ে যায়। তখন দেখতাম বর্মী পুরুষদের মাথায় পুচ্ছ তোলা পাগড়ির মতো শাদা টুপি আর মেয়েদের পুরো হাতা শাদা ব্লাউজ। এখন শাদা ব্লাউজ পরা রমণীদের খুব কম দেখা যায়। এখন একমাত্র উৎসবের সময় এই পোশাক দেখা যায়। চাকরি করতে যাচ্ছে তরুণী ও যুবতী রমণীরা। মুখে সেনেকার। বিবাহিত রমণীরা ঝোঁপাও বাঁধে আর তাতে ফুল বা ফুলের মালা। সবসময় যেন বর্মীরা কোথাও উৎসবে যাচ্ছে। প্রশস্ত রাজপথ। রাস্তার দু' পাশে গাছ। বাড়ির সীমার মধ্যে নানা রকম গাছ। বর্ষা শুরু হয়েছে। বোশেখের প্রথম বৃষ্টি পেলেই পদাউক বা সেন্না গাছে সোনারঙ ফুল ফোটে। ওপাশে একটা গাছে অল্প ফুল ফুটেছে। প্রথম বর্ষায় বড় বড় গাছগুলো সোনার ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল কল্পনা করছি। মাঝে মাঝে নিম্পত্র গাছে চেঁচী পেন বা বর্মী চেঁচী ফুল গাছ ভরে ফুটে আছে।

প্রশস্ত উঁচু-নিচু রাজপথ। ইয়াঙ্গুন শহরে চট্টগ্রাম শহরের মতো পাহাড় আছে, তবে চট্টগ্রামের চেয়ে নিচু পাহাড়। ভারি সুন্দর শহর। আধুনিক তিন তারা বা পাঁচ তারা হোটেলও বর্মী স্থাপত্যরীতির প্রভাব রয়েছে। প্রাচীন বাড়িঘর বর্মী রীতিতে তৈরি। ব্রিটিশদের রাজত্বের সময় ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির ছাপ পড়লেও আমাদের মতো চেপে বসতে পারে নি। বড় বড় হোটেল ছাড়া সর্বত্র বর্মী ভাষায় সাইনবোর্ড ও নিয়ন সাইন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোয় শুধু ইংরেজি লেখা। জাপানি কোম্পানিই বেশি। প্যাগোডাগুলো একান্তভাবেই বর্মীয়।

শুরু হলো যাত্রা। হু-হু গাড়ি ছুটেছে। ইয়াঙ্গুন শহর। ডানে মিংগালডঁউ সিটি প্রজেক্ট। শুরু হলো এক নম্বর জাতীয় সড়ক। পাশে চেকল্যু মন্দির। হাতে টিফিন বাস্কসহ বালিকারা কাজে চলেছে। সুশ্রী কুমারী তম্বী। আমাদের হিউম্যান হলারের মতো ছোট ছোট বাস। পেছনে খোলা। গাদাগাদি করে তিন লাইনের বসেছে। কখনো দাঁড়ানো মাঝের লাইনে। ১৯৮৮ সালে এই সুপ্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে।

পাশে ঘন করে ইউক্যালিপটাস ও সোনারুরি গাছ। ব্রিটিশ আমলের পুরনো রাস্তাকে সুপ্রশস্ত করেছে। পুরনো বৃষ্টি শিরীষ ও পদাউক গাছ দেখলেই অনুমান করা যায় ব্রিটিশ আমলে রোয়া। বকুল বা খইয়ে ফুল গাছও আছে। প্যাগোডা বা মন্দিরে বকুল গাছ থাকবেই। পথের পাশে পড়ল কামবিজা খাডি রাজপ্রাসাদ। সকাল আটটা। পথের পাশে মাটির তৈরি বড় বড় মটকা। এগুলো পানি রাখার কাজে লাগে। বাড়ির সামনে জলসত্র সর্বত্র। মাচার ওপর মটকা। তার ওপর ছাউনি। জলসত্রের ওপর টোকা দিয়ে ঢাকা। সেটি ওপর থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার পাশে পানি খাওয়ার পাত্র। ফুজিরা ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন। খালি পা। নারী-পুরুষ মিলে ভিক্ষুর শাবাইকে ভিক্ষান্ন দিচ্ছে। শাবাইক (Thabaik) হলো ভিক্ষুর গোল ভিক্ষাপাত্র। বাড়ির ঘাটার সামনে ফুল গাছ একটি-দুটি থাকবেই। তাতে জবা, আলমেগা, রঙ্গন ফুটে আছে। কোথাও কোথাও সেইম বেঁ বা কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাতে মৌসুমের ফুল টকটক করছে। বাঁশের ইজি চেয়ার তৈরি করে রাস্তার ধারে রেখেছে বিক্রির জন্য। দোকানে দু'-একটা ইজি চেয়ার থাকবেই। তাতে দোকানিরা বসে আয়েস করে। চায়ের দোকানগুলোর সামনে খোলা আকাশের নিচে টুল ও নিচু টেবিল পাতা। তাতে বসে বসে চা গিলছে। এক কাপ চায়ের পরে বিনি পয়সায় সবুজ গরম চা খাবে ওরা কাপের পর কাপ। লুঙ্গি ছাড়া কোনো পোশাক নেই। না, পাতলুন নেই কোথাও। তার বদলে আকাশে মেঘেরা পাতলুন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানেও লুঙ্গি আছে। শাড়ি, ব্লাউজ, অন্তর্বাস কী নেই।

পথে হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার! সামনে সামরিক ট্যান্কি একখানা। ওটা সামনে, পেছনে আমরা। কেন? শুরু হলো সামরিক স্কট। ট্যান্কির মাথার ওপর লাল বাতি ঘুরছে। শব্দ হচ্ছে মৃদু শব্দে ওঁয়া ওঁয়া। সামনের গাড়ি পথ ছেড়ে দিচ্ছে তার ডাকে। ড্রাইভারের পাশে সামরিক পোশাক পরা লোকটি হাত ও মুখ বের করে সরে যেতে বলছে সামনের গাড়িকে। আমাদের গাড়ি ছুটে চলছে পূর্ণ গতিতে। প্রায় সব গাড়ির চালকের বসার জায়গা বাঁ দিকে। রাস্তার ডান দিকে গাড়ি চলে। আমরা ডি.আই.পি, তাই সামরিক স্কট এখান থেকে শুরু হলো।

পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি শেষ হয়ে গেল। বৃষ্টিতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঘন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর শুরু হলো হালকা বৃষ্টি। মেঘের বিরাম নেই। বৃষ্টিতে ভিজে ভিক্ষা করছেন ভিক্ষু ও শ্রামণরা। গাছপালা ভিজছে। গাড়ির জানালা বন্ধ। পর্যটনের পুরনো গাড়ি, ভেতরে টুপটাপ ফোঁটা পড়ছে। সহকারী মাও ছাদের ছিদ্রপথে স্কচ টেপ লাগাচ্ছে। ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ মহাথেরোর মাথার ওপর পড়ছে ফোঁটা। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে একেবারে পেছনে বসার জায়গা পেয়েছি। ভোরে উঠে সবাই জিনিসপত্র রেখে আসন দখল করার প্রতিযোগিতায় নামবে কে জানত! ইতোমধ্যে সবার দু'-একটা করে ব্যাগ বেড়ে গেছে কেনাকাটা করায়। সেই মংডু থেকে কেনাকাটার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। একজনে একটা কেনে তো

অন্যজনও সেটা কেনে। গাঁটে কড়ি থাকলে এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি হয়ে ওঠে। একজন দু'খানা ছাতা কিনল তো আরেকজন পাঁচটা কিনে নিল। আরেকজন দশটা। একেকজন লুঙ্গি কিনল দশ-বারোটা।

ক্রমে রাস্তা সৰু হয়ে আসে। আগের মতো আর মসৃণও নয়। মাঝে মাঝে খাবলা খাবলা উঠে গেছে। শোয়েমদউ প্যাগোডার সামনে এসে বাস থামল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। জুতো গাড়িতে রেখে নেমে পড়লাম। কোনো প্যাগোডা বা বিহার সীমায় জুতো পরে কেউ যায় না। জুতো বাইরে রাখলে কেউ চুরিও করবে না। আর এরা পরে দু' ফিতের বর্মী স্যান্ডেল। মজবুত ও সুন্দর। আমাদের হাওয়াই চপ্পলের মতো। চামড়ার। তবে সোল ভালো, রাবারের।

হলঘর দোতলায়। কাঠের মেঝে। নিচু টেবিলে খাবার সাজানো। ধর্ম মন্ত্রণালয় আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছে। প্যাগোডা কমিটি আমাদের খাবার দিচ্ছে। শাদা চৌ মেঁ বাটিতে ভরা। কাঁচা বরবটি, টমেটো, ধনে পাতা কুচি কুচি করে কাটা। নুন ও তেল দিয়ে শুকনো পোড়া লঙ্কা কচলে প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছে। পোড়া গুঁটকি, পিঁয়াজ, সর্ষের তেল দিয়ে বর্ষা ও শীতে ছেলেবেলায় কত খেয়েছি। এখনও আমার খুব প্রিয় এই ঝাল। আর সবজির স্যুপ। সঙ্গে জিন ওয়ে জা বা সবুজ চা। পানির মতো সবসময় খাওয়া যায়। তারপর দুধ চা। দানবাস্ত্রে সমবেত দান দিল দলের পক্ষ থেকে।

আমরা এখন পেগু। পেগুর নতুন নাম বাগো।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে, দান দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। পাশের দীর্ঘ ও প্রশস্ত ঢাকা সিঁড়ি বেয়ে শোয়েমদউ প্যাগোডায় উঠছি। মাঝখানে প্রশস্ত চত্বর। বই বিক্রি হচ্ছে, ২৫ চ্যা ক্যামেরার ফি। একটা বই কিনলাম। বর্মী ভাষায় লেখা। পেছনে চার পৃষ্ঠা ইংরেজিতে প্যাগোডার ইতিহাস লেখা। প্রচুর শাদা-কালো ও রঙিন ছবি আছে। ছবির বর্ণনাও বর্মী ভাষায়। কি আর করা!

আবার সিঁড়ি, আবার ওঠা। ৫০-৬০ ফুটের মতো প্রশস্ত সিঁড়ি। ঝকঝকে মার্বেল পাথরে মোজাইক করা। এ রকম মোজাইক এখানে সর্বত্র। সিঁড়ির শেষ মাথায় সেনা গ্রহরা। সব গুরুত্বপূর্ণ প্যাগোডা ও বিহারে সেনা গ্রহরা। হেলমেট ও অস্ত্রে সজ্জিত ওরা।

অত্যন্ত প্রাচীন এই প্যাগোডার ইতিহাস। গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালে তিনি তাঁর দু' গাছি চুল দুই ভক্ত মহাসলা ও চুল্লসলাকে প্রদান করেন। সেই চুল নিয়ে আসা হয় পেগুতে এবং সুদর্শন পাহাড়ে প্যাগোডা নির্মাণ করে সেখানে চুলগুলো রক্ষা করা হয়। পাহাড়ের ওপর আদিতে ৭৫ ফুট উঁচু এই প্যাগোডা নির্মিত হয়। ৮২৫ খ্রি. ও ৮৪০ খ্রি.-তে রাজা থামাল ও রাজা উইমালা যথাক্রমে প্যাগোডার উচ্চতা বাড়িয়ে ৮১ ফুট ও ৮৮ ফুট করেন। সেই থেকে শোয়েমদউ ইতিহাসে স্থান করে

নেয়। খ্যাতিমান রাজা ও সাধারণ মানুষ দলে দলে এখানে সমবেত হতে থাকেন। পরবর্তী বর্ষা ও মন রাজারা একে বারবারে সংস্কার করতে থাকেন। রাজা অনুরামা ৯৮২ খ্রি-তে বুদ্ধের দন্তধাতু স্থাপন করেন। ১৩৮৫ খ্রি-তে রাজাদারিত আরও একটি দন্তধাতু স্থাপন করেন। এ সময় এক হাজার ভিক্ষুসহ সাত দিন উৎসব হয়। তিনি তাঁর শরীরের ওজনের সমান সোনা দান করেন 'তুলা-দান' উৎসবের মাধ্যমে। তারপর রাজা ধম্মজেদি (১৪৭২-৯২) প্যাগোডার পশ্চিম দিকে হস্তীশালা নির্মাণ করেন তিনি পাশের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করতেন। তিনি প্যাগোডায় নিয়মিত দানধর্ম করতেন। দুটি বড় বড় তামার ঘণ্টা স্থাপন করেন। তিনিই প্যাগোডার উচ্চতা ২৭৭ ফুট বর্ধিত করেন।

রাজা বিন্ধ্যারান (১৪৯২-১৫২৬) তাঁর রাজত্বের শুরুতে ১৪৯২ খ্রি-তে প্রবল ঝড়ে পড়ে যাওয়া প্যাগোডার চূড়ার পুরনো ছাতাটি পুনঃস্থাপন করেন। প্যাগোডার চূড়ার সঙ্গে এই ছাতাটি ধাতু দ্বারা নির্মাণ করা হয়। প্রত্যেক প্যাগোডার বানানা বাডের (Banana bud) ঠিক ওপরে এই ছাতা (Htee) থাকে। তার উপরে থাকে সখাফু (bud of a fragrant screw pine), তার উপরে থাকে ন্যাগেট মায়াতনা (Sacred bird's rest), তারপর সেইনব্যু (Diamond bud) বা শীর্ষ।

রাজা তাবিন-শোয়ে হতি (১৫৩৭-৫০) শোয়েমদউ প্যাগোডায় তাঁর কান ছিদ্র করার উৎসব পালন করেন। রাজা বাইন্যুং (১৫৫১-৮১) তাঁর মুকুট ভেঙে রত্নরাজি দিয়ে প্যাগোডার মোচাকার চূড়া নির্মাণ করেন। এছাড়া আশেপাশে আরও মন্দির নির্মাণ করেন। রাজা বোধপায়া (১৭৮২-১৮১৯) এই প্যাগোডার ভিত্তিভূমির সম্প্রসারণ ও নির্মাণ কাজ করেন এবং এর উচ্চতা বাড়িয়ে ২৯২ ফুট করেন। তিনি প্যাগোডা-চূড়ার ছাতার উচ্চতা বৃদ্ধি করেন। ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দের তাগু (বুদ্ধ) পূর্ণিমায় এই উপলক্ষে উৎসব উদ্‌যাপন করেন। সেই থেকে এই পূর্ণিমা শোয়েমদউ প্যাগোডার উৎসব-দিন ধার্য হয়। তারপর বার্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে ১৮৮২ সালে ওয়ানদাউক উ ওয়েইক তাতে নতুন ছাতা সংযোজন করেন।

১৯১২ সালে ভূমিকম্পে প্যাগোডার এই ছাতা ভেঙে পড়ে যায়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে আরেক ভূমিকম্পে প্যাগোডার ১১২ ফুট ৪ ইঞ্চি উপরে হকাযুং লাং বা বেলাকৃতি পর্যন্ত ভেঙে পড়ে যায়। তার কিছু অংশ এখন প্যাগোডার উত্তর-পূর্ব কোণায় রক্ষিত আছে। ১৯২০ খ্রি.-তে এই প্যাগোডা পুনর্নির্মাণ করা হয়।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ মে রাতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পেশু ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঙ্গে ৮-১৫টায় প্যাগোডা কেঁপে ওঠে এবং প্রচণ্ড শব্দ করে ভূপাতিত হয়। ধ্বংসের এক বিরাট স্তূপ হয়ে গেল প্যাগোডা। এই নিয়ে পাঁচবার ভূমিকম্পে প্যাগোডার ক্ষতি হলো। কিন্তু বার্মার ধার্মিক ও দানশীল লোকেরা এতেও থামলেন না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে প্যাগোডা নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে নির্মাণের কাজ শেষ হতে পারল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৮ সালের ৪ মে বার্মা স্বাধীন হলো। বার্মার প্রথম প্রেসিডেন্ট এই প্যাগোডা নির্মাণের কাজে এগিয়ে এলেন। ১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী উ নু এর সূচনা করলেন। নতুন করে কমিটি গঠিত হলো। দিন-রাত কাজ চলতে লাগল। দিনে ৭০০ জন, রাতে ৫০০ জন কর্মী। যাবতীয় খরচ জনসাধারণের দান থেকে মেটানো হলো। এই খাতে ১১ লক্ষ টাকা দান পাওয়া গেল। পরে পার্লামেন্ট ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল। ১৯৫৩ সালের ৩০ ডিসেম্বরের বিকেল তিনটায় কাজ সমাপ্ত হলো। আর এই তারিখে কাজ শেষ করার লক্ষ্যও হয়েছিল নির্ধারিত। প্যাগোডা নির্মাণে বর্মীরা সবসময় অকপণ ও দ্রুত কাজ করেন।

রাষ্ট্রপতি ড. বা উ, প্রধানমন্ত্রী উ নু, কেবিনেট মন্ত্রীগণ এবং স্বতন্ত্র জনগণের অভূতপূর্ব সমাবেশে প্যাগোডার চূড়ায় ছাতা এবং শীর্ষ উন্মোচিত হলো। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে। প্রজাতন্ত্রের ইচ্ছা ও আদর্শ অনুযায়ী এই ছাতা নির্মিত হয়। আগের ছাতাগুলো ছিল রাজার মুকুটের মতো, আর বর্তমান ছাতা হলো মানবীয় ছত্রাকৃতি।

প্র্যাটফরম থেকে এই প্যাগোডার উচ্চতা হলো ৩৭৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। আর শোয়েডার্গ প্যাগোডার উচ্চতা হয় ভূমিতল থেকে ৩২৬ ফুট।

রৌপ্য-গুঁড়োর মতো ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ মহাথেরো এগিয়ে গেলেন সামনে। প্রশস্ত সিঁড়ি ধাপের পর ধাপ উঠে গেছে, যেন স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি। শোয়েডার্গ প্যাগোডার মতো দু'পাশে দোকান নেই। বড় বড় স্তম্ভের ওপর সিঁড়ির ছাদও ক্রমে উপরের দিকে উঠে গেছে। ছাদে পর্যাপ্ত টিউব ও গোল বাতি। এক পাশে বইপত্র বিক্রি হয় ও দানবাক্স। দানবাক্স কাচের। বর্মী চ্যা-তে প্রায় ভর্তি বাক্স। প্রশস্ত সিঁড়ি একনাগাড়ে উঠে যায় নি। মাঝে মাঝে ২০-৩০ ফুটের মেঝে তারপর আবার সিঁড়ি। শেষের দিকে সিঁড়ি ঘন হয়ে উঠে গেছে। সেখানেও ১০-১২ ফুটের চত্বর আছে। একবারে এতগুলো সিঁড়ি উঠতে হলে খুব কষ্টই হতো।

বৃষ্টির রৌপ্য-গুঁড়ো কমে এলে ক্যামেরা বের করলাম। বেশি সময় নেই। প্যাগোডার চারদিকে ঘুরে আসতেও অনেক সময়ের দরকার। শোয়েডার্গ প্যাগোডার মতো হলেও এর চারদিকের চত্বরে আছে বকুল ও ওই জাতীয় গাছ। ফুল পড়ে আছে গাছতলায়। মোজাইক ভিজে আছে বলে সতর্ক হয়ে পা বাড়ানি। তাড়াহুড়ো করার কোনো উপায় নেই। দ্রুত প্যাগোডার চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে আসব তা হবার নয়। তাহলেই পা পিছলে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। রাধাও অন্ধকার রাতে অভিসারে যাওয়ার সময় আছাড় খেয়ে না পড়ার জন্য দিনে উঠোনে পানি ঢেলে পিছল করে মহড়ায় নামতেন। আর আমি তো প্যাগোডা দেখতে এসেছি, আমার তো চপলতা সাজে না, এই বয়সে আছাড় খেয়ে হাড় ভাঙলে সহজে জোড়া লাগবে না। ধর্ম বা মোক্ষ তখন মাথায় উঠবে। অতএব নিজেকে কঠোরভাবে

শাসিয়ে বুড়ো আঙুল টিপে হাঁটছি। বৃষ্টির রৌপ্য দানা উধাও। ডান পাশে বকুল। তারপর একটি মন্দির। তাতে এক সারি বুদ্ধ। ভূমিস্পর্শ ও ধ্যানীমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ। আনত ও অর্ধনিমিলিত আঁখি। ধ্যানীর মুখে সিঙ্কিলাভের গৌরব ও তৃপ্তি। ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ শান্ত, সমাহিত ও তৃপ্ত। কারণ তিনি নির্বাণের পূর্বেই নির্বাণ-সুখ উপলব্ধি করেছেন। গয়ার বোধিদ্ৰুম মূলে বুদ্ধত্ব লাভের সময় নির্বাণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করে সুখ-ভোগ করেছেন।

ডান দিকে আর না এগিয়ে ফিরে এলাম মূল প্রবেশ মুখে। সেখান থেকে বাঁ দিকের বিশাল ছত্রাকার গাছগুলোর সামনে না গিয়ে পারলাম না। গাছের গোড়া দু'হাতের বেড় হবে, কিন্তু ডালপালা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া ছত্রাকার পরিধি হবে অন্তত এক শ' হাত। ঘন ও নিবিড় ডালপালা আর পাতা। তলায় দাঁড়িয়ে দেখি ডাল ও পাতা মাথার একটু উপরে। পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। পাতা অনেকখানি বটপাতার মতো, কিন্তু বটগাছ যদি হয়ে থাকে এমন বট আমি আগে দেখি নি। চরিত্র বটের মতো। চতুরের ঘেরার ভেতরে এক সারি গাছ। একটির গোড়া গোল করে পাড় বাঁধানো। বসা যায়। অন্যগুলোর বাঁধানো হয় নি। আর এমন বৃক্ষ মহাশয়ের ছবি না তুলে পারা যায়? সারির শেষ মাথার কোণে মন্দির। মন্দিরের চাল স্তরে স্তরে ক্রমশ ছোট হয়ে উঠে সৰু শীর্ষ হয়ে গেছে।

প্যাগোডার ছাতার নিচে ছোট ছোট ঘন্টাগুলো হাওয়ায় বাজছে। আমার কান সেই প্রথমই বুঝে ফেলেছে ঘন্টার মঞ্জুল সুস্বর। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠেই কানে বেজেছিল। এই শব্দ শোনার জন্য বহুবার এখানে আসা যায়। বড় ও ছোট ঘন্টা বা ঘুড়ুর শব্দকে কতভাবেই না শুনতে এরা ভালোবাসে। বৃন্দাকার ঘন্টা বাজাতে হয় কাঠের দণ্ড দিয়ে। না, বাড়ি মেরে নয়, গুঁতো মেরে। কাঠের দণ্ডের মাথা একটু খেঁতো হয়ে গেছে। এমন ঘন্টা প্রত্যেক প্যাগোডায় আছে। এই ঘন্টা বাজালে দুঃখের অবসান হয়, পুণ্য হয়। আর পুণ্য যদি না-ও হয় এর শব্দ মন ভরিয়ে দেয়, শ্রবণ সুখকর। এই সুখই কি পুণ্য? এই অনাবিল খণ্ড খণ্ড সুখই কি একত্র হয়ে হয় নির্বাণ! গৌতম বুদ্ধ জানতে পারেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁকে প্রশ্ন করা যেত। সুখ অবিচ্ছিন্ন হলেই তো দুঃখের অবসান। চিরতরে দুঃখের অবসানই তো নির্বাণ। প্রশ্ন করারই-বা কী থাকতে পারে! তার চেয়ে নিজের মতো করে বুঝতে চেষ্টা করা কি ভালো নয়!

বড় বেশি মার্গীয় কথাবার্তা হয়ে গেল। ঘন্টা থেকে চোখ আরও উপরে শিখরের দিকে নিয়ে গেলাম। ওখানে পবিত্র পাখি বসার দাঁড়া আছে। কেন? প্রত্যেক প্যাগোডার শিখর হীরক-কুঁড়ির নিচেই আছে এই দাঁড়া। আকাশবিহারী পাখি যদি এখানে দু'দণ্ড বসে বিশ্রাম নেয়, আর প্যাগোডা দেখতে আসা পুণ্যার্থীরা তা দেখে অপরাধ আনন্দ উপভোগ করবে। এই জন্যই কি? বর্মীরা খাওয়ার ব্যাপারে বাছ-বিচার বড় একটা করে না। চড়ুই থেকে বুনো হাঁস সবই খায়। ২৪ মে থেকে

২৮ মে এই চার-পাঁচ দিনে পাখি দেখেছি খুব কম। অথচ বার্মা দেশের ৬৫ ভাগ অরণ্য, কিন্তু বিলে বা মংডু থেকে ভুচিদং আসার পাহাড়ি পথেও পাখি দেখেছি কম। রাস্তায় বাস থামলেই ফেরিওয়ালারা খাবার নিয়ে হামলে পড়ে। তাতে দেখেছি ভাজা ছোট ছোট পাখি। ঠোট, মাথা, শরীর ও পা-সমেত কড়কড়ে ভাজা পাখি। দেখে খুব খারাপ লাগল। তা হলে এখানে পবিত্র পাখি বসার জায়গা রাখার এত আয়াস কেন? না, এ-বিষয়ে কারুর কাছে প্রশ্ন করি নি। ভাবলাম, দেখি আরও কী কী চোখে পড়ে! পাখি ও প্রকৃতি আপনা-আপনিই আমার অনুভবে ধরা পড়বে। এর জন্য আমাকে আশা করি কখনও মল্লযুদ্ধ করতে হবে না।

শোয়েমদউ বা শোয়েডার্গ প্যাগোডা নিরেট। ভেতরে দেখা যায় না। অন্য অনেক প্যাগোডা আছে যার ভেতরে মাঝখানে বড় বড় বুদ্ধ থাকে। এ রকম প্যাগোডায় সাধারণত চারটি প্রবেশপথ থাকে এবং চারটি বড় বড় বুদ্ধ থাকে। শোয়েমদউ নিরেট প্যাগোডা। প্যাগোডার চারদিকে প্রশস্ত গোল চত্বর। চত্বরে টাইল্‌স বসানো। চত্বরের চারদিকে অনেকগুলো ছোট-বড় মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরে বিভিন্ন আকার ও ভঙ্গির বুদ্ধ। কত তার শোভা, শৈল্পিক দক্ষতা আর বৈচিত্র্য। এতগুলো মন্দির অল্প সময়ে দেখে শেষ করা কঠিন। দেখলেও মনে রাখা প্রায় অসম্ভব। এই কয় দিনে কত যে দেখেছি! আর একটার সঙ্গে আরেকটা ইতোমধ্যে গুলিয়ে বসেছি, আমি নিশ্চিত। এজন্য যথাসম্ভব লিখে রেখেছি নোট খাতায়। স্বর্গের সব ঘরও নাকি জমকালো, সেখানেও এই বিভ্রান্তি হবে!

আবার রৌপ্য-গুঁড়ো বৃষ্টি শুরু হলো। মেঘের ফাঁক থেকে রোদের ঝলক বেরিয়ে এসে আবার চলে যায়। আঁধার করা মেঘ নেই, এই মেঘে ভারি বর্ষণও হবে না। সুপ্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামার উপায় নেই, তাহলেই পদাঙ্কলন হয়ে যাবে। তার মধ্যে এক প্রস্থ টাইল্‌স আছে একটু খসখসে, সেগুলোর রঙ খয়েরি গালিচার মতো। এ রকম চারটি এক ফুটের লাইন উপর থেকে নিচে পর্যন্ত নেমে গেছে। আমি সেই পথ ধরে খালি পায়ে দ্রুত নেমে এলাম একেবারে নিচে। জুতো গাড়িতে। রাস্তার ওপারে ছোট গুমটি দোকান। তরুণী দোকানি। দ্রুত আশপাশটা দেখে নিতে হবে না? এক প্যাকেট লন্ডন নিলাম। ওর কাছে দেশলাই নেই। সে খুশি মনে বিনা পয়সায় দোকানের লাইটারটা দিয়ে দিল। মিলিটারি পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। হালকা ঠাণ্ডা হাওয়া ও ততোধিক হালকা বৃষ্টিতে এক চুমুক হইস্কি হলে বেশ জমে উঠত। কিন্তু প্যাগোডা ও বিহার দর্শনার্থীর পক্ষে এই কাজ শোভা পায় না। তাই বলে মন তো সব নিষেধ সবসময় মানতে চায় না। আর মনেরও কেন যে এমন বেয়াড়া ইচ্ছে হয়! এত ডাগর আঁখি চারদিকে ছড়ানো যে মনেরও দোষ দেই কী করে? আবার প্যাগোডার সৌন্দর্য দেখেও মন টইটমুর। দু' চোখ ভরে শুধু দেখছি। সঙ্গে যদি রুবী বড়ুয়া, জয়ী ও তূর্য থাকত! মানুষের সাধ কত ভাবেই না অপূর্ণ থেকে যায়! আমার স্ত্রী রুবীকে নিয়ে আজ পর্যন্ত দূরে কোথাও

যাওয়াই হয় নি।

আমাদের তুলে নিয়ে গাড়ি আবার ছুটল পূর্ণ বেগে। সামনে মাথাব্যথার মতো সামরিক প্রহরার গাড়ি। সবাই বলছে ভি.আই.পি বলে আমাদের সম্মান দিচ্ছে। মহিলারা কলকল করছে। বিমলেন্দু, ইন্দু, অমলেন্দু, সুবোধ তাদের বউদের নিয়ে চলতে চলতেও ব্যস্ত। যেন বউয়েরা বাস থেকে টুক করে পড়েও যেতে পারে! সামরিক গাড়ি তো পেছনে নেই, কে কুড়িয়ে নেবে? সলিলবিহারীর বউ সঙ্গে আসে নি। বিকিরণ বউ নিয়ে এসেছে। এই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছে। প্রণব বড়ুয়া ও শচীন্দ্রলাল বিপত্নীক। প্রকাশ, কণক, সিদ্ধার্থ, মৃদুল বড়ুয়া চৌধুরী, মৃদুল চৌধুরী, প্রদীপ, দেবশিশ বা আমার বউ আসে নি। দেবী একা। পুলক অবিবাহিত। আর আমাদের তিন ভিক্ষু। এই নিয়ে আমরা ২৬ জন। সঙ্গে লটবহর। প্রত্যেকের দুটি করে হলেও ৫২টি হয়। গাড়িতে আর জায়গা নেই, হাঁটাচলাও মুশকিল।

পৌনে দশটায় নতুন টাউনশিপ এলাকায় এসে পৌঁছলাম। সামনে দেখি নতুন টাউনশিপের সামরিক প্রহরার গাড়ি। ওরা এখন আমাদের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। পুরোগামী গাড়ির সামরিক সদস্যরা হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাল। সামনে ওয়াও শহর এলাকা।

বিশাল বিলের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলছে। আমাদের গাইড বলল এখানে কতক মুসলিম বাসিন্দা আছে। বিলের মাঝে একটি একটি ছাড়া-বাড়ি। খামার বাড়ির মতো। এখানে চাষী পরিবার ধান উৎপন্ন করে। মোষ ও গরু চরছে। কেউ কেউ চাষ দিচ্ছে জমিতে। হাফ প্যান্ট পরা, মাথায় টোকা। মোটা-তাজা গরু। জষ্টি মাস। আগাম ধান চাষ শুরু হয়ে গেছে। বিশাল বিল, মাইলের পর মাইল। ঘন বসতিপূর্ণ কোনো পাড়া কোথাও নেই। রাস্তার ধারে কোনো দোকান নেই। দু'-চার মাইলের মধ্যে কোনো পথিকও নেই। জলসত্র নেই। শুধু বিল আর বিল। বাড়ির আঙিনায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। দু'-চারটা মুরগি, ছাগল বা গরু। রাস্তার পাশের বড় বড় বৃষ্টি শিরীষ গাছ ডালপালাহীন। বাঁরো-চোদ্দ হাত ওপরে ডাল কাটা। ছোট ছোট ডাল নিয়ে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। শতাব্দী প্রাচীন গাছ। হামেশা ঝড়-তুফান হয় বলে বড় ডাল রাখে নি। বিশাল রাস্তা। পাকা রাস্তার বাইরে অনেকখানি আছে রাস্তার এলাকা। সেখানে নতুন করে গাছ রোয়া হচ্ছে। বাঁদিকে অদূরে রেললাইন। উঁচু রেল রাস্তা। বোঝা যায় বান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উঁচু করে তৈরি। গাড়ির রাস্তা রেলরাস্তার সমান উঁচু নয়।

এই অব্যবহৃত বিলের মাঝেও অনেক অনাবদি জমি পড়ে আছে। শ্যামল ঘাস আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলা বিল। ওগুলো আবাদ হয় নি। আশ্চর্যজনকভাবে দেখি কোথাও পাখি নেই। খুব কৃচিৎ একটি বক। ব্যাস্। শালিক বা ফিঙে তো থাকবে? চড়ুইপাখি তো ওড়াউড়ি করবে! না, জলজ বা বৃক্ষবাসী কোনো পাখি নেই। আশ্চর্য!

ইয়াঙ্গুন শহর থেকে ক্রমশ পূব-উত্তর হয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছি। মিয়ানমার দেশটি উত্তর থেকে দক্ষিণে হাজার মাইল বিস্তৃত। অনেকটা আর্জেন্টিনা বা চিলির মতো। উত্তরে পর্বত ও শীতপ্রধান, দক্ষিণে গ্রীষ্মপ্রধান এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। এমন দেশে জীব বা পাখি-বৈচিত্র্য থাকা খুব স্বাভাবিক। না, পাখির দেশ নয় মিয়ানমার। এমনকি গো-মোষ সম্পদও পর্যাপ্ত নয়। মংডু থেকে ইয়াঙ্গুন হাজার মাইল তো পেরিয়ে এসেছি। সর্বত্র টিনের দুধের চা। আমাদের মতো দুধ, দই, মিষ্টি কোথাও পেলাম না। কোথাও একটি মিষ্টির দোকান দেখি নি। কোথায় যেন পেড়া-জাতীয় মিষ্টি একবার মাত্র চোখে দেখেছি। বর্মীরা ঘিয়ের গন্ধ সহ্য করতে পারে না পড়েছি প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' বইতে।

সাড়ে দশটায় এসে পেলাম সিট্টাং নদী। পাশে উঁচু রেলরাস্তা ও রেলসেতু। এপাশে নিচে গাড়ি চলাচল সেতু। তেপান্তরের বিল ফেলে পাহাড়ি এলাকায় এসে পড়েছি। সেতুর ওপারে পাহাড়ের পাশে শহর। উঁচু-নিচু শহর। সেতু আগলে আছে সামরিক কর্তৃপক্ষ। গাইডদের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। সামরিক প্রহরার গাড়ি বদল হলো। ঘোড়ার গাড়ি দেখলাম এই প্রথম। উঁচু-নিচু শহর বলে পাইক্যা রিকশা কম। ঘোড়ার একটা গাড়িই বেশি। গরুর গাড়ি আছে মাঝে মাঝে। সিট্টাং কাগজের কল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, মেঘের সঙ্গে মিলতে ছুটেছে। পরে এই সিট্টাং নদীর কথা পেয়েছি মিচিকো তাকেয়ামার 'হার্প অব বার্মা' উপন্যাসে। ১৯৯৬ সালে ইংরেজিতে ছাপা হয়। ১৯৮২ সালে তোকিও বা ১৯৯৬ সালে ফ্যুওয়াতে পেয়েও কিনি নি কেন আফসোস করছি। ইয়াঙ্গুন থেকে এবার পাব আশা করি।

পথ উঁচু-নিচু। ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা। মাঝে মাঝে বাগান। কাজু ও পেয়ারা বাগান। যত্নের ছাপ কোথাও নেই। মাঝে মাঝে নারকেল গাছ। চেরী পেকে হঠাৎ এসে মন ভরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাস বাগান। এখনও বিখ্যাত সেগুনবাগান চোখে পড়ে নি। মিঞ্জিরি গাছে হলুদ ফুল। এই ফুল খায়। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ও পার্বত্যবাসীরা চৈত্র মাস থেকে খেতে শুরু করে। একটু তেতো। তেতো দিয়ে ভালো ঘন্ট হয়। চৈত্রের দাবদাহে মিঞ্জিরি, গিমে, নিম, উচ্ছে, থানকুনি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। পিত্ত ঠাণ্ডা থাকে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের টুকিটাকি খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে মিয়ানমারের অনেক মিল। কিছুকাল আগেও চট্টগ্রামের বয়স্ক গরিব বৌদ্ধ ও মুসলিম রমণীরা লুঙ্গির মতো কাপড় পরত নিম্নাঙ্গে। উর্ধ্বাঙ্গে ওই পাঁচ হাত পরিমাণ আর একটি কাপড় পরত। অথবা উর্ধ্বাঙ্গে ব্লাউজ। মারমা ও চাকমারা এ রকম পোশাক পরে। বার্মার তরুণীদের লুঙ্গি সেলাই করা হয়। বৌদ্ধ বা মুসলিম রমণীদের নিম্নাঙ্গের লুঙ্গিটি হতো সেলাইহীন। এখনও গ্রামের সাধারণ ঘরের মুসলিম রমণীরা সেলাইহীন লুঙ্গি পরে। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের পানের বরজে মুসলিম রমণীরা এই কাপড়, বোরকা ও ছাতা মাথায় আসত। বড়ুয়া পল্লীতে ওরা অনেকখানি সহজ ছিল, পান নিয়ে আসত ঘরে ঘরে। পানের বদলে

তরি-তরকারি বা আম-কাঁঠাল নিয়ে যেত। সারি সারি পানের লতাগুলো বেড়া ও ছন দিয়ে ঘেরা থাকে বরজে। উপরে ছনের পাতলা চাল, তার ফাঁক দিয়ে প্রয়োজনীয় রোদ ঢোকে। মিয়ানমারেও সব জায়গায় পান। পথে পথে বরজ। পথে পথে পানের দোকানে সেজে বসে আছে মেয়েরা। তরুণী, শিশু বা বয়স্ক রমণী। দোকান বলতেই মেয়েদের একচ্ছত্র রাজ্যপাট।

ছোট একটি শহর পথে পড়ল। রাস্তার দু' পাশে মাথা সমান উঁচু ছোট টিলা। কয়েকটা দোকান। দুটো ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাস থামল। বাসের চালক ও সহকারী নেমে পড়ল। গাইড বলল কাউকে না নামতে। আমি টয়লেটে যাওয়ার কথা বলে নেমে পড়লাম। বড় একটি রেস্টুরাঁ। পেছনে বাথরুম। ডি ডি টি পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রী নেমে ছাব্বিশ বোতল পানি কিনে নিল। হকার মেয়েরা খাবার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কলাপাতায় মোড়া বিনি ভাত, নারকেল ও চিনি দিয়ে তৈরি এই মোঁ ফে-টো (Moant Phet-htok) বিক্রি করছে। তেकोणा सिङ्गाडार मतो। সস্তা। ৫০ চ্যা মাত্র। কিনে নিলাম। এটি বর্মীদের জাতীয় খাবার। প্রধান খাবারের মাঝখানে খায়। কোয়েলার ডিম চারটি করে পলি ব্যাগে প্যাকেট করে বেচছে। আম ৬টি ১০০ চ্যা। বড় চৌশার মতো। হলদে। এই আম আগে খেয়েছি। কিন্তু আম-কাটার ছুরি কোথায় পাব। ইংরেজ সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। ভারতে এসে আম খেতে গিয়ে সাহেবদের প্রথম প্রথম কী দুর্দশায় না পড়তে হয়েছিল। এক সাহেব বলেছিল, 'আম খাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আমটা নিয়ে বাথটবে চলে যাওয়া। আম খেয়ে একবারে স্নানটাও সেরে নেয়া ভালো।' আঙুর বিক্রি করছে। খুব সস্তা। ২০ টাকা কিলো। মিষ্টি কম, পানসে। টসটসে লালচে গোল আঙুর। এত সস্তা যে খেতে মন চায় না। পানসে বলে মুখে রোচে না।

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি বাসে চড়ে বসলাম। আবার শুরু। বাসের দরজার আগে ডান দিকে দ্বিতীয় সারিতে বসেছি। পাশে গাইড। মাঝে একবার রাবার বাগান পড়ল। ইনফেনট্রি ডিভিশনের বিশাল এলাকা সামনে। দুনিয়ার সব দেশে সামরিক এলাকাগুলো থাকে ছিমছাম। অল্প বয়সী সৈনিক তরুণদের দেখেছি ভুটিদং থেকে স্টিমারে আসার সময়। বাংলাদেশি টাকা বদল করব কিনা জানতে চেয়েছিল।

সোয়া এগারোটায় একটি ছোট শহরে এলাম। এখানে আমাদের যাত্রাবিরতি। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম। তারপর আবার যাত্রা। শ্রীমৎ গুদানন্দ মহাধেরো, পরমানন্দ ভিক্ষু ও সুমনতিষ্য ভিক্ষু আহারে বসেছেন। দুপুর বারোটায় আগে তাঁরা দিনের ছোয়াইং বা আহার শেষ করেন। সকালে একবার করেন। দিনের বারোটায় পর তাঁরা আর খাবার গ্রহণ করতে পারেন না। তবে চা, কিছু ফল ও ফলের রস খেতে পারেন। এটিই বুদ্ধের অনুশাসন। বুদ্ধের সময় থেকেই এই

নিয়ম। মহাযানীরা খাবার ব্যাপারে এত কঠোরতা মানেন না। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে থেরবাদ বা হীনযান প্রচলিত। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, দুই কোরিয়া, তাইওয়ান, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশ মহাযানপন্থী। মহাযান ও থেরবাদে মৌলিক নীতিতে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের লক্ষ দুঃখ থেকে মুক্তি, উভয়েই নির্বাণ আকাঙ্ক্ষী।

থেরবাদ প্রাচীন ও মূল সম্প্রদায়। এঁরা ধর্মপ্রচার ও উপদেশ দেন বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে। তথাগত বুদ্ধের ধর্মমত পালিভাষায় ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে। থেরবাদীরা এই পালিভাষা থেকে তা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন গৌতম বুদ্ধ একজন মানুষ, নিজের চেষ্টায় তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা তাঁর মধ্যে ছিল। অলৌকিক শক্তিও ছিল অশেষ। আবার অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করে মায়াবিদ্রম সৃষ্টির দ্বারা মানুষকে স্বধর্মে আনার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ধর্মমত প্রচার করা, মানুষকে উপদেশ দেয়া এবং মঙ্গলের বিষয় তিনি প্রকাশ করেছেন।

পাপ কাজ না করা, কুশল কাজ করা এবং চিত্ত শুদ্ধ রাখা থেরবাদের মূল কথা। এগুলো সম্যকভাবে পালন করার জন্য শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন দরকার। শীল ও সদাচার ধর্মজীবনের মূল ভিত্তি। গৃহী হয়েও এসব পালন করা সম্ভব। শীল বলতে ‘দশ শীল’কে বোঝায়। সংক্ষেপে দশশীল হলো—প্রাণিহত্যা, চুরি, মিথ্যা বাক্য বলা, ব্যভিচার, সুরা পান, বিকাল-ভোজন, নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ, মালা ও সুগন্ধ জিনিস ব্যবহার, উচ্চাসন ও মহাসন ব্যবহার ও সোনারূপা গ্রহণ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি গৃহীদের জন্য পালনীয় পঞ্চশীল। বিভিন্ন তিথিতে গৃহীদের প্রথম পাঁচটিসহ আরো তিনটি মিলে অষ্টশীল পালন করতে হয়। ভিক্ষুদের দশটি শীলই অবশ্যপালনীয়। এই দশটি শীলকে দশটি অকুশল কর্ম বা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা অর্থেও বর্ণনা করা হয়।

চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, অনাত্মবাদ, কর্মবাদ ও প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতির ওপর থেরবাদীরা বিশেষ জোর দেন। এদের চরম আদর্শ হলো অর্হত্ব ফল লাভ করা। সাধনার এই স্তরে উঠে গেলে হয় নির্বাণ লাভ। জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য থেরবাদীরা এভাবে আগে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে প্রয়াস পান। অর্হৎ হওয়ার অর্থ তিনি জন্মান্তর-স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ করে জন্ম এবং জীবনমুক্ত হন।

মহাযানীদের আদর্শ আগে বোধিসত্ত্বের মতো মানবের কল্যাণসাধন করে তারপর বুদ্ধত্ব লাভ, থেরবাদীদের মতো অর্হত্ব লাভ নয়। থেরবাদীরা নিজেদের নির্বাণ ও অর্হত্ব প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করেন। মহাযানীদের আদর্শ এই অর্থে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আদর্শ জগতের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা। তারা পৃথিবীর সকল জীবের উদ্ধারের কথা ভাবেন। সকলের দুঃখ-কষ্ট দূর করে

নির্বাণপ্রাপ্তির সাধনা করেন। জগতের সকল প্রাণীর মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করার জন্য নিজেরা চরম দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করতে পিছ পা হন না।

মহাযানের এই আদর্শের নাম আদর্শ বোধিসত্ত্ববাদ। তাদের মতে সকলেই যাতে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে তার জন্য আগে বোধিসত্ত্ব হতে হবে। বোধিসত্ত্ব হতে হলে প্রথমে বোধি চিন্তা নিতে হয়। যে-কোনো লোক পরোপকারের ব্রত নিয়ে আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিলে বোধিসত্ত্ব আখ্যা পান। জগতের স্থিতিকাল পর্যন্ত বোধিসত্ত্বরা নিজেদের স্থিতি কামনা করেন। তারা আরও কামনা করেন যে জগতের সব দুঃখ যেন তারাই ভোগ করেন এবং তাদের কুশলকর্মের জন্য যেন জগতে সুখ আসে। এ এক পরম করুণাময় জীবনযাপন, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। এই বোধিসত্ত্ব অবস্থা মহাযানপন্থীদের কাম্য। এভাবে তারা বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হন। বোধিসত্ত্বকে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্য দশটি চর্যায় পূর্ণতা লাভ করতে হয়। এর নাম দশ পারমী বা দশটি পারমিতা। থেরবাদেও এই দশ পারমীর কথা আছে।

মহাযান মতবাদে দার্শনিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। থেরবাদে নৈতিক তত্ত্বে বেশি জোর দেওয়া হয়। তাই মহাযান প্রধানত দর্শনমূলক, থেরবাদ নীতিমূলক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা একরকম অসম্ভব। দুই মতবাদ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এদের প্রভেদ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। মত ও পথ আপাতভাবে আলাদা মনে হলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অহিংসা বিদ্যমান।

জুতো খুলে যাত্রী নিবাসে উঠলাম। কাঠের মেঝেয় হাত দুয়েক উঁচু ঘর। দেয়াল কাঠের। জানালা কাচের। নিচু টেবিলে খাবার তৈরি। মুখ-হাত ধুয়ে বসে পড়লাম। স্যুপ, পোড়া লঙ্কা ভর্তা, কাঁচা ও কচি লেবু পাতা, কাঁচা-মিঠে আমের স্যালাদ, বরবটি সেদ্ধ, মাছ, মাংস, আম, লিচু মিলে পরিপূর্ণ খাবার। রান্নাও হয়েছে ভালো। তরকারিতে নুন সঠিক পরিমাণে হয়েছে। সী মঁ বা কাঁজি ইতোমধ্যে আমার প্রিয় হয়ে গেছে। তাতে পরিমাণমতো নাপ্পি আছে। পোড়া লঙ্কা ভর্তায়ও আছে। মুরগিকে বলে চে। ওয়াতা হলো গুয়োরের মাংস। ভাত হল থামে ছামেলা। মুড়ি হলো নুডল্‌স্। মি হলো নদী।

জিন ওয়ে জা বা সবুজ চা তো আছেই। ভাত খাওয়ার সময় পানি খাওয়া এখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। অভ্যেস করে নিছি। কথায়ও আছে রোমে গেলে রোমানদের মতো ব্যবহার করো। কোয়েলার ডিমের প্যাকেট বের করলাম। এক প্যাকেটে চারটা। সিদ্ধার্থ বা দেবাশিস কেউ নিল না। আমিও রেখে দিলাম। মো ফে টো বের করলাম। কলাপাতার মোড়ক খুলে দেখি চকচক করছে উন্নত জাতের বিনি চালের ভাত। চট্টগ্রামের বিনি ভাত থেকেও চকচকে ও আঠালো। মুখে দিয়ে দেখি অমৃততুল্য। আহা, কেন যে বেশি নিলাম না। এতদিন কেন যে পেয়েও সকালের চায়ের সঙ্গে খাই নি। সকালের জলখাবারের সময় বা তারপর থেকে দুপুরের খাওয়ার মধ্যে এই ভাত তো চমৎকার মধ্যবর্তী খাবার। নারকেল ও চিনি মিশিয়ে

দিয়েছে। সিদ্ধার্থও খুব প্রশংসা করল। আতপ চালের আঠালো ভাতও চমৎকার। লিচু আমাদের টেবিলে আসার আগেই শেষ হয়ে গেছে! আমাদের জন্যই বুঝি দু'-চারটা রয়ে গেল। বীজ ফেলে দিয়ে রেকাবে পরিবেশন করেছে। রংকুইসি আম। বেশ মিষ্টি। তারপর এলো দুধ-চা। এতদিনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো খাবার। আমার তো ওই এক হিসাব। পথে-প্রবাসে নাভি উন্টিয়ে খেও না। পেট ঠিক রেখো। পেট ঠিক থাকলে সব ঠিক। কাজেই পেটে দু'-এক ইঞ্চি জায়গা রেখে রয়ে-সহে খেয়ো। সুযোগ পেলে বিয়ার তো খাবই। তার বেলায় অকৃপণ। বিয়ারে তো পেট খারাপ হয় না। তলপেট সাফ করে নিলে সব পরিষ্কার। ওই দশ-পাঁচ মিনিট। গরমের ভ্রমণে বিয়ার আদর্শ পানীয়। ঠাণ্ডা বিয়ার এখানে-সেখানে সর্বত্র মিলবে। ক্যান নাও, খাও, ফেলে দাও। একটু আড়ালে গিয়ে চোঁ-চোঁ খেয়ে নাও। মুখ মুছে নাও জামার হাতায়। ব্যাস্ একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা। কে দেখছে। সিদ্ধার্থ ও দেবাশিস বা পুলক একেবারে পাতায় পাতায় হাঁটে। আমি ডালে ওঠার আগে ওরা পাতায় চলে যায়। ঠিক দেখে ফেলে। তবে ওরা বড় ভালো, আমার চোদ্দ খুন মাফ ওদের কাছে। কিন্তু অন্যরা একটা হলেই রে-রে করে উঠবে।

খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। তার আগে আমাদের যারা খাওয়াল তাদের ধন্যবাদ দিলাম। মহিলারা টেবিল গুছিয়ে নিল। ওপাশে বাকি খাবার গোছগাছ করে নিল। ওরা এখন খাবে। ওদের ছবি তুলে নিলাম। মুখে সেই হাসি। স্বর্গীয় হাসি তো আমরা অনুমান করেই বলি। এই হাসি দেখে অনুমান বলার উপায় এতটুকুও নেই। আমাদের জন্য রান্নাবান্না করে তৈরি হয়ে বসেছিল। কবে আমরা আসব। মিয়ানমারে সামরিক সরকার হোক কি রাজতন্ত্র হোক আমার কী আসে যায়। ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমরা যেখানে যেখানে যাব সব ছক বাঁধা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সি জু তুম্বারে। মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়ে গেল? কি আর করা, পরিমিত নুনের তরি-তরকারির রান্না এত ভালো হয়েছে যে ধন্যবাদ না জানালে নেমকহারাম হয়ে যাব না?

বেরিয়ে পড়লাম ধর্মশালার বাইরে। রাস্তার এপাশে ধর্মশালা, ওপারে প্যাগোডা। আচার, জেলি ও চাটনির দোকান দু'পাশে। সঙ্গে বর্মী ফল। ফলের নাম মিৎগো দি। ভাত, চা, সিগারেট খেয়ে মুখ এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু এই ফল তো আর পাব না। চেখে দেখতেই হয়। দোকানি মোটাসোটা মহিলা, তার ভাষায় কত-কি বলে যাচ্ছে। একবর্ণও বোঝার উপায় নেই। কিন্তু তার মিষ্টি হাসির ভাষা তো বুঝি। সুন্দর মুখের হাসির চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কী আছে জগতে। পথ চলতে চলতে এই স্মৃতিই তো কুড়িয়ে নেব। একেবারে আমার স্ত্রী রুবীর মতো। চোখে চশমা, ঠোঁট এমনিতেই টুকটুকে লাল। বর্মী মেয়েরা কি খুব লিপস্টিক দেয়? না, এ ব্যাপারে ওরা একান্ত স্বদেশী। মুখে-হাতে-গলায় সেনেকার মেখে দোকানে বসে থাকবে। ওদের এই দোকানি-পেশাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশীর্বাদ। নাকি দুঃখ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্বামীরা চলে যেত কাজে। স্ত্রী-সন্তান-কন্যা ঘরে। তারা ঘরের সামনে ঘরে তৈরি পান-কেক ইত্যাদি খাবার বিক্রি শুরু করল। মন্দ তো নয়! নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পিঠে লোকে গ্রহণ করল। ব্যাস, লাভের মুখও দেখা গেল। শেষে এমন হলো যে স্বামীদের বেতনের চেয়ে বউদের উপার্জন গেল বেড়ে। এতদিন ওরা ঘরের অন্য সব কাজ করেছে। এবার শুরু করল ব্যবসা। সেই যে শুরু আর থেমে নেই।

মহিলার ডান হাতে একগাছি সোনার চুড়ি। সোনা ওরা পরবেই। সোনা ছাড়া কি সোনা সঙ্গে অন্য কিছু মানায়? কানেও সোনা, গলায় সন্ধ্যা চেন। ঝোঁপা বাঁধা চুল। বিবাহিত রমণীদের এই রীতি। বিবাহিতেরা একেবারেই যে চুল খোলা রাখে না তাও নয়।

মিংগো দি দর করলাম। এখন আর দরাদরি করতে লজ্জা পাই না। এটা ওদের জন্য অপমানকর নয়। কে জানে কথা বলার জন্যই দরাদরি প্রথার চালু হয়েছে কিনা। জাপানিরা কম কথা বলে। ওদের দোকানে দরাদরি নেই। ওদের কথা বলার সময় নেই। বর্মীদের অটেল সময়। এখানে জীবন অনেক স্থবির। অনেক নির্ভরও। এখানে এসে আমাদেরও তাই।

দরাদরিই-বা কী করব। চারটার দাম চল্লিশ চ্যা বা তারও কম। দুটো নিলাম। গাবই। দেখতেও গাবের মতো, স্বাদও তাই। তবে কষ কম, গলায় আটকে থাকে না কষ। ভালোই তো। সামনে প্যাকেটে ও প্লাস্টিকের ডিব্বায় ভরা আচার। আম, আনারস, লেবু, আরো কত কি! রাস্তার ওপার থেকে আমের আচার নিলাম। এত কিছু ঘাঁটাঘাঁটির পর কিছু না নেওয়া মানায় না। খাড়া দুপুর বলে আর কোনো খন্দের নেই। আমাদের আসার সময় এক দল দর্শনার্থী গাড়িতে চড়ে চলে গেল। খেয়ে এসে নামতেই আরেক দল চলে গেল। চারদিক ফাঁকা, শব্দহীন, ভারহীন। মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে পাকা কলার মতো রোদ। জ্যৈষ্ঠের দুপুর। সকালে বৃষ্টি ও মেঘ ছিল বলে গরমটা অনেকখানি সহনীয় মাত্রায় আছে। এই রোদে আম-কাঁঠাল পাকে।

এই রোদে মন্দিরের সিংহদুয়ারে প্রহরী সিংহ-দুটি বসে দু'থাবায় সামনে ভার রেখেছে। হাঁ করা মুখ, বড় বড় দুটি চোখ। কালো দু'গাছি দাড়ি চিবুক থেকে ঝুলে আছে। গলার কেশর গহনার মতো সাজানো। সুপুষ্ট বক্ষ, কাঁধ, পা। নোখ বের করা। দু'পাশের দুই সিংহের মাঝে অর্ধবৃত্তাকার তোরণ। তোরণ দিয়ে নিচু ধাপ বেয়ে মন্দিরের প্রবেশপথ। টিলার ওপর প্যাগোডা। প্রবেশপথ রীতি অনুযায়ী ছাউনি দেওয়া। অল্প কিছুদূর গিয়েই বেদির ওপর একটি ছোট বুদ্ধ। তার ঠিক পেছনে দ্বিগুণ উঁচু বুদ্ধ। দু'স্তরবিশিষ্ট বেদি। টেরাকোটার মতো কাজ করা বেদিতে। রঙিন পাথরের ওপর কারুকাজ। বর্মী শিল্পীদের ভালো কাজের নিদর্শন বলা যায়। অর্ধবৃত্তাকার বেদি। বেদির দু'পাশে দুটি ঘট। তাতে ফুল, ধ্বজা ও

ছোট ছাড়া। ঝকঝকে টাইল্‌স্‌ নিচে। নীল, সাদা। তার ওপর ঘন বিচিত্র রঙের বেদির পাথর। ছবি তুলে নিলাম। ওদিক থেকে ডাক পড়েছে। সময় শেষ। বরাদ্দ করা সময় শেষ হয়ে গেলে সময় এত দামি হয় যে মূল্যবান রুবী পাথরকেও হার মানায়। ভালো করে দেখার, জানার সময় নেই। গাইডও নেই যে বুঝিয়ে দেবে। বইও নেই যে পড়ে শিখে নেব। পুস্তিকা যদি থাকেও তা বর্মী ভাষায়। সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে একটি ছবি নিয়ে বাসে উঠে এলাম। ততক্ষণে গায়ে ঘাম এসে গেছে। পেছনের তোরণের উপরে আগুনের শিখার মতো সোনা রঙের কারুকাজ দাউদাউ করছে রোদে পুড়ে পুড়ে। বর্মী শিল্পীদের কাজের প্রশংসা করতেই হয়। বাস সে-সময়ও বিশেষ দিল না। গর্জন করে ছুটল। সবাই খাওয়ার প্রশংসা করছে। দোকানি মহিলা অদৃশ্য হয়ে গেল। খাবার পরিবেশনকারী মহিলারা ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দীর্ঘ বেগি, সাদা ব্লাউজ, নীল লুঙ্গি পরা রমণীর অমলিন হাসি উড়ে চলে যায়। মোঁ ফে টো-র স্বাদ, নাকি মিংগো দি, নাকি বর্মী রমণীদের মধুর ব্যবহারকে সেরা বলব? বিদায়ের সময় বলেছি, ক দো বা যে, নমস্কার। হাত জোড় করে। ওরা করমর্দন পছন্দ করে না। কাজেই করস্পর্শ আর হয় না। করস্পর্শ, আলিঙ্গন যে হৃদয়ের ভার কতখানি হালকা করে তা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কী! তাহলে মা-বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি কেন? সন্তানকে বুকে ধরে কেন এত সুখ? প্রিয়জনের আলিঙ্গন কেন অনেক দিনের অদর্শনের বেদনা ভুলিয়ে দেয়? আমি জানি আপনি অন্য অনেক যুক্তি দিতে পারেন। আর বর্মী সমাজে চিন্ত-নিবৃত্তির, তৃষ্ণা-নিবারণের শিক্ষা সমাজের যাবতীয় আচার-ব্যবহারে সুস্পষ্ট।

স্বর্গের কাছাকাছি

দুপুরে পৌঁছাই ছোট্ট শহর কোমোসাকাইন। মন স্টেট। তিন পথের মোড়। একটা রাস্তা চলে গেছে প্রাচীন রাজ্য মউলামিনের পাহাড়ের পথে। মউলামিন হলো ডাওনা রেঞ্জের অংশ। ডাওনা রেঞ্জ উৎপন্ন হয়েছে হিমালয় পর্বতমালার পূর্ব সীমান্ত থেকে। ডাওনা রেঞ্জের অধিকাংশই পড়েছে থাইল্যান্ডে। কোমোসাকাইনের পূর্ব দিকে খুব কাছে থাই সীমান্ত। সীমান্ত থেকে অদূরে থাই শহর চিয়াং মাই। চিয়াং মাই আমার অনেক কথা জানে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এখানে তায়কো কুরুকাওয়া থাকত। ওর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব সেই ১৯৮২-তে তোকিও শহরে। আজও ওর বন্ধুত্ব তেমনি ঝলমলে প্রাণবন্ত। গত বছর সে দিল্লি ও চেন্নাইতে কাটিয়েছে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে। এখন সে ওসাকায়। ভীষণ অভিমानी হয়ে আছে আমি ওসাকায় যাচ্ছি না বলে। মিয়ানমার গিয়েছি শুনলে আরেক দফা রাগ বর্ষণ করবে। আমি ভয়ে ভয়ে এই ভাবনাতেই সুখী যে আমার এক বন্ধু আছে জাপানে। আমি ওর চিয়াং মাইতে

যাই নি। তবুও আমার খুব চেনা। ওর বর্ণনায় আমি দেখতে পাই বাঁশের মাচা ঘরে সে একা থাকত। এ রকম জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের প্রচণ্ড বজ্রপাতে সে একা শয়্যায় সৈঁধিয়ে থাকে। তোকিও শহরে অমন বাজ কোনোদিন সে শোনে নি, একেবারে অপরিসীত। সে আরেক কাহিনী। কত কথা না-বলা থেকে যায়!

কোমোসাকাইন (Komosakain) শহরে আমাদের বড় গাড়ির বদলে হলো দুটি শক্ত-পোক্ত পিক-আপ জিপ। ছোট ট্রাকও বলা যায়। পাহাড়ি পথে চেকটিউ (Kyaik-Htee-Yoe) বা চেক্ টী-যু প্যাগোডায় পৌঁছতে হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৬১৫ ফুট উঁচুতে। বেস ক্যাম্প থেকে সাড়ে সাত মাইল পথ। ইয়াঙ্গুন থেকে ২২৯ কিমি। শোয়েডার্গ প্যাগোডার পর এর প্রসিদ্ধি, শ্রদ্ধা ও মহিমায় পূর্ণ। মিয়ানমারবাসী তিন দিন ছুটি পেলে এখানে ছুটে আসে। কিন্তু কেমন হবে এর চড়াই পথ? পৃথিবীর এই বুকের শীর্ষে উঠে কী দেখতে পাব? কেমন অনুভূতি হবে?

তার আগে আমাদের পিক-আপ গাড়ি দুটির বর্ণনা দেওয়া দরকার। গাড়ির ছাদ খোলা। বৃষ্টির সময় ত্রিপুর ঢাকা থাকে। দু' সারি বসার জায়গা। মুখোমুখি দু' সারিতে চোন্দ-পনেরো জন বসা যায়। ড্রাইভারের মাথার ওপর ঢাকা চালের পাশে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। আমার উদ্দেশ্য পাহাড়ে ওঠার পথে অরণ্যের শোভা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ব। গাড়ির সামনের শরীরে ঠেস দিয়ে ও ধরে দাঁড়াব।

পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথ গুরু হলো। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চলছি। রাস্তা খুব ভালা বা খুব খারাপও নয়। বোঝা হালকা বলেই কি খুব তড়পাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশে দু' জন, আর পেছনে সহকারীসহ আমরা চোন্দজন। খাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় হয়তো এমন বেয়াদবি করবে না। হঠাৎ প্রবল একটা ঝাঁকুনির চোটে বসা থেকে শরীর শূন্যে উঠে গেল, আবার ঝপ করে বসে পড়লাম যথাসময়ে।

গাড়ি-শূন্য এমন ফাঁকা রাস্তা দেখতে অভ্যস্ত নয় বাংলার মানুষ। মিনিট দশেক পরে একটা গাড়ি সামনে থেকে এসে অতিক্রম করে গেল। নির্জনতায় কি হাঁপিয়ে উঠেছি? সামনে দেখা যাচ্ছে শৈলশ্রেণী ও শিখর। দু' পাশে নিচু পাহাড়ের ঘন গাছপালা, মাঝে মাঝে বিল। মোষ চরছে। চাষবাস এখনও শুরু হয় নি। সেগুন বনের বিশাল সাম্রাজ্য যে কোথায় আছে কে জানে! পাতাহীন ফুলে ফুলে ভরা একটি চেরী পেন্ বাঁ দিকে পিছু ছুটে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল।

ঝুঁজতে শুরু করলাম পাখি, নতুন অচেনা গাছপালা, নতুন দৃশ্যাবলি। কোথায় পাখি? এ সময় পাখিদের বাচ্চা ফোটানোর কথা। কোথায় উধাও তারা? আকাশে মেঘ-ভাঙা রোদের লড়াই চলছে। আর রৌদ্রছায়ায় মালিক পাখিরা? গাছের পাতার ঝালর কাটা ফাঁক দিয়ে নেমে ঘাস ও মাটিতে একা খেলবে কেন রৌদ্রছায়া? পাতা ও রোদের আড়ালে আড়ালে থাকবে তো পোকা-মাকড়। এমনকি প্রজাপতিও নেই। গাছপালাও পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো চেনা-অচেনা। কোথায় গেলে তোমরা ও ময়ূরী, ও বসন্ত বৈরি! ওগো বেনেবৌ, ওলো রাজহংসী!

বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ের চূড়ার সঙ্গে মেঘের সোহাগ-সম্মোগ চলছে। কবি কালিদাসের উপমা অনুযায়ী পাহাড় যদি ধরণীর স্তন হয় তাহলে সজল মেঘমালার শৃঙ্গারপর্ব দারুণ জমে উঠেছে। আর বসে থাকা অর্থহীন। বাঁ দিক থেকে সিদ্ধার্থ উঠে পড়েছে। প্রবল ঝাঁকুনি খেতে খেতে মাত্র একটা ছবি তুলতে পেরেছি। এক হাতে গাড়ির কাঠখোঁটা লৌহদেহ ধরতেই হচ্ছে। না, দেহবল্লরী মোটেই নয়। মাহার মেং বেনা, সান ইয়ে মং নামের ইংরেজিতে লেখা দুটি জায়গা ফেলে গেলাম। বুনো লতাপাতা ও অরণ্যের ঝাঁঝালো গন্ধ আমাকে থাবা মেরে রাস্তার এপার-ওপার হয়ে গেল। বুক ভরে টেনে নিলাম। প্রথম প্রেমে পড়া বান্ধবীর চুলের ঘ্রাণের মতো, অঙ্গরাগের সুবাসের স্মৃতির মতো, শ্বেদবাল্পের তীব্র মাদকতাময় গন্ধের মতো। অরণ্যের কামে ও সুগন্ধে ডুবে গেলাম। বুকে ভরে নিয়েছি অরণ্যের সজল হাওয়া। কবি ও গদ্যকার সিদ্ধিকুর রহমানের চিকিৎসার কল্যাণে পরিপূর্ণ শ্বাস টানতে পারছি। দূর করে ফেলে দিয়েছি ভেন্টোলিন ইনহেলার। এখন আমি ফুসফুসের রোগে পড়ে আধখানা শ্বাস টানি না। পূর্ণ, দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বক্ষপঙ্খর ফুলিয়ে আবার ছেড়ে দিলাম। উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম, চেকটিউ-উ-উ, আর কত দূরে তুমি? চিয়াং মাই...। আমার হৃদয়ের বোন... কুমারী অরণ্য।

কী তীব্র, ঝাঁঝালো ও ঘন-সবুজ আক্রমণ। চেকটিউর আহ্বান! পরিপূর্ণ ও আগ্রাসী তার শক্তি। অরণ্যকে যদি যৌবনশক্তি, যুবতী, তীক্ষ্ণ নখরে ফুসফুসের ময়লা সাফকারী রজক, সর্বরোগহরী মোদক বলি তাহলে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। তায়কো আমাকে এ রকম লিখেছিল চিঠিতে। চিঠি ছাড়া কি বন্ধুত্ব অটুট থাকে? বহু দূরে মেঘের মতো মনের আকাশে যাকে দেখা যায় তার চিঠি ছাড়া বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব হয়ে থাকে কি? অরণ্যের শোভাও বন্ধুত্বের মতো, মনের আকাশে যাকে দেখা যায় তার চিঠি ছাড়া বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব হয়ে থাকে কি? অরণ্যের সৌরভও বন্ধুত্বের মতো, বউয়ের মতো, বউয়ের আদরের মতো, ভালোবাসার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুয়ের মাঝে ছেদ-ভেদ নেই, বিরাম নেই। একটি নিশ্বাসে... বর্মীদের কথা অনুযায়ী এই নিষ্পাপ পরিচ্ছন্ন বায়ুতে প্রতি নিশ্বাসে এক ঘণ্টা করে আয়ু বেড়ে যায়! ইয়াঙ্গুনে কীন্তি পঞঞা ভিক্ষু আমাকে বলেছেন।

কীন্তি পঞঞা বাংলাদেশের। তিনি ধ্যান-সাধনা বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। এক নিশ্বাসে এক ঘণ্টা আয়ুলাভ কুহকিনী আশা নয় তো! হোক। আমি তার কুহকে পড়তে চাই। মায়াবিভ্রমে নিজেকে জড়াতে চাই।

বড় গাছের ফাঁকা ডালে বসা মাছরাঙাটি দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেরকেটে পাখি ডেকে উঠল দূরে কোথাও। গাড়ির শব্দের মাঝেও আমার কান সজাগ। আমার চোখ দেখে ফেলল প্রথম ঝরনাটি। স্রোতস্বতী হয়ে উঠেছে। উড়ে আসছে আর একখণ্ড বলদর্পী ভালোবাসাপ্রবণ মেঘ। দখল করে নিচ্ছে অনাবৃত পাহাড়ের সুডৌল পয়োধর। পরপর অনেকগুলো বুকুর স্ফীতি দখল করে নিয়েছে

একেক খণ্ড মেঘ। ওরা শেষ পর্যন্ত আর খণ্ড খণ্ড থাকছে না। আক্ষেপে ও আশ্রয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো আবৃত করে দিচ্ছে একেকটি চুড়ো। এই দৃশ্য বর্ণনার নয়, এই অভিজ্ঞতা লিখেও প্রকাশ করার মতো নয়। বলেও সঠিক বোঝানো প্রায় অসম্ভব। ভিডিও করে রাখলেও সঠিক রঙ ও রহস্য অপ্রকাশ্য থেকে যাবে। পাহাড় ও মেঘের খেলা এবং স্নেহ-ভালোবাসার রূপ কি বর্ণনায় প্রকাশ করা সম্ভব।

আবার মোড়, আর একটু যেতেই আরেকটি, আবার চড়াই, হঠাৎ আরেক মোড় এসে গেল। তারপর আবার চড়াই, ঘুরছি, চলছি। মোড় ঘুরতে ঘুরতে, চড়াই ডাঙতে ডাঙতে, পাশ ফিরতে, আবার বাঁক নিতে নিতে—যে-কোনো অবস্থায়, যে-কোনো পরিস্থিতিতে এই গাড়ি মৃতবৎ থেমে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

ছবি তুলতে গিয়ে একবার পড়েই গেলাম মেঝেয়। তবে বাইরে ছিটকে পড়ার উপায় নেই। গাড়ির দু' পাশের দেয়াল বুক সমান উঁচু তো হবেই। হা-হা করে উঠল পিন্টু চৌধুরী। অন্য গাড়ি থেকে সুবোধ বড়ুয়া চোখ বুঝল। প্রণবকুমার বড়ুয়া ভয়ে কাঁপছে। তবুও আমাদের দেখে অনেক কষ্টে হাসিমুখ করল। বিকিরণ ও প্রীতিও। প্রবীণ সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া স্তব্ধ।

চিৎকার করে বললাম, ওই দেখা যায় আরেকটি ঝরনা।

সিদ্ধার্থ ও আমি ছাড়া সবাই বসে পরিব্রাজাকে ডাকছে। মহিলারা সবাই সামনের গাড়িতে। তারা স্বামীদের সযত্নে ও সভয়ে বিপদ থেকে আড়াল করার জন্য মাথা নিচু করে আড়চোখে দেখছে। বাঁ পাশে গভীর খাদ। বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে ঝরনার স্বচ্ছ জল তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। সব দৃশ্য খুব ক্ষণস্থায়ী। গাড়ির বাঁক নিতেই ঝরনা বেমালুম হাওয়া। ডান দিকে বিশাল গাছের গায়ে তেমন বিশাল মরা গাছটি সেই কবে থেকে যে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ মরে গেলে মানুষই মৃতকে সমাহিত করে। অরণ্যের গাছ মরে গেলে তার পাশের সঙ্গীটি যত দিন পারে ভার বহন করে। জীবিত গাছটি তার ডালপালা দিয়ে মৃতকে ব্যজন করে, সান্ত্বনা দেয়, সোহাগ জানায়। আহা, মানুষ যদি তার মৃত প্রিয়জনকে এভাবে রেখে দিতে পারত!

ওই যে, দেখো দেখো, চেকটিউ পাহাড়ে মানুষকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার বাহন বাঁশের খোলা পালকি। মানুষেই বহন করে নিয়ে যাবে মানুষ।

ওই যে চায়ের দোকান পথের পাশে। জলসত্র। বাঁশের আরাম কেদারায় বিশ্রাম নিচ্ছে ক্লান্ত যাত্রী। পাশে পালকিও বিশ্রাম নিচ্ছে। তার পাশে অতল খাদ।

রেস্তুরায়, ওই যে, সরু ফালি ফালি করে কড়কড়ে ভাজা ছাগলের মাংস।

ওই তো ধুইন্দ্যা। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ বর্ষাফলার মতো কাঁটার কাঁঠাল।

থালায় সাজিয়ে রেখেছে মো ফে টো। কলাপাতায় মোড়া মিষ্টি বিনি ভাত।

সেনেকার মেখে তস্বী তরুণী বসে আছে দোকানে। অরণ্যের পাশেই এই অনাবিল সৌন্দর্য সম্ভব।

হাওয়ায় দুলছে ঝুলে পড়া কৃষ্ণচূড়া পৈ। উড়ে গেল ঘুঘু। বাচ্চা কোলে মা। তার পাশে, উপরে, খাদের নিচে, ডানে ও বাঁয়ে কেবল অরণ্য। পাকা রাস্তা ও ঘর ছাড়া সবই অরণ্য। আমার দু' চোখ জুড়ে অরণ্যের উৎসব।

মোড় ঘুরতেই এলো হোটেল। এমন নির্জন, নিরাপদ হোটেল আর কোথায় আছে? এমন স্বাস্থ্যকর জলহাওয়া কোথায় পাবেন। হোটেলের ওঠার নিজস্ব পাকা রাস্তা গাড়ি থেকে দেখছি। পাহাড়ের কোলে ছোট একটি গ্রাম। গ্রামও ঠিক নয়, কয়েকটি বাড়ির পুঞ্জ। প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজ্যে হঠাৎ কয়েকটি সুন্দর পাকা বাড়ি। সম্পূর্ণ পাকাও নয়। কাঠের মেঝে। কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে ইট গেঁথে দেয়াল তৈরি। প্রকৃতির মাঝে অসদৃশ, আবার চমৎকার মিলেমিশে গেছে। তার ওপর দয়ালু মেঘ নেমে পড়েছে। ঝুলে আছে। ওখানে মেঘ কিছুক্ষণ বর্ষণ করবে, রসিক মেঘ তার সুখ-সম্ভোগ রচনায় ব্যস্ত থাকবে। এখন কি তার সহজে প্রস্থান সম্ভব!

একে একে ইয়েতাগা সেইং হিল, সেইন্ট সিইং মিয়াং বেড, হেমওয়াদি বেড ফেলে আরও উর্ধ্বে অরণ্যের বুকে ঢুকে পড়েছি। আরও গভীরে প্রবেশ করছি, যত গভীরে যাচ্ছি তত মেঘ, তত ঠাণ্ডা হাওয়ার মধু। এ যেন অফুরন্ত অরণ্য-পর্বত, অশেষ মেঘ-মধুকুঞ্জে প্রবিষ্ট হচ্ছি। কোথায়, আর কত দূরে চেকটিউ! তাহলে কি স্বর্গের কাছাকাছি কোথাও! দেবতারা বাস করত এ রকম অগম্য পাহাড়ের নিভৃত শিখরে! প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করে জেনেছি দেবতারাও মানুষ। তবে তাদের রাজ্য মানুষের অগম্য, লোকালয় থেকে অনেক দূরে, পর্বতের বিশেষ উচ্চতায় তাদের রাজ্য। মানুষকে তারা তাদের রাজ্যে প্রবেশ করতে দেয় না। রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'সিংহ সেনাপতি' গ্রন্থে আছে। সঙ্গীতবিদ রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'দেবলোক' দেবতাদের কথা নিয়ে লেখা। দেবতারা ও দেবসভ্যতা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকতে পারে নি। মানুষের শঠতা, ধূর্ত বুদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করে জিততে পারে নি। সেই মানুষ এখন টিউব বেবি উৎপাদন করছে, গর্ভস্থ জ্রণের লিঙ্গ পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। সেই মানুষ এখন নিজেকে নিজে বিপন্ন করে তুলছে। আমার থাই বান্ধবী সঙ্ঘ বিয়ে করে নি আধুনিক জীবনের প্রতি বিবিজ্ঞ হয়ে। সে থাই রয়্যাল প্যালেসে আর্কিওলজিতে চাকরি করে। আমাকে ওর দেশে যেতে বলতে বলতে হৃদয় হয়ে রাগে চিঠি লেখে না।

বৃষ্টি আসার উপক্রম। না, বাঁ দিকের পাহাড়ের পয়োধর নিয়ে ওরা ব্যস্ত। এই বৃষ্টি ও ভালোবাসা নিয়ে চমৎকার উপাখ্যান আছে মিয়ানমারের। শাক্যা ও সুজার প্রেম-কাহিনী। ওদের জন্ম-জন্মান্তরের প্রেম-গাথা। তবে বিরহের নয়, মধুর মধু-মিলনের।

ফেলে এলাম ওয়েইবাজ হিল, উইংকাবার হিল ও সেনদাকু মং। ওয়ে, ওয়ে! বর্মীরা বিস্ময়ে, কাউকে ডাকতে বা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে বলে, ওয়ে! ব্যাস্, এরি মধ্যে স্বর্গরাজ্যের দুয়ার খুলে গেল! ঘুরে ঘুরে অবিরাম উঠতে উঠতে

পাহাড়ের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সামনে হঠাৎ করে প্রশস্ত সমতল রাস্তা। একেবারে পাহাড়ের ছাদে উঠে পড়লাম। সামনে এক অনিন্দ্যসুন্দর চত্বরে প্রবেশের তোরণ দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র দু'শ গজ সামনে। তোরণের দু'পাশে দুটি সিংহ বসে মুখ খুলে নিঃশব্দ গর্জন করছে। আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সিংহগর্জনে। বলছে, কষ্টের অবসান হলো। তোরণ থেকে সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ক্রমশ একটু একটু করে উপরে উঠে গেছে। বাঁ দিকে অতল খাদের উপত্যকা। উপত্যকায় অনবরত মেঘ এসে ছড়িয়ে পড়ছে। ছোট আসছে ধূসর সাদা মেঘ, জলকণা নিয়ে আসছে। পেছনে ঠেলছে দুষ্ট চপলমতি, কোমল-হৃদয়া হাওয়া-বালিকারা। এই মিষ্টি হাওয়া-বালিকারা এক খণ্ড মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে এসে আমাদের ওপর ফেলে দিল। ওই মেঘ আমাদের বাড়ি মেরে, তচ্ছল্য করে, আঁচলে আঘাত বা বিভ্রান্ত করে, পাখা করে, চুমুতে চুমুতে সিক্ত করে উড়ে চলল। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। চোখ বড় বড় করে তাকালাম। মোটেই রেগে-মেগে নয়। আমার ক্যামেরার কথা ভুলে গেলাম, ছাতার কথা মনে পড়ল না! বৃকের ভেতর ছোট্ট এক মেঘ-বালিকা ঢুকে পড়লে কি সর্বনাশ যে হয়ে যেতে পারে তাও ভুলে গেলাম। গত বছর হালুয়াঘাটে একখণ্ড মেঘ বৃকে ঢুকে আমাকে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে গেছে। রুবীর সমস্ত আদেশ-উপদেশ-উদ্দেশ্য ব্যর্থ। তায়কো কুরুকাওয়া বলেছিল, তুমি যথাসময়ে যথাযথ কাজটি করতে ভুলে গেলে কী করে হবে! জয়ী বলেছিল, বাবা, তুমি আমাদের কথা ভুলে গিয়েও শরীরের প্রতি নজর দিও। তূর্য বলেছিল, তোমার 'পোষা পাখি' সর্দি থেকে সতর্ক রেখো নিজেকে। মা-বাবা বেঁচে থাকলে, দুই বৌদি কাছে থাকলে, ছোট বোন আভা কত কী উপদেশ দিত। আঃ, কী সুন্দর আশ্চর্য চঞ্চল ও চলিষ্ণু মেঘ আমাকে চুমুতে চুমুতে সিক্ত করে, কানে কানে গূঢ় এক মন্ত্রণা দিয়ে চলে গেল। ওর প্রগলভ মন্ত্রণা অনুযায়ী আমি সাহসী হয়ে উঠব। এই বিদেশ-বিড়ুয়ে সে এক আশ্চর্য রহস্যময় বারতা।

গাড়ির একেবারে সামনে বসেছি বলে নামতে হলো সবার শেষে। পেছনের ডালা বেয়ে লাফিয়ে পড়লাম। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে কি অত জোরে হাঁটা যায়! অথচ প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে সামনে না-জানি কী সব অদেখা দৃশ্য সবাই আগে-ভাগে দেখে নিচ্ছে। হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক। এক দণ্ড আগে এই ভূস্বর্গলোকে যে যা দেখে নিয়েছে তার তো আর অবশিষ্ট নেই। সময় তো আমার জন্য বসে নেই। নিত্য পরিবর্তনশীল সময় ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তারা তো কোথাও স্থির নয়। সিঁড়ির তিরিশ-চল্লিশ ধাপ উপরে তোরণ। তার দু'পাশে সদাজাগ্রত প্রহরী দুই সিংহ মহাশয় অনড় বসে আছে। গুরুতে সন্তর ফুটের মতো প্রশস্ত সিঁড়ি। তোরণের পরে ছোট হয়ে গেছে। বড়-ছোট, প্রশস্ত, প্রায় সমতল এই সিঁড়ি। উঠতে আর কষ্ট হবে না, আর পৌঁছার আনন্দ তো রয়েছেই।

মাথায় কল্লোং বা থুরুং খুলিয়ে যাত্রীদের মোট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তরুণ কুলিরা।

আমাদের দেশে চাকমা-মারমাদের মতো। কারুর পায়ে জুতো নেই। দুই মেঘ বালিকারা আদেখলেপনায় মেতে উঠেছে। চেকটিউর আকাশে চুল এলিয়ে লাস্য বিস্তারে মত্ত। বাঁ দিকে পাহাড়ের গভীর খাদ। ডান দিকে এক সারি অফিসঘর। মেঘের আড়াল থেকে একটি স্বর্ণাভ প্যাগোডার চূড়া দেখা দিয়েছে। এটি চেকটিউর মূল চূড়া নয়। সবাই তরতর করে ছুটছে। কিছুদূর পরপর সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ, তারপর আবার সমতল। বাঁ দিকে খাদের কিনারায় ছোট ছোট ঝোপালো গাছে ভরা। বৈদ্যুতিক তার মাটির নিচ দিয়ে গিয়ে ঝুঁটিতে উঠেছে। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে কুয়াশার মতো মেঘ। জলকণায় পূর্ণ মেঘ। রূপকথা ও শিশু-কাহিনীতে যেমন মেঘ ধরে হাপুস-হাপুস খাওয়া যায় প্রায় সেই অবস্থা আমার। আমার স্নায়ুতন্ত্র ঝমঝম করছে, আমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে, দু' পায়ের কোটি কোটি স্নায়ু কোষগুলো আমি সনাক্ত করতে পারছি।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিপজ্জনকভাবে ঝুলন্ত এক ঋণ সোনালি পাথরের ওপরে সোনার মুকুট পরা চেকটিউ প্যাগোডা। বহু আকাজিকত, বিশ্বের অপার সৌন্দর্যের আধার এই প্যাগোডা। বর্মী শিল্পকীর্তির অপূর্ব নিদর্শন। এমন অপরূপ শিল্প পৃথিবীর আর কোথায় আছে! এমন নির্মল বায়ু পৃথিবীর আর কোথায় পাব! বুক ভরে যে নিশ্বাস নেব তাও ভুলে গেলাম। আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ওপর মন সমান নজরদারি করতে পারছে না। আমার চোখ ও কান সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। মন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ওপর সমান নজরদারি করতে ভুলে যাচ্ছে। ওকে দোষ দিয়ে কী হবে! সে কত দিক সামলাবে!

এত সচেতন তখন হয়তো ছিলাম না। বনভূমির ওপর একঋণ মেঘ ধরে রাখার জন্য বৃথাই এত ছবি তুললাম। এত মেঘ, এত হাওয়া, এত আলোছায়া, এমন ভূদৃশ্য, নিসর্গের এমন অকুপণ শোভা আর একবার পেয়েছিলাম নেপালে। কাঠমান্ডু থেকে লুম্বিনী কাননে যাওয়ার পথে পর্বতমালা টপকে যাওয়ার সময়। সেই বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ঝাড়া পর্বত দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওই যাত্রায় যদি দুর্ঘটনায় না পড়ে বেঁচে যাই তাহলে আর কখনো ওই পথে কাঠমান্ডু আসব না। হ্যাঁ, ভয় পেয়েছিলাম বটে। এবার একটুও না। চেকটিউর ৩৬০০ ফুট উঁচুতে ওঠার সময় সারা পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য অনুভব করেছি আর মিয়ানমারের মন ও মেঘবালিকাদের পুতুল-খেলার সাধি হয়েছে।

চেকটিউ বা চেইকাটিউ কেন বিখ্যাত সারা বিশ্বে? এখানে গৌতম বুদ্ধের তিন গাছি চুল রক্ষিত আছে বলে সবাই বিশ্বাস ও মান্য করে। তার ওপর প্যাগোডাটি যে পাথরের ওপর নির্মিত সেই পাথর ঋণটি পরের ইচ্ছাধীন বা নিরাপত্তাহীন বা অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গোলাকার-প্রায় বা শিল্পী রচিত একটি বড় শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্যাগোডাসহ পাথরটিকে আপনি যদি ধাক্কা দেন তাহলে সে কেঁপে উঠবে।

প্যাগোডার ইতিহাস অনুযায়ী বলা হয়েছে যে এটি দেবতাদের রাজা এখানে স্থাপন করেছেন। সুদূর অতীতকালে এটি দেবভূমি ছিল। চেকটিউ হলো এক 'মন'। মন-রা বার্মার একটি প্রাচীন জাতি। প্যাগোডাটি নির্জনবাসী এক মন ভিক্ষুর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই সন্ন্যাসী মৃত্যু-শয্যা গুয়ে বলেছিলেন, বুদ্ধের তিনটি চুল, আমার মাথার মতো একটি পাথরের ওপর প্যাগোডা নির্মাণ করে রক্ষা করতে হবে। দেবতাদের রাজা বুদ্ধের চুল এই পাহাড়ের শীর্ষে স্থাপন করেন।

বার্মাবাসী পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পায়ে হেঁটে এই পাহাড়ে আরোহণ করে। আমাদের ইচ্ছে থাকলেও হেঁটে ওঠার উপায় ছিল না। কারণ আমাদের তত্ত্বাবধায়ক হল মিয়ানমারের ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। তাদের ব্যবস্থায় আমাদের তীর্থ ভ্রমণ করতে হবে, তাদের ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। আমি অনুমান করছি পায়ে হেঁটে এখানে উঠতে কত আনন্দই না হতো! জানি পায়ে হেঁটে উঠতে অনেক কষ্ট। তবুও পথের ধারে আছে ঝাঁটি বর্মী রেস্টরাঁগুলো, তাতে কত রকম স্বদেশী খাবার ও ঝরনার মিঠে পানি! সাঘার হরিণ ও বন মোরগের মাংস। আমিষভোজীদের জন্য তো সুখবর। এসব মাংস বর্মী রীতিতে কড়া করে ভাজা, মুখে কড়কড় করবে, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। লাউ ভাজার সঙ্গে লেটুস, বাঁধাকপি ও ক্ষুধাউদ্বেককারী শস আছে। জিন ওয়ে জা নাকি গরম জল খাবেন। ইয়েমইয়াঙ্গি ক্যাম্পে গরম জলে স্নান করতে পারবেন, সেই সঙ্গে সুস্বাদু গরম রান্না। আরও রেস্ট হাউজ, রেস্টরাঁ, 'নাত' মন্দির আছে। নাত হচ্ছে শক্তি বা মন্ত্রতন্ত্রের দেবতা। সেখানে অল্প খরচে ঠাণ্ডা বা গরম স্নানের ব্যবস্থা আছে। চীনা রান্না নাকি বর্মী পদ্ধতি-কী চাই? আপনার রসনাকে তৃপ্তি দেবে।

একটু বিশ্রামের পর আবার আরোহণ, আবার ক্লান্ত হয়ে পড়লে পথের ধারে অন্য কোনো রেস্টরাঁয় বিশ্রাম ও পানাহারের সুবিধা পাবেন। সামনে অবিরাম খাড়া পথ, অমনি ক্লান্তি আসতে পারে। জিন ওয়ে জা সব রেস্টরাঁয় আছে। ভাষা সমস্যা? পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে গিয়ে শুধু ভাষা সমস্যার জন্য কেউ কিছু দেখতে-শুনতে পায় নি, উপোস থেকে কাটিয়েছে এমন ঘটনা ঘটে নি। তবে সংস্কারকে একটু সরিয়ে রাখার মানসিকতা চাই। বিদেশে নিয়ম নাস্তি। দেখবেন পথের ধারে নেমে এসেছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বা বয়স্ক মানুষ। ওরা পথিকজনের নানা উপকার করতে এগিয়ে আসবে। জলসত্রে জল ভরে রাখবে। কত কষ্ট করে তারা ঝরনার সঞ্জীবনী জল পথিকদের জন্য এনে রাখবে। রোদ থেকে বাঁচার জন্য জলসত্রে উপরে ছাউনি আছে। মানুষের উপকার করা মিয়ানমারবাসীর দীর্ঘদিনের অভ্যাস, সামাজিক রীতি। বোধিসত্ত্ব বহু জন্মে পরোপকার করে তবেই গৌতম হয়েছেন বুদ্ধ। সেই বিশ্বাসে বৌদ্ধরা পরোপকারী। তবে তার বদলে এসব গরিব-দুঃখীরা কিছু চ্যা সাহায্য চাইবে। পেলে তারা অতিরিক্ত হাসি উপহার দেবে। ওদের কাছে দু'-চার চ্যা অনেক।

পথের ধারে জীর্ণ দোকানটিই ওদের ঘর। প্রকৃতি ও জীবন-জীবিকার সঙ্গে লড়াই করে ওরা ওখানে টিকে আছে। বাঁশের তৈরি ফ্লাস্ক বিক্রি হচ্ছে। ব্যবহারের পরে সেটি আপনি সুভোনির হিসাবে ঘরে এনে রেখে দিতে পারবেন। আর অরণ্যের মধ্যে আরণ্য সংস্কৃতিই তো আমরা চাই। সুগন্ধি কাঠ, অর্কিড চারা, ভেষজ ওষুধ, শেকড়-বাকর, গাছের বাকল—সবই দুর্লভ। দুঃপ্রাপ্য গাছের চারা, বুনো প্রাণীর চামড়া, খুর, শিং, অজগর জাতীয় সাপের পিস্ত ইত্যাদি পাবেন। এসব পিস্তরস ধনুষ্টকার রোগের ওষুধ হিসেবে যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ রকম কত কী!

বেস ক্যাম্প থেকে সাত-আট ঘণ্টা সময় খরচ করে হেঁটে চেকটিউ পৌঁছান যায়। অথবা আরও একটু আয়েশ করে যাওয়া যায়। আরো থেমে, বিশ্রাম নিতে নিতে প্রাণবন্ত হয়ে, অমূল্য জিনিস সংগ্রহে আরো সময় দিয়ে, ফটো তুলে, পাহাড়ি মানুষের জীবনচর্চার খবর সংগ্রহ করে যেতে পারেন। রাত কাটানোর ব্যবস্থাও আছে। চেক টি হোটেলে আগে থেকে ব্যবস্থা করে গেলে প্যাগোডায় পৌঁছে থাকতে পারবেন। সেখানে জায়গা না পেলে প্যাগোডা কর্তৃপক্ষকে বলে দেখুন, তারা একটা ব্যবস্থা করে দেবেই। বর্মীদের সংস্কারের গভীরে আছে আতিথেয়তা। প্যাগোডার উত্তর-পূর্ব দিকের ছোট্ট বাজারের হোটেলগুলোতে থাকতে পারবেন। ওই হোটেল মালিকদের ঘরও একই সঙ্গে। ওদের ছেলেমেয়েরা আপনাকে সাহায্য করবে। ওদের আদর-যত্নে আপনি খুশি হবেন। ওদের মেয়েগুলো আমাদের কত না যত্ন করেছে। কত কথা তাদের। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কলকল করে কথা বুঝিয়ে দেবে। আপনার বর্মী শব্দভাণ্ডার ভরে উঠবে। যেন কতকালের চেনা, যেন কত আপন আমি। মনে মনে প্রেম করতে পারবেন। এই প্রেম অমলিন, ঝলমলে, অপাপবিদ্ধ। আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার সারাজীবনের জন্য ভরে উঠবে রঙে-রঙে। গল্প-কাহিনীতে। কল্পনায়। ঐশ্বর্যে। এমন দেশ আপনি পৃথিবীর কোথাও পাবেন না, এই পাহাড়ি সারল্য ছিল আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দাদের। সে-সব আজ স্মৃতিমাত্র, ওদের সারল্য কেড়ে নিয়ে বাঙালিরা ওদের দেশত্যাগী করতে চায় এখন, এজন্যই হয়তো আজ তারা স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার বাসনা পোষণ করে লড়ছে। আমরা আরাকানি রোহিঙ্গাদের দরদ দেখাই অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দাদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছি অত্যাচার। সারা বিশ্বে এই অমানবিক খেলা চলছে। বার্মা দেখে আমার মন হু-হু করে উঠেছে এজন্য।

চেকটিউ প্যাগোডার পাশের হোটেলের মিষ্টি মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম, নামে বিলু খলে, তোমার নাম কি?

এক গাল হেসে সে বলল, ওয়ে, তুমি বর্মী ভাষা জানো? আমার নাম মুইন থি।

বললাম, থে লা রে, তুমি খুব সুন্দর।—শুনো আবার অটহাসি। সঙ্গে ওর ছোট দু' বোন যোগ দিল।

আমি শব্দভাণ্ডার খুঁজতে নোট খাতা খুলে বললাম, এই নাও সি না, তুমি কি বিবাহিতা।

সে প্রথমে রেগে উঠবে নাকি হাসবে বুঝতে পারল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আরো রাগিয়ে দেওয়ার জন্য দূম করে বলে দিলাম, নেঙ্গু ছে দে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কি, ভালোবাসা? ওরা তিন বোন আরও কুটি কুটি। আমার সামনে জিন ওয়ে জা-র কাপ খালি। মুইন থি সলজ্জ হেসে তাড়াতাড়ি ভরে দিল। কিছু চা চলকে পড়ে গেল।

আমি ইংরেজিতে বললাম, এই যা, পড়ে গেল! এরকম পড়ে যাওয়া বাড়তিটুকু দিলেও হবে। তাতে তোমার ভালোবাসার পাত্র খালি হবে না। ভরা পাত্র ভরাই থাকবে।

এবার সে গোমরা মুখে মুহূর্তের মধ্যে হাসির তুফান তুলে ওর বোনদের কি কি বলে নিল দ্রুত। আমার বিদ্যা তো ওই কয়েকটি বাক্য। তাও বাক্যগুলো নোট খাতায় টুকে রাখা। কোমোসাকাং-এ এক মহিলা থেকে জেনে নিয়েছি। সেও মহা উৎসাহে বলেছে। এছাড়া আর উপায় কি! কেউ ইংরেজি জানলে তার সঙ্গে দু'-চারটি বর্মী শব্দ বলে যদি আনন্দ কুড়িয়ে নিতে পারি। সবই আনন্দের জন্য, শুধু দু' দিনের অপাপবিন্দু খেলা।

ভালোবাসাও তো এক বেদনা-বিধুর খেলা। হারজিত তো আছেই। আবার অমীমাংসিতও থেকে যায়। মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়, আলোর অভাবে ভেসে যায়, দাঙ্গা লেগে পণ্ড হয়ে যায়। আর এখন তো আমি সত্যিকার অর্থেই আনন্দ করার জন্য ওকে বলে ফেলেছি, নেঙ্গু ছে দে। কিন্তু কে জানত এই আনন্দ এক সময় সূক্ষ্ম বেদনায় মিহরির মতো জমে দানাদার হয়ে উঠবে।

ওর বোন নিসা ওয়ে বলল, তুমি আমাদের দোকান থেকে কিছু কিনছ না কেন?

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িলাম। ক্যাশ বাক্সের পাশে তাকিয়ায় মিয়ানমারের কড়া পানীয়, সিগারেট, আচার, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি। ভাবলাম এক পেগ হইস্কি তো খেতে পারি। আর এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিতে পারি।

বললাম, আমি তোমাদের ছবি তুলতে পারি।

মুইন আর রেগে নেই। স্বাভাবিক উচ্ছলতায় ওর অঙ্গ নৃত্যপর। দু' হাত নেড়ে কত কী যে বলে যাচ্ছে। ওদের হাতের মুদ্রার মানে আমি বুঝি না। তখন একজন বন্ধের এলো। সঙ্গে সঙ্গে সবার ছোট বোনটি ছুটে গেল। থালায় গোল লম্বা পরোটা ভেজে রেখেছে। একটা রেকাবিতে করে দিল, পরোটা এত লম্বা যে দু' মাথা রেকাবি থেকে বেরিয়ে আছে।

মুইন থি অনুরোধ করল, রাতে তোমরা এখানে খেতে পার।

বললাম, আমাদের তো তোমাদের সরকার খাওয়াচ্ছে। আমরা তো জানি না

কোথায় আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তোমাদের দোকানে কিনা তা তো জানি না।

সে বলল, তুমি বলে দেখো। অন্তত কাল সকালে জলখাবারও যদি খাও।

আমি বললাম এক পেগ চুইস্কি দাও। দেখি তোমাদের জিনিস কেমন।

অমনি সে প্রজাপতির মতো মুহূর্তে উড়ে গেল। ওর লুঙ্গি সবুজ রঙের। খাটো-হাতা জামা ফুলে ভরা। পায়ে দুই ফিতির স্যাভেল। তব্বী কুমারীদের যে-কোনো পোশাকই মানানসই। যৌবনই আসল সম্পদ। তার সৌন্দর্যই আলাদা, আকর্ষণও তীব্র। গালের রক্তমাভা ঢেকে আছে সেনেকারে। ও যে অবিবাহিতা তাও জানি। কিন্তু আমার বর্মী শব্দ ও বাক্যের ভাঙার ভীষণ গরিব। ওই 'নাও সি লা' বলে ওকে একটু পরীক্ষা করেছিলাম। ওর গালও সেনেকারে ঢাকা, ওখানে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো কি না বোঝা মুশকিল। বিয়ের কথা সব কুমারী ও কুমারের মনে দোলা জাগায়। আমাকেও জাগাত। আমি একজনের সঙ্গে প্রেমে পড়ার সময় সে আমাকে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেছিল। বলেছিল আমার যোগ্য পাত্রী সে খুঁজে দেবে। তার মধ্যে আসলে ওর গোপন ইচ্ছে লুকিয়েছিল। আমি জানি মুইন খি-র মনে এজন্য হাসি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া জাগবে না। আর সত্যিই সে রাগ করে নি। হো-হো হেসে উঠেছিল।

পানীয় হাতে নিয়ে ওর কাছ থেকে জেনে নিলাম আরও দুটি বাক্য। 'মি বু' অর্থ আমি বিবাহিত। আমি তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, 'টিওয়েই ইয়া দা ওয়ান তা বা দে।'

পানীয়ের সঙ্গে সে কাঁচা সর্ষের তেল ও নুনে মাখা ভাজা বাদাম এনে দিল।

বললাম, আমি তোমার ছবি তুলব।

না। তুমি যে-ছবি তুলবে তা তো আমি কখনও পাব না। কাল সকালে তুমি চলে যাবে। কোনো দিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। ছবিও পাঠাবে না। তার চেয়ে ভালো তুমি তোমাকে নিয়ে থাকো। কি হবে ছবি দিয়ে! অনেক বিদেশি ছবি তুলতে চায়। মাঝে মাঝে তুলতে দেই। আজ ইচ্ছে করছে না।

দেখো কত দূর থেকে এসেছি। কোথায় মানুষ গিজগিজ করা ঢাকা আর এই অসাধারণ সুন্দর ভিড়হীন চেকটিউর প্রকৃতি। সে বলল, আমি এখানে মা-বাবা ভাই-বোন নিয়ে থাকব। আর কখনো তুমি আসবে না। তোমার জীবন এক রকম, আমাদের অন্যরকম। তুমি সম্ভবত সাংবাদিক। ছবিগুলোর মধ্যে ভালোগুলো পত্রিকায় ছাপবে। খারাপগুলো পড়ে থাকবে।

তোমার ছবি খুব যত্ন করে তুলব ও রাখব। আর আমি ঠিক সাংবাদিক নই। আমি লিখি। গল্প বানাই।

বই লেখো? তুমি লেখক? তুমি কবি?—বলতে বলতে সে চোখ বড় বড় করে আমাকে চেয়ার থেকে উৎখাত করার অবস্থা। যেন আমি চুপি চুপি ওদের

প্যাগোডাটি পেটে পুরে নিয়েছি, চেকটিউ পাহাড়সুন্দ বাংলাদেশে তুলে নেওয়ার পায়তারা করছি, তেমনি বিশ্বাসে সে আমাকে নিয়ে পড়ল।

ওর এই উৎসাহ, সারল্য, প্রশংসার দৃষ্টি, ভারসাম্যহীন আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাকে আরও বেশি প্রশ্রয় দিয়ে নিঃশব্দ করে দিল। আমি ওর অমলিন বিশ্বজনীন ভালোবাসার প্রশ্রয় পেয়ে ডুবে গেলাম।

মুইন খি-র দু' বোন ছুটে এলো। ওদের মুখ থেকে বর্মী কথা বেরিয়ে এলো বসন্তে উড়িয়ে নেওয়া শুকনো পাতার মতো। অথবা ঝরে পড়ল। হ্যাঁ, ঝরা পাতাই। আমি এক বর্ণও যখন বুঝতে পারি নি তখন ঝরা পাতাই তো। স্থূপ করে রাখলে পচে যাবে। প্রেমে পড়লে ঝরা পাতার গায়ে প্রিয়জনের নাম লিখে উড়িয়ে দেওয়া যায়। এখানে সেই অর্থে প্রেমের ব্যাপার তো নেই।

মুইন খি চালিকাশক্তি হয়ে আমার পাশে বসে বলল, তুমি লেখক? একথা তুমি আগে কেন বলো নি? তুমি গল্প লিখবে আমাকে নিয়ে? দেখো, আমাকে একটা যা-তা মেয়ে করে দুর্নাম দিও না। আমি সে রকম নই। আমাদের হোটেল ব্যবসার জন্য তোমাকে কত কথা বলেছি। আচ্ছা, তুমিই বলো, আমাদের দোষ কোথায়। হোটেল ব্যবসাই আমাদের জীবিকা।

সে কি কথা! দোষ হবে কেন? কোনো দোষ তো তোমরা করো নি। তোমরা তিন বোন সত্যিই সুন্দরী। তার মধ্যে তুমি বেশি।

মুইন খি বলল, চেই যু তিন বা দে, ধন্যবাদ।

বললাম, লা বা, লা বা, চো যো বা দে। ওয়েলকাম।

আবার বললাম, আমি তোমার ছবি নেব।

আবার? তুমি তো নচ্ছার! রেহাই দেবে না? এই সেনেকার মুখে? কী করে হয়! তোমার দেশের লোকে দেখে কি বলবে! এই বিশ্ণী পোশাকে! না, হবে না। তুমি একজন মান্যগণ্য সাহিত্যিক, আমি মন গোষ্ঠীর মেয়ে। আমার সম্মানবোধ এখন খুব প্রবল হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি দেবী, লক্ষ্মীটি।—তারপর হাত জোড় করে বললাম, 'আমি তোমার ছবি তুলব' কথাটি দয়া করে বর্মী ভাষায় তর্জমা করে দাও। আমি লিখে নিই। কখন কোন কাজে লাগে!

ও তাই! ওরে পাজি, দুষ্ট, নচ্ছার!—একটু থেমে আবার যোগ করল, আসলে আমিই বোকা। একজন লেখকের সঙ্গে কথায় পারা যায়! কি ঘোরপ্যাচ রে বাবা! আমি তো ভেবেছি সত্যিই আমার ছবি তুলতে চাও। কি লজ্জা!

চাই না তো! কতবার বলেছি ভেবে দেখো!

তখন সে ফোঁস ফোঁস করে বলে উঠল, আলবৎ তুলতে হবে। তুমি আমার ছবি তুলবে। ছবির কপি পাঠাও-বা না-পাঠাও, তুলতে হবে। আমার ছবি দেখিয়ে তোমার দেশের লোকজনকে বলবে, এই দেখো বর্মিনী, হাড়ে হাড়ে বজ্জাত,

আমাকে চিবিয়ে খেয়েছে। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আর বলে দিও বর্মী মেয়ে কত ঠমক জানে। মায়াবিনী। জাদু-টোনাও করে। মন্দির ও প্যাগোডার আশেপাশে জ্যোতিষী, জাদু-টোনা করার বৈদ্য থাকে। জানো?

ওর বোনেরা তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা বলে বসল, সত্যিই দিদি, তুই বিয়ে করবি? (কথাগুলো বর্মী ভাষায় বলেছিল। আমার অনেক অনুরোধে অনুবাদ করে দেওয়াতে বুঝতে পেরেছি।)

মুইন খি বলল, একজন লেখক মানে কি তুই বুঝিস? আমি বললেই কি আমাকে বিয়ে করবেন? ওঁর বউ, ছেলে, মেয়ে আছে না? (বর্মী ভাষায় বলেছিল।)

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার মেয়ে তোমার বয়সী। তারপর ছেলে, এবার উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছে। তবে আমি... আমি মানুষটা খুব খারাপ নই। অল্প অল্প মন্দ। নিজের মুখে নিজেকে বেশি খারাপ বা বেশি ভালো কোনোটি বলা যায় না। অন্তত এ রকম ক্ষেত্রে। বুঝেছ?

তখন মুইন খি বলল, আমি জানি তোমার ছেলেমেয়ে থাকবে। তুমি আমাদের সঙ্গে মিথ্যে কিছু করতে পার না। তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝেছি। তবে তুমি যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ একটা-কিছু তা বুঝতে পারি নি।

খুঁজতে খুঁজতে নোট খাতায় একটা বাক্য পেলাম, 'পা জাই লে', আমি তোমাকে পছন্দ করি। কিন্তু আর বলা হলো না। বললাম, তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি গোয়েন্দা অফিস থেকে টাকা মাথায় দিয়ে এসেছিল সে কে?

খি বলল, আমার মাথায়ও টাকা ছিল। সে আমার বন্ধু। তোমাদের ডাকলাম, তোমরা এলে না কেন? সে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল। ও খুব ভালো গান গায়। কাল এই সামনের ভিডিও হলে ও গান গাইবে। কিন্তু তুমি তো কাল থাকবে না।

গোয়েন্দা অফিসে কাজ করে শুনে আমি মনে মনে দমে গেলাম। ইয়াঙ্গুনে শুনেছি আমাদের সবকিছু নজরদারি করছে আমাদের সঙ্গের দুই গাইড অফিসার। তাছাড়া গোয়েন্দাও আছে। পাসপোর্ট না দেখালে কোনো বিদেশিকে হোটেলে কেউ জায়গা দেবে না, কোনো ঘরেও আশ্রয় দেবে না। আর কোনো বিদেশির পক্ষে একদিনের জন্যও নাকি মিয়ানমারে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। সারা দেশ নাকি গোয়েন্দায় ভরা।

শেষে বললাম, 'হ্ সোনে গ্যা, থাই; দা প'। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। 'থাওয়া বি', আমি এখন যাই! বিদায়।

এবার সে হাসল বিষাদের। ও-হাসির ব্যাখ্যা চলে না। ওর সঙ্গে আর দেখা হয়তো হবে না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলেছি। ওর অসম্পূর্ণ অনেক কথা আমি নিজের মতো করে জুড়ে নিয়েছি। এটাই তো স্বাভাবিক। সময় নির্দয়। এখনো প্যাগোডার চারদিক ভালো করে দেখা হয় নি। সিদ্ধার্থ ও দেবাশিস এসে

গেল। মেঘেরা উড়ো চিঠি ওড়াচ্ছে। দেবাশিসের সঙ্গে মুইন থি-র খুব ভাব হয়েছিল। সাঁই-সাঁই উড়ে যাচ্ছে মেঘ, সময় ও হৃদয় উৎসারিত আবেগ। বাসনাকে বড় করতে করতে সিঁড়ির দিকে তাকালাম, ওই উনিশ তাকের সিঁড়ি অতিক্রম করে চেকটিউর চত্বর, সেখানে বিকেলের অপার্শ্ব সৌন্দর্যের নির্মল হামলা চলছে।

অফুরান সৌন্দর্য

সজল মেঘ। ধাঁ-ধাঁ করে এসে দোকানে ঢুকে পড়ে। লাজ-লজ্জা নেই, বাধা জোরদার না হলে ফাঁক-ফোকর দিয়ে চলে আসে। প্রবল সন্ত্রাসী বলা যায়। সন্ত্রাসের দেশে থেকে থেকে এই উপমাটি চলে এলো।

খুঁজতে খুঁজতে কণককান্তি বড়ুয়া চলে এলো। আমিও উঠে পড়লাম। না বলা কথাগুলো না বলা থেকে যায় এভাবে। দেবাশিস এখন একচ্ছত্র সম্রাট। দোকান থেকে বেরিয়ে কাঁঠাল খেতে চাইলাম। কণককান্তি বলল, খাবেন না, খাবেন না। আমি থাইল্যান্ডে খেয়ে দেখেছি, বিশী গন্ধ।

সুগন্ধ, সৌরভ, ভালো অনেক কিছু...চারদিকে ছড়িয়ে আছে। দেবাশিস ওদের নিয়ে পড়েছে। আসার সময় সিদ্ধার্থকে চুপি চুপি বললাম, এক ফাঁকে চলে এসো। সামনে চমৎকার রেস্টুরাঁ আছে। পানাহার জমবে। আবহাওয়াও ঠাণ্ডা।

চেকটিউর বিশাল চত্বরে কেউ নেই। সঙ্গে হতে অন্তত এক ঘণ্টা তো আছেই। কণককান্তি ঝরে গেল। একা একা ফিরছি। দলের অনেকে চেকটিউ-বন্দনায় ছাউনি দেওয়া মগুপে হাত জোড় করে বসে আছে। আমি রেস্ট হাউজ ফেলে যাচ্ছি। আমাদের অন্য সঙ্গীরাও রেস্ট হাউজ থেকে বেরিয়েছে। ভিক্ষুরা বের হয়েছেন। মাথার ওপর দিয়ে ফুৎকারে উড়ে যাচ্ছে বিষণ্ণ ধূসর-সজল মেঘ। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে এবং নিজেকে টেনে নিয়ে মেঘ চলে গেল। পেছনে আরেক দল মেঘ। ওদের বুকে জমে আছে অনেক বারি বিন্দু। আমি ছাতাটা সামনে বাগিয়ে ধরে মাথা নিচু করে বৃষ্টি-বিন্দু রোধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে রেলিং দেওয়া খালি চত্বর আমাকে ডাকছে। সেও একা, আমিও একাকী।

যতদূর চোখ যায় কুমারী অরণ্য। মেঘ সেখানে অরণ্যের কৌমার্য হরণে ব্যস্ত। আর কৌমার্যের সংজ্ঞা তো মানুষের বানানো। মানুষ আইন-কানুন বানিয়ে আবার তাকে দলিত করে বলেই তো সতীত্ব নষ্টের প্রশ্ন আসে। আদিম সমাজে এসব আইন অচল। ওদের কৌমার্যের ধারণা আমাদের মতো নয়। ওদের জবরদখল করে দেহ-মিলন হয় না, সেটা ওদের প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। এজন্য ওদের মধ্যে বলাৎকার নেই। কুমারী অরণ্যও তাই সঙ্গম শেষে আবার কুমারী হয়ে যায়। ওদের সতীত্ব নষ্ট হয় মানুষের অত্যাচারে। পাহাড়িরা, আদিবাসীরা প্রয়োজনে গাছ কাটে,

শিকার করে, দু'-একটি জীব হনন করে। সভ্য মানুষেরা উদ্ভাস করে পশুপাখি হত্যা করে, আর ভেবে দেখুন আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন আর গভীর অরণ্য বলতে যা বোঝায় তেমন অরণ্য নেই। অনেক পশু-পাখি মানুষের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আরও অনেকগুলো নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

চেকটিউর কুমারী অরণ্য আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি যখন ১৯৫৭ সালে রাঙ্গামাটি স্কুলে পড়তাম তখন রাঙ্গামাটি পানিতে ডুবে যায় নি, কাপ্তাই বাঁধ নামক জঞ্জালটি হয় নি। রাঙ্গামাটির আশপাশে ছিল সংরক্ষিত বনাঞ্চল। একটু ভেতরে গেলে বা দূরের পাহাড়গুলো ছিল এ রকম কুমারী অরণ্য। গর্জনতলি বা রিজার্ভ বাজার ফেলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যেতাম সঙ্গীদের সঙ্গে। একা যাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারতাম না। এও তেমন অরণ্য। আশেপাশে অরণ্যের পথ ধরে যাওয়ার পথ আছে। 'কাকের মুখ' জায়গাটি যে চেকটিউর আশপাশে কোথায় আছে আমি জানতেও পারি নি। কেউ বলেও নি যে প্যাগোডার উপকণ্ঠের সঙ্গে কাকের মুখ জায়গাটি যুক্ত। অরণ্যের ভেষজ ওষুধ, নানা জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোথায় পাওয়া যায় আমি জানার সুযোগ পাব না। বৃষ্টি নেমে আসছে হু-হু করে। আর কোথায় যাব? বড় জোর মূল তোরণের সামনের পানশালা পর্যন্ত যেতে পারব। শুধু প্যাগোডা দেখেই আমাকে ফিরে যেতে হবে, আশপাশের মানুষজনের সঙ্গে মেশার কোনো সুযোগ পাব না। সেই সুযোগ আমাদের দেবে না। আমাদের গাইডদ্বয় আমাদের একরকম চোখে চোখে রেখেছে। আর না রাখলেও দলছাড়া তো আমি হতে পারি না। যৎসামান্য সুযোগ নিয়ে মুইন থি বা ওয়ে-র সঙ্গে কথা বলতে পারি। ওদের সঙ্গে কথা বলে তো অরণ্যের গ্রামের মানুষের ছোঁয়া পাব না। পাশে কোথায় ডাট-পাউং-যু প্যাগোডা (Dat-Paung-Zu) আছে তাও জানতাম না। পরে এর নাম শুনেছি। সেখানে বিশেষ কোনো বস্তু বা গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্মৃতি নেই। না থাকুক, জায়গাটা তো দেখা হতো!

সিদ্ধার্থ ও দেবশিস এলো। ব্যাস্ বৃষ্টিতে আটকে গেলাম। তিনজনে মিলে এক ছাতায় হয় না। দু' জন চলে। সুজন হলে এক তেঁতুল পাতায় নাকি নয়জন বসে খেতে পারে। এই কুমারী কন্যার দেশে ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি নিয়ে বড় বেশি আদেখলেপনা করে। কিছুতেই ওরা আমাদের তিনজনকে সুজন হতে দেবে না। আর এই পাহাড়ের দেশে দরকার গাছের বা লোহার বাঁটের পুরনো দিনের ছাতা। এসব ভাঁজ-বিভঙ্গ করা ছাতা বড্ড ঠুনকো। হাওয়ার আক্রমণে এদিক-ওদিক বেঁকে বসবে, আবার ফুলে যাবে, কত রঙ্গ দেখাবে!

বৃষ্টি ও ঝড়ো-হাওয়া একটু কমতেই দৌড় দিতে গেলাম। না, পায়ের নিচের মোজাইক করা ও টাইল্‌স্ দেওয়া পথ মসৃণ বলে পিছল হয়ে গেছে। মাথার ওপর ঝড়ো মেঘের বিরাম নেই। গাছের সঙ্গে সংঘর্ষে হিসহিস শব্দ করছে। সাবধান করে দিচ্ছে। আর অন্য সময় হলে একে আদর করে কাব্যিপনা করতাম। এখন

আমাদের অল্প সময়ে যত বেশি আশপাশ ঘুরতে পারি ততই লাভ ।

‘ইয়া দান না’ হোটেলটি পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়িয়ে আছে, সামনের দিকটা ভূমির সমতলে, পেছনটা জমানো থামের ওপর । মেঝে কাঠের । কাঠের খুঁটি আর ইটের দেয়াল । বার্মায় এটি বেশ চলছে । লোহার বদলে কাঠ ব্যবহার । কাঠের খুঁটি ইট-সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দেয়াল করে ফেলে ।

মুরগির ঝাল ফ্রাই আর হুইস্কি । রাম ও জিন অনেক সস্তা । বিলিতি হুইস্কির প্রশংসায় উছলে উঠল সিদ্ধার্থ । হোটেলের থাকা ও খাওয়ার সব উপকরণ আছে । পাশে একটি ছোট দোকান । তাতে স্থানীয় তাঁতের কাপড়ের তৈরি পোশাক । জানালা খুলতে পারছি না বৃষ্টির হাঁট এসে হানা দিচ্ছে বলে । উত্তরের জানালা দিয়ে একফালি অরণ্য ও বৃষ্টি-শোভা দেখছি । অমরাবতী তো দেখি নি, এর শোভা আমার আগের দেখা সব দেখাকে হার মানিয়ে দিয়েছে । চেকটিউ আজ অমরাবতী । অমরাবতীর মধ্যে অমরাবতী । আর কৌমার্যের গরবে ডগোমগো, দেমাগী, কাজিফতা ।

সময়ের আর লাগাম নেই । কাল থেকে মহাকালে যাওয়া তার দস্তুর । কেবল ছুটছে । যত বলি একটু নিশ্বাস ফেলার সময় দাও, ওর কেবলই, না । একটু আয়েশ করে খাব-দাব তাও দেবে না, সময় মাঝে মাঝে এত জোরে ছোটে যে ত্রাস সৃষ্টি করে ।

সন্দের আগেই খাওয়া । বর্মী রীতি । আমাদের দেশে এখন বিকেলের চা খাওয়ার সময় । চেকটিউ প্যাগোডা-চত্বর বিশাল । কয়েক হাজার মানুষ এখানে বসে সভা করতে পারবে । শুকনো মরুভূমে বর্মীরা এখানে দলে দলে আসে পুণ্য অর্জন করতে । তখন এত মানুষ হয় যে হোটেলের জায়গা হয় না । এই বিশাল চত্বরে রাত কাটায় । ঢালাও বিছানা করে ঘুমোয় । সে এক অভাবনীয় দৃশ্য হবে কল্পনা করতে পারি । এখন বৃষ্টি-ভেজা চত্বর, সন্দের বাতি জ্বলে উঠেছে । আকাশে মেঘ । মেঘ না থাকলে সপ্তমীর চাঁদ উঠত ।

প্যাগোডা-চত্বর ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের সেই হোটেলগুলোর দিকে যাচ্ছি । বাঁয়ের প্রথম দোকানটি কাঁঠালের, তারপর আম ও ভাজাভাজির । সঙ্গে স্যুভেনির । পিঠ চুলকানোর কাঠের দুটি হাত কিনে নিলাম । মাঝে মাঝে পিঠ চুলকোতে হয় । ছেলে-মেয়ে বা বউকে দিয়ে হয় না । নিজের পিঠ পরকে দিয়ে চুলকোলে ঠিক জায়গায় কখনো হয় না । অথবা ঠিক জায়গায় চুলকোলেও পাশেই আবার চুলকোনি শুরু হয় । এজন্য গরু-মোষ বা বাঘ গাছের সঙ্গে পিঠ ঘসে নেয় । ঘোড়া সটান শুয়ে চিত হয়ে যায় । বাঘ এবং বেড়ালও তাই । ভারি সুন্দর হাতদুটি । পুরীতে পেয়েছিলাম সেই ১৯৭৩ সালে । হাড়ের তৈরি । কিন্তু কেনা হয় নি । পাশে দেখলাম পাথরের গায়ে কারুকাজ করে সুতোয় বিনুনি দিয়ে হাতের খাড়ুর মতো অলঙ্কার । ভারি সুন্দর ! পাঁচটি কিনে নিলাম । কিছু পাথরের আঙুটি । কীত্তি পঞঞা

ভিক্ষু বলেছিলেন এসব বাগানে (পাগান) প্রচুর, দামেও সস্তা। বাগানেও আমরা যাব। তখন না হয় আরও নেব, লোকজনকে বার্মার স্মৃতি হিসাবে উপহার দিতে পারব। কত কী যে কেনার আছে। না, লোভী হওয়া উচিত নয়। সবাই প্যাগোডার ছবি কিনছে। আমি অনেক ছবি তুলেছি, কাজেই ছবি কিনলাম না। পায়ে পায়ে রেস্টরায় যাচ্ছি। মুইন থি হাসি মুখে এগিয়ে এলো। ততক্ষণে জেনে গেছি ওর পাশের দোকানটিতে আমাদের খাওয়া হবে। আমাদের অগ্রবর্তী দল সেখানে বসে পড়েছে। দলের মধ্যে এ রকম আগেভাগে গিয়ে ভালো জায়গাটা দখল করার কিছু মানুষ তো থাকবেই।

মুইন থি চায়ের কেতলি ও কাপ এনে দোকানের বাইরের টুলে বসতে দিল। সে জানে আমরা ওর দোকানে খাচ্ছি না। তারপরও কি আন্তরিকতা! ওর চোখদুটি কি মায়াবী! এমন হাসিমুখ সচরাচর দেখা যায় না। 'ইয়া দান না' রেস্টরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় থি ও তার এক বান্ধবীকে দেখে চিনতেই পারি নি। ওর গায়ে তখন পাতলা জ্যাকেট। মাথায় টোকা। বৃষ্টি হলেই ওরা জ্যাকেট গায়ে দেয়। পুরুষেরা পেটের সমান ও হাত-লম্বা বর্মী জ্যাকেট গায়ে দেবে। এখন আবার লম্বা পান্চাত্য স্টাইলের জ্যাকেট এসেছে। ঢাকায়ও দেখেছি খাটো জ্যাকেট এসেছে।

দেবাশিস তখন বলেছিল, ওর সঙ্গে যাই?

সিদ্ধার্থ ও আমি তো মুইন থি-কে তখন চিনতেই পারি নি। ডান পাশের সরকারি গোয়েন্দা অফিসের বারান্দা থেকে ওরা নেমে এসেছিল। আমাদের দেখে হাসল। তবুও চিনতে পারি নি। জ্যাকেট গায়ে দেওয়ায় ওর চেহারা ই বদলে যায়। পিঠের চুল জ্যাকেটের ভেতরে। বৃষ্টির জন্যই। এজন্যই ওকে চিনতে পারি নি? পিঠে আলুলায়িত অলকদাম নেই, ব্লাউজের বাইরের কমণীয় বাহুল্য জ্যাকেটের হাতায় অদৃশ্য। গোখলির আলোর সঙ্গে ফ্লোরেসেন্ট বাতির ধাঁধা সৃষ্টিকারী আলো জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু ওই যে গোয়েন্দা অফিস থেকে বেরিয়েছে! একজন লোক চিনি দিয়েছে ওটা গোয়েন্দা অফিস। ব্যাস্, অমনি সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল।

সেই থি আমার সামনে জ্যাকেট খুলে ফেলেছে আর চিনতেও কষ্ট নেই। তারপর হাসিমুখে সবুজ চা দিল। আমার চোখ দুটো বদলে ফেলা দরকার। দৃষ্টির স্নায়ুরা ঠিক ঠিক কাজ করছে না। থি-র চোখ দুটি কি আমাকে মন্দ করে দিয়েছে? দেবাশিস সামনে। সে বলল, দিন, বাজির শর্ত পূরণ করুন।

থি নয় বলে তখন বাজি ধরেছিলাম। দেবাশিস ঠিক চিনে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে আমার স্মৃতি ভালো নয় জানি, তবুও বাজি ধরেছিলাম। তখন হঠাৎ নিজের ওপর এত আত্মবান কেন হয়ে পড়েছিলাম কে জানে! মুইন থি-র দেওয়া চা আর আয়েশ করে খাওয়া হলো না। ভাত খেতে চলে যেতে হলো। ঠিক পাশের রেস্টরা। ভাই-বোন মিলে খাবার দিচ্ছে। কর্মচারীও আছে। ভাজা ভাত, মাংস, তেঁতুল পাতার কাঁজি, পোড়ামরিচ ভর্তা, লেবু পাতা। হয়তো আমাদের গাইড মেনু

ঠিক করে দিয়েছে। কেউ কেউ ডিম নিল। মুরগির মাংস। মাংস বেশ শক্ত। সবুজ চা খাচ্ছি পানির বদলে। মাঝারি গরম। এখন আমি জিন ওয়ে জা-র ভক্ত হয়ে উঠেছি। ইতোমধ্যে নানা অনুষঙ্গ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

উল্টো দিকে ভিডিও হলঘরে নাটক বা সিনেমা চলছে। উঁকি মেরে দেখলাম। হাসির ধারাবাহিক নাটক বোধকরি, টিভি অনুষ্ঠানে চলছে। অথবা ভিডিও ছবি। লোকজন ঢুকছে। সেখানে সিনেমা হল নেই বলে এই ভিডিও ঘর। কুড়ি-তিরিশ জন বসতে পারে। কোথাও হয়তো বেশিও বসতে পারে। সিটউই (আকিয়াব) থেকে এ রকম ঘর দেখে আসছি। মুইন থি আবার সবুজ চা দিয়ে টুলে বসিয়ে দিল।

বৃষ্টি শুরু হলো। এমন বৃষ্টির রাতে এক জোড়া কিন্নর-কিন্নরী অরণ্যের ঝরনার ধারে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

প্রাচীন ধূসর জগতে

আন্তে আন্তে বৃষ্টি মুঘলধারায় পরিণত হবে। পাহাড়ি স্রোতস্বিনী হবে পারাপার হীন। একদা এ রকম পর্বত ও সানুদেশে ছিল দেবতাদের রম্যভূমি। নিচে থাকত অসুরেরা। কিন্নর-কিন্নরী। যক্ষরা। দিগ্বালিকারা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অসংকোচে যাভায়াত করত যেখানে-সেখানে।

একদা মঘা নামে এক যুবক ছিল। রূপবান সেই কিন্নর জন্মেছিল ধনী পরিবারে। সে তার গ্রাম ও জনপদের কল্যাণে রাস্তা, সন্ধ্যাগার ও কুয়ো খননের মতো সব রকম ভালো কাজ করত। তার প্রিয়তমা পত্নীর নাম ছিল সুজা। সুজা আয়েশি। আরাম-আয়েশে বিলাসী দিন কাটাত। জনপদের কোনো কাজে অংশ নিত না। মঘা তাকে খুব ভালোবাসত বলে তার আয়েশি-জীবনে বাধা দিত না, তার ইচ্ছেমাক্ষিক চলতে দিত।

মানুষের জীবন আর কতই-বা। মৃত্যুর পর মঘা স্বর্গতুল্য দেশে জন্ম নিল এবং সেখানকার রাজা হলো। তার নাম হলো শাক্য। পূর্বজন্মে তার যে-সব বন্ধু ভালো কাজ করেছিল তারাও তার সহচর হয়ে একই রাজ্যে জন্ম নিল। কিন্তু সুন্দরী সুজা তাদের মধ্যে ছিল না।

শাক্য তার জাতিস্মর জ্ঞান দ্বারা জানতে পারল সুজা এক সারস পাখি হয়ে কাছের অরণ্যে জন্ম নিয়েছে। সুজার জন্য তার মায়া হলো, পূর্বজন্মের প্রেম প্রবল হয়ে উঠল। রাজা শাক্য সারস-রূপী সুজাকে তার স্বর্গীয় রাজ্যে নিয়ে এসে নিজের বৈভব দেখাতে লাগল। কিন্তু তার ক্ষমতা দ্বারা সে তো আর সুজাকে পাখি থেকে মানবীতে রূপান্তরিত করতে পারে না!

শাক্য তখন বলল, সুজা, এজন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। তোমাকে পঞ্চশীলের প্রথম শীল প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কিন্তু প্রাণিহত্যা না করে সারস-রূপী সুজার জীবনধারণ করা খুব কষ্ট হবে। তাকে তো মাছ ও পোকা-মাকড় খেতে হবে। কিন্তু সুজা প্রতিজ্ঞা করল সে প্রাণিহত্যা করবে না। সে মরা মাছ, মরা ব্যাঙ, পদ্মের কচি পাতা, মাটির নিচের পুষ্ট শেকড় খেয়ে বাঁচবে।

একদিন সুজা দেখল একটি মাছ পানির কাছে কাদায় পড়ে আছে। সে মাছটিকে ঠোঁটে নিয়ে ভাবল সেটি মৃত। তখন মাছটি তার ঠোঁটে নড়ে উঠল। অমনি তার মনে পড়ল প্রাণিহত্যা না করার কথা। মাছটিকে সে পানিতে ছেড়ে দিল। মাছটি ছাড়া পেয়ে খুশিতে তীরবেগে ছুটে চলে গেল। সুজা মাছের সেই আনন্দের অংশীদার হলো। এভাবে না খেয়ে, অল্প খেয়ে একসময় সে মরে গেল। মৃত্যুর পর সে এক কুমোরের পরিবারে মেয়ে হয়ে জন্ম নিল। আশ্চর্য্যে সে রূপসী-রূপবতী হয়ে উঠল।

সুজার সঙ্গে মিলনের আশায় থাকতে থাকতে শাক্য রাজা এদিকে তার স্বর্গীয় রাজ্যে নিজের শক্তি সংহত করতে লাগল। অসুরেরা দেবরাজ্যে থেকে দেবতাদের সঙ্গে সবসময় বিবাদ করত। তারাও দেবতাদের মতো সুন্দর এবং শক্তিমান। অসুরেরা নিজেদের শরীরের রূপ পাল্টে নিতে পারত। তারা স্বর্গরাজ্যের ভাগ চাইতে লাগল। শাক্য কিন্তু তার রাজত্বের ভাগ অসুরদের দিতে নারাজ।

শাক্য একদিন অসুরদের পানোৎসবে ডাকল এবং খুব করে সুরা খেতে দিল। লোভে পরে অটল সুরা খেয়ে তারা মত্ত হয়ে গেল, বেহুঁশ। তখন শাক্য ও তার বন্ধুরা মিলে অসুরদের পাহাড়ের রাজ্য থেকে নিচে ফেলে দিল। মদমত্ত অসুরেরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে নি, তারা কোথায় পড়ে আছে তাও জানে না। বুঝতে পারল সুগন্ধ পারিজাত ফোটার ঝতু যখন এলো। সময় হলো, ঝতু এলো অথচ কোথাও তারা পারিজাত ফুটে দেখতে পেল না। শুধু তখনই তারা বুঝতে পারল দেবতাদের চক্রান্ত।

স্বর্গীয় রাজ্যের অগ্নিশিখার মতো পারিজাত কোথাও তারা খুঁজে পেল না। পারিজাতের সুগন্ধ থেকেও তারা বঞ্চিত। তার বদলে ঝোপ-ঝাড়, বুনো ফুল ফুটে আছে সর্বত্র। তাদের স্বপ্নভঙ্গ হলো।

অসুরেরা মিলে শাক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। বেজে উঠল তাদের বিশাল কাড়া-নাকড়া, রণদুন্দুভি। শব্দ হলো বজ্রনির্ঘোষ। অস্ত্রের ঝকঝক মনে হলো যেন আগুনের ঝলক। শাক্য রাজার স্বর্গীয় রাজ্য অস্ত্রের ঝনঝনায় ভরে গেল। ঝলসে উঠল বিদ্যুচ্চমক, রণদুন্দুভির শব্দ হলো যেন মেঘের গর্জন। তাতে মেঘেরা গলে গলে পড়তে লাগল। শুরু হলো বৃষ্টি। এভাবে আরও বহু বছর কেটে গেল।

কুমোরের ঘরের কন্যার জীবন শেষ হলে সুজা তখন অসুর রাজকন্যা হয়ে জন্ম

নিয়েছে। তার সৌন্দর্যের প্রশংসা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজপুত্রেরা তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পাণিপ্রার্থনা করল। একদিন তার স্বামী নির্বাচনের তারিখ ঠিক হলো।

সেদিন শাক্যও তার দলবল নিয়ে সুজা রাজকন্যার ভালোবাসা জয় করতে গেল। অনেক পরীক্ষা দিয়ে সে জয়ী হলো। সুজা হয়ে গেল শাক্য রাজার প্রধান রানী। এভাবে শাক্য রাজার অনুসন্ধান শেষ হলো, পূর্বজন্মের ভালোবাসার জয় হলো। সে খুব খুশি। এজন্য সে বিজয় উৎসব পালন করল। সেদিন সে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন নাম ধারণ করল। তার নতুন নাম হলো সুজাপতি—সুজার প্রভু ও স্বামী। সেই থেকে এই নামটি হলো তার খুব পছন্দের ও প্রিয় নাম।

কিন্তু অসুরেরা তাদের যুদ্ধ ত্যাগ করল না। পারিজাত ফুল তাদের বাগানে ফোটে না, ফোটে সাধারণ লাল রঙের গন্ধহীন একই রকম একটি ফুল। এটি তাদের জন্য খুব অপমানকর মনে হলো। কাজেই যুদ্ধ চলবে। সেই যুদ্ধ চলল দীর্ঘকাল, কিন্তু অসুরেরা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে আর জিততে পারল না। সেই থেকে দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ, সুর ও অসুরের লড়াই চলতে থাকল। সেই যুদ্ধের সঙ্গে আজও পারিজাত ফোটার ঋতুতে বজ্রনির্ঘোষে যুদ্ধের দামামা বাজে, অস্ত্রের চকচকে লোহা থেকে বিদ্যুতের ঝলক নির্গত হয়ে স্বর্গীয় ভূমির শান্তি বিঘ্ন করতে চায়।

আর তাই আকাশের মেঘেরা গলে গলে বৃষ্টি হয়ে ঝরে। বজ্রপাত ও বিদ্যুচ্চমকে দিগ্বিদিক কেঁপে ওঠে। চেকটিউতে সেই বৃষ্টি দেখতে পেলাম। মুইন থি আজকের দিনের দেবকন্যা। তা না হলে সে নিজের লাভ নেই জেনেও আমাকে সবুজ জিন ওয়ে জা খেতে দেয় কেন? দেবাশিস কেন এত মুগ্ধ হয়। কেন মুইন থি-র চোখে অকারণ করুণাধারা বয়ে যায়!

কিন্নর-কিন্নরী

পাহাড় ও বনের স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীর জলে কিন্নর ও কিন্নরীর পায়ের গোছা ডুবে যাচ্ছে। ছোট্টাছুটি করছে সলিলবিহারি রঙিন মাছ, স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে বুনা ফুলের পাপড়ি, ঝরা পাতা, রঙের ঝিলমিলি। ওরা ছোট্টাছুটি করে খেলছে সেই মুগ্ধ নিবিড় পরিবেশে। পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ছে কুলুকুলু নাদ, অরণ্যের গাছপালার ভালোবাসার প্রশ্রয় পেয়ে জাফরি-কাটা রোদ নেমে পড়েছে স্বচ্ছ জলে। নিচে চিকচিক ঝিলমিল করছে রঙিন নুড়ি পাথর। মূল্যবান রুবি-পান্নাও ছড়িয়ে আছে সেখানে। কিন্নর-কিন্নরীদের সেদিকে কোনো নজর নেই। ওদের মাথায়, গলায়, কোমরে ও বাহুতে ফুলের অলঙ্কার। সুখের নহর বয়ে যাচ্ছে তাদের হৃদয়

ও মনে। ভালোবাসার দূরন্তপনায় পেয়েছে তাদের। এ-পাথর থেকে ও-পাথর, এ-কূল থেকে ও-কূল, গাছপালার ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে।

ততক্ষণে সেই বহমান রমণীয় স্রোতস্বিনী ঝড়-বৃষ্টির দাপটে হয়ে গেল গর্জনশীল এক পাহাড়ি নদী। বড় বড় পাথর ও নুড়ি সবই ডুবে গেল স্রোতের নিচে।

কিন্নর ও কিন্নরী দু' জন অবাক বিস্ময়ে দেখল লুকোচুরি খেলতে গিয়ে তারা স্রোতস্বিনীর দু' পারে। হতবুদ্ধির মতো ওরা দাঁড়িয়ে রইল। একে অপরের কাছে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পেল না। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতেও পাচ্ছে না, শুধু বিদ্যুৎ চমকে উঠলে একে অপরকে দেখতে পাচ্ছে চোখের পলকের জন্য। সেই সান্ত্বনা নিয়ে ওরা দু' কূলে সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটাল। যে ভালোবাসা ওদের পৃথক করে দিল সেই ভালোবাসাই তাদের রাত জেগে প্রতীক্ষা করার প্রেরণা জোগাল। এর নাম প্রণয়।

সারা রাত ওদের জন্য হলো কঠোর এক পরীক্ষা। অসহায় কান্না ছাড়া কিছুই করার থাকল না। একে অপরকে হাত নেড়ে ইশারায় কথা বলছে। মুখের কথাও ঝড় ও স্রোতের গর্জনে শোনার উপায় নেই। আর ওই নিঃসীম অন্ধকারে বারবার বিদ্যুচ্চমকের জন্য ওরা অপেক্ষা করে রইল। আহা কখন এক পলকের জন্য একে অপরকে দেখতে পায়।

দুঃখের রাতও পোহায়। শেষে রাত্রি তার পথ ছেড়ে দিল প্রভাতকে। ঝড় থেমে গেল, গর্জন থামল, গর্জনশীল স্রোতস্বিনী হয়ে গেল আগের সেই ছোট্ট শান্ত নির্ঝর। আর তখনই কিন্নর-কিন্নরী যুগল এক হতে পারল। ছুটে গিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গনে বেঁধে অনেকক্ষণ মিলনের কান্নায় বুক ভাসাল। ভালোবাসার উৎসব পালন করল।

সেই কালরাত্রির স্মৃতি তাদের সারা জীবনে একবারও মুছল না। প্রতিদিন তারা একবার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সেই রাতের বিরহ-ব্যথার স্মৃতি মনে করে কাঁদে। সেই রাতটি জীবনের গান থেকে কোনো দিন মুছল না। তাদের নাচে ও গানে বিরহ-বিধুর স্মৃতি হিসাবে চিরন্তন হয়ে উঠল। সেই কিন্নর-কিন্নরী যুগলের ছবি আজও প্যাগোডা বা মন্দিরের প্রবেশপথে শিল্প হিসাবে অলঙ্কৃত থাকে অচ্ছেদ্য ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে। সাহিত্যে ও গানে নানাভাবে লেখা হতে থাকে। বর্মী প্রেমিক-প্রেমিকারা ওই কিন্নর-কিন্নরীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পাঠ গ্রহণ করে, স্বপ্ন বোনে, আশার জাল বুনতে বুনতে ঘর বাঁধে।

যখন কিন্নর-কিন্নরীদের রাজ্য ছিল, সুখ ছিল তাদের পর্বতরাজ্যে। হিমালয় অঞ্চল ও এই চেকটিউ অঞ্চলে ছিল দেবতা, যক্ষ, অসুর, কিন্নর-কিন্নরীদের আবাস। চেকটিউর আরণ্য-পরিবেশ আমাকে সেই প্রাচীন রাজ্যের সুখস্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। চেকটিউও হিমালয় পর্বতমালার অংশ। আর কে জানে কোন কিন্নরী

ও কিন্নর আজও এখানে মানবজন্ম নিয়ে ঘুরছে। আমি তো আর জাতিস্মর জ্ঞানের অধিকারী নই, তাহলে সেই কিন্নরদের দিব্যচক্ষে সব দেখতে পেতাম। হারানো কিন্নরীকে এই জন্মে খুঁজে নিতাম!

উপরের কাহিনীটি খিন মিয়ো চিট-এর ‘কালারফুল মিয়ানমার’ বইয়ে পড়েছি, মিয়ানমারে এসে। সেই থেকে তব্বী সুন্দরীদের দেখলেই তাদের কিন্নরী বলে ভাবতে ইচ্ছে হয়। এ রকম বিভ্রান্ত হতে ভালো লাগে। খিন মিয়ো চিট ১৯১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পনেরো বছর বয়সে ছোট গল্প লেখা শুরু। পরে এক সাপ্তাহিকে সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল তখন আরও জড়িয়ে পড়লেন জনতার সঙ্গে। বন্ধ হয়ে যাওয়া পড়াশুনো যুদ্ধের পরে আবার শুরু। ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি নিলেন। তারপর ইংরেজি ছোট গল্প ও দৈনিকে কলাম লেখা শুরু। ১৯৬৫ সালে মার্কিন বানটাম ক্লাসিক সিরিজের ‘ফিফটি গ্রেট ওরিয়েন্টাল স্টোরিজ’ বইয়ে তাঁর ছোট গল্প ‘থার্টিন ক্যারেট ডায়মন্ড’ গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘আনওরাথা অব বার্মা’ নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। রাজা আনওরাথা ১১শ শতাব্দীর রাজা, প্রথম মিয়ানমার রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা, রাজধানী ছিল পাগান। ‘এ ওয়াডারফুল অব বার্মিজ লিজেন্ড’ প্রকাশিত হয় ব্যাংকক থেকে এবং প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। কাবায়ে টেম্পল ধর্মশালার পাশের দোকান থেকে খিন মিয়োর কালারফুল মিয়ানমার বইটি কিনি। প্যাগোডায় ওঠার সিঁড়ির এই দোকানগুলোর নিচের রেস্টরায় খিন থিডা টুনের সঙ্গে অলৌকিকভাবে পরিচয় হয় বই কেনার পর দিন। দুই খিন আমার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয় মিয়ানমার সম্পর্কে। একজন মিয়ানমারের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, সাধারণ মানুষ, উৎসব ও উপকথার সঙ্গে তাঁর লেখনির মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেন। অন্যজন ক্ষণিকের পরিচয়ে অল্প কথা ও না-বলা কথা বা চোখের ভাষায় প্রায় ভালোবাসার প্রশ্ন দিয়ে আমাকে বহু যুগের ওপারে নিয়ে যায়। খিন মিয়োও কিন্নর-কিন্নরীদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুই খিন দুই মেরুর বাসিন্দা বলা যায় না। খিন মিয়োর পরে খিন থিডা চতুর্থ বংশ ধরা যায়। ওদের মধ্যে দুষ্টর ব্যবধান, কিন্তু অন্তঃসলিল আবেগ ও স্রোতধারা তো একই। এই হলো মিয়ানমার। আমাদের দেশে চার পুরুষের দূরত্ব যতখানি মিয়ানমারে ততখানি নয়। ওরা এখনও পর্যন্ত অনেকখানি প্রাচ্যদেশীয়, অনেক বেশি ঐতিহ্যানুগ, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে অনেক যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে। খিন মিয়ো চিটের লেখায় ঐতিহ্যপ্রীতি প্রবল, দেশবাসীকে ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন করার জন্যই তিনি কলম হাতে তুলে নিয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর এই কাজে আন্তরিকতা ও সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। পাঠকের ভালোবাসাও পেয়েছেন।

খিন থিডা টুনকে আমি প্রায় বুঝতেই পারি নি বলা যায়। আমি শুধু অনুমান

করে নিয়েছি। তার অপেক্ষা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মানুষ সারাজীবন এই অপেক্ষাই করে যায় সম্ভবত। শিল্পী সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ করে যায়, করে যায়, আর করে যায়। সেও তো অপেক্ষা, কত সুন্দর সে সৃষ্টি করতে পারল, পাঠক কীভাবে গ্রহণ করল এবং আরও ভালো সৃষ্টির আয়োজনও এক অর্থে অপেক্ষা। খিন খিডা বাঙালির নিরিখে সুন্দরী নয়, ওর দেশের মাপকাঠিতেও খুব সুন্দরী হয়তো নয়, কিন্তু লাবণ্যবতী, ওর অন্তরের সৌন্দর্য আমি দেখেছি। আমার ওপর সে বিরক্ত হয় নি, একটুও বিরক্তি প্রকাশ করে নি, হয়তোবা বিরক্ত হয়েছে তার আপনজনের ওপর, যার জন্য সে অপেক্ষা করে বসে ছিল। কিন্তু বিরক্তি সে আমার কাছে প্রকটভাবে প্রকাশ করে নি। আমি ওর মধ্যে একবারও আমার প্রতি রাগ বা অবহেলা দেখতে পাই নি। ওর এই গুণ আমি বর্মী রমণীদের স্বাভাবিক চরিত্র বা অর্জন বলে ধরে নিয়েছি। এই অসামান্য কুমারীরত্ন খিন খিডার কথা পরে বলব।

রাত্রির সৌন্দর্য

রাত দশটায় চেকটিউর চত্বর জনমানবশূন্য। এতক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। কখনো জোরে, কখনো আস্তে। আর মেঘের আনাগোনা? দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে মেঘ এসে বৃষ্টি ঢেলে দিতে দিতে উড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্য বের হতে পারছি না। আমাদের যাত্রীনিবাস পাহাড়ের পূর্ব ঢালে। উপরের তলা চেকটিউর চত্বরের সমতলে, নিচ তলা ভূগর্ভে বলা যায়। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। পূর্ব পাশটি পাহাড়ের ঢালে এবং খোলা। বারান্দা আছে, কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেদিকে যাওয়াই হয় নি। বিছানা তৈরি। ছোট্ট একটি বালিশ, নিচে শতরঞ্জি, গায়ে দেওয়ার জন্য হালকা কম্বল। আকিয়াবের মতো এখানে দশটায় আলো চলে যায় না। প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছে। সলিল, বিকিরণ, প্রকাশ বড়ুয়া নোট করে নিচ্ছে। প্রদীপ কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে। মাঝে মাঝে কথা শুনছি। দুই মৃদুল শুয়ে পড়েছে। প্রণবকুমার, বিমলেন্দু বড়ুয়া দোতলায় কোথাও জায়গা পেয়েছে। ভাস্কর সঙ্গ পলক। অন্য দুই ভাস্করও উপরে। মহিলারা টুকটাকি কী যেন করছে। ভেজা কাপড় শুকানো, গোছগাছ তাদের নিত্য কাজ। মীরা বড়ুয়া ও তার বৌদি গল্প করছে? দেবী বড়ুয়া ঘুমুচ্ছে নাকি শুধু শুয়ে?

গা এলিয়ে দিয়েছি। সারা দিন গেছে গাড়িতে। চেকটিউ আশ্চর্য ক্লাস্তিহারা। শরীরে এক ফোঁটা ক্লাস্তি নেই, কিন্তু বাইরে যে বৃষ্টি! বৃষ্টি না থামলেও শেষ পর্যন্ত বের হবো ভাবছি। এই রাতের পরিবেশে চেকটিউ মেঘ আর বিজলি বাতির আলোয় ঝলমল করছে অনুমান করতে অসুবিধা নেই। মেঘেরা উড়ে যাচ্ছে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। ধোঁয়ার মতো রূপোর বরণ রূপসী মেঘ। রাতের খাবার খেয়ে

আসার সময় চারদিকটা একবার দেখে এসেছি। জনমানবহীন এই দেবলোকে, অথবা আদিকালে যখন দেবতারা এখানে ছিল, আর তর্কের খাতিরে না থাকলেও তারা ছিল—এই কল্পনা করতে আমি একটুও দ্বিধা করছি না। বাস্তবের সত্যের চেয়ে কল্পনার সত্য কেন সত্য হবে না। সত্য যদি না হয় আমি কল্পনা করতে পারছি কেন? মানুষের কল্পনা-শক্তি তো বাস্তবেরই প্রকাশ। স্বপ্ন-শিল্প-কবিতা-গল্প-গান মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয় বাস্তবের কোনো না কোনো বিধৃত রূপ থেকেই। দেবতারা ছিল উন্নত সভ্যতার অধিকারী মানুষ, আর তারা এখন এত অতীত হয়ে গেছে যে এখন তা কল্পনা মনে হয়।

সিদ্ধার্থকে বললাম, চলো। দেবাশিসও আরামের শয্যা পেতে গুয়ে পড়েছিল শরীরটা টেনে নেবে বলে। সিঁড়ির মূল দরজাটা ধপাস ধপাস করছে। বাথরুমের দিক থেকে হাওয়া ঢুকে, নাকি সিঁড়ি দিয়ে ঢুকছে কে জানে। ইঁদুরেরা বেরিয়ে পড়েছে। এখানে-ওখানে বার্মার সব পাছশালা ও হোটেলের শুধু ইঁদুর। মৎসু, আকিয়াব থেকে এখন পর্যন্ত ওরা সামরিক দাপটে রাজত্ব করছে। না জানি পায়ের কড়ে আঙুলটা কামড়ে দেয় নাকি। অনিবার্যভাবে প্লেগের কথা মনে পড়ে যায়। কত মানুষের জীবন যে নিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে প্লেগের মহামারি। ভারতে, আফ্রিকায় ও ইউরোপে।

না, বেরিয়ে পড়াই ভালো। কখন আবার বাতি নিভে যায়! বাথরুমে গিয়ে দেখি বেসিনে এক গাদা কলমি শাক। তাজা রাখার জন্য দারোয়ান পরিবার ছড়িয়ে রেখেছে। কচি কলমি শাক এরা কাঁচা খায় পোড়া লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে। এই পাহাড়ে নিয়ে এসেছে কোথা থেকে কে জানে! প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল দাদা গণেশের নাদুস-নুদুস একটি বাহন। শিব যদি বাবা ভোলানাথ হয় গণেশ তো দাদাই হবে। লক্ষ্মী-সরস্বতী বোন। কিন্তু মা-লক্ষ্মী কেন বলে সবাই? না, এই তর্কে গিয়ে লাভ নেই, ওটা জ্ঞানী-গুণীদের জন্য তোলা থাক। আমি ভাই-বোন পাতব। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দায় পা দিতেই আলোর ঝলকানিতে চোখ-মন ভরে গেল। বৃষ্টির ধুলো উড়ছে, ইলশে গুঁড়োর চেয়েও ছোট বা কম, যেন সৌন্দর্য সৃষ্টির খেলা শুরু করেছে মেঘবালিকা ও ফ্লোরেসেন্টের সোনালি আলো, যেন প্রেমের সবচেয়ে আনন্দময় মিলন মুহূর্তগুলো ওরা উপভোগ করছে। বাঁধানো চত্বর বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছে। কোথাও কোথাও হালকা এক পরত পানি জমে আছে, তার ওপর দিয়ে তরলপ্রায় মেঘ ও হাওয়া উড়ে গিয়ে কাঁপন তুলছে; মায়াবি বৃষ্টি এসে চোখের পাপড়ি চুমোয় চুমোয় কাঁপিয়ে গেল। এক সঙ্গে সম্পূর্ণ চত্বর মেঘ ও ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ভাসছে, একটি মানুষও নেই, হাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুর বাড়তি শব্দ নেই। প্রায় আয়তাকার চত্বর। চেকটিউর চৈত্য প্রায় উত্তর-পশ্চিম কোণে। চত্বর থেকে কুড়ি-বাইশ ফুট নিচে একটি গোলাকার পাথরের চাঁইয়ের



কাবায়ে ধর্মশালার বাইরে মিয়ানমারগামী দল



পথের ধারের দোকানে মেয়েরা



প্যাগোডায়
পাখি বিক্রেতা।
দর্শনার্থীরা এই পাখি
ছেড়ে দিয়ে
পুণ্য অর্জন করে



শোয়েডাং
প্যাগোডা বিশ্বের
দশম আশ্চর্য।
প্যাগোডার চত্বর
ঝাড় দেওয়া
পণের কাজ



মান্দালয়ের প্যাগোডায় দুই শতাব্দীর প্রাচীন বকুল গাছ

ভোরে ভিক্ষু-শ্রামণদের ভিক্ষার জন্য যাত্রা, মিথিলা





খিন থিডা টুন



ইয়াঙ্গুনে দুই বাঙালি নারী পামেলা বড়ুয়া ও জা

বাসস্ট্যান্ডের মেয়ে হকার, মুখে সেনেকার, এরা দোকানেও কাজ করে



ওপর অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষা করে তিনি অলৌকিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এত হাওয়া, এত ভূকম্পনেও তিনি কী করে যে এত বছর টিকে আছেন বোঝা কঠিন। এতেই তার শ্রেষ্ঠত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে।

চৈত্যের সামনে পূর্ব দিকে ওপরের মূল চত্বরের প্রান্ত রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার পূর্বে চারদিকে খোলা পাকা ছাদের নিচে প্রার্থনা-স্থান। সেখানে বিকিরণ বড়ুয়া প্রার্থনায় মগ্ন। তার দক্ষিণ দিকে একটু দূরে-কাছে চারটি গাছের গোড়া সুন্দর বেদি করে বাঁধানো। তাতে একটি কাঁঠাল গাছ আছে, বাকি তিনটি গাছ আমি চিনতে পারি নি। কেউ যে বলে দেবে তেমন কেউ নেই। এই রাতের বেলায় সাঁই-সাঁই হাওয়ার দৌরাহা কী সুখ বা বেয়াড়া খেয়াল যে আমার পেল! 'তোমায় গান শোনাও তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ/ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া'—সুরে-বেসুরে গেয়ে উঠলাম। বিকিরণ প্রার্থনা শেষ করে চলে গেছে। দেবশিশু প্রার্থনায় বসে আছে মগ্ন হয়ে। অনুমান করেছি এর পর সিদ্ধার্থ যাবে। ওপাশে পূর্ব দিকে স্মারকস্তম্ভটি, স্তম্ভের শীর্ষে একটি পাখি। এরকম স্তম্ভ দেখলে অশোক স্তম্ভের কথা মনে পড়ে। লুম্বিনী কাননের স্মৃতি চলে আসে।

গানেও মন ভরল না। রেলিং-এর সামনে গিয়ে সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে ছবি তুলতে গেলাম। অনেক ইঁদুর। নির্ভয়ে ঘুরছে। কী আশ্চর্য! ইঁদুর দেখলেই শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। ওই শ্রীকান্ত, ওই প্রেগ! বিভীষিকা মনে হয়।

ওদের রেখে নিচে চৈত্যের কাছে নেমে গেলাম। ছোট ছোট পা ফেলে। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে টাইলস্ পাথরের মসৃণ শরীর। সামনে সুবর্ণ চেকটিউ চৈত্য, গোড়ায় দুই পাথরের মাঝে প্রায় সিকি ভাগ ফাঁকা, বাকি যে সিংহ ভাগ নিয়ে চৈত্যসহ পাথরটি মূল পাথরের ওপর বসে আছে তাও কাত হয়ে আছে বাইরের দিকে, অর্থাৎ সব দিক থেকেই অবাক করে পাথরসহ চৈত্যাটি (প্যাগোডা) দাঁড়িয়ে আছে। এজন্যই ভ্রমণকারী ও ধর্মপ্রাণ ভক্ত সকলকে সে বিস্মিত করে। চেকটিউ এজন্য বিশ্বের বিস্ময়, ভ্রমণবিলাসীদের আকর্ষণ। এমন বৃষ্টির রাতে সে আরও কমণীয় হয়ে উঠেছে। আরও পিচ্ছিল ও জীবন্ত।

দিনের আলোয় এত পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে চৈত্যাটিকে দেখার ইচ্ছা জাগে নি। হাতেও ছুঁয়ে দেখি নি। পুণ্য অর্জনের কথা বা ইচ্ছা জাগে নি। আমার পাপ-পুণ্যের ধারণাও সবার মতো নয়। শুধু চৈত্যা দেখে প্রার্থনা করে পুণ্য হয় এই বিশ্বাস আমার নেই। আমি দেখি আর আনন্দ পাই, মনের মধ্যে আবেশ জাগে, আবেগ আসে। বিস্ময় অনুভব করি। এর নাম যদি পুণ্য হয় আমি মানতে পারি। বুদ্ধের চুল এখানে রক্ষিত আছে চৈত্যের ইতিহাসে জানতে পারি। খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। জানি এভাবে এসব কথা লেখাও উচিত নয়। কিন্তু এখানে এসে আমার মনের পরিবর্তন, আনন্দ ও আবেশ জাগা, এই বিভ্রান্তিকর চিন্তার উদয় তো আর মিথ্যে নয়। এরই নাম কি অধর্ম? এর নাম কি অকল্যাণ চিন্তা! অবিশ্বাসীর তর্কবিতর্ক!

রেলিঙের সঙ্গে বাঁধা ঘণ্টাগুলো হাওয়ার দোলায় টুন-টুন ঝুন-ঝুন বাজছে। প্যাগোডার ছাতা ও পবিত্র পাখি বসার আশ্রয়টি ভালো করে দেখে নিলাম। ঘণ্টার শিঞ্জন শরীর-মনে শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে। হাওয়ার ফুৎকার আলোর ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অনায়াস সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। ইঁদুরেরা কী যে খুঁজছে, কেন যে শুধু শুধু ছোটোছুটি করছে বোঝা মুশকিল। খাদ্যদ্রব্যের অবশেষ এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকার কথা নয়।

আমার প্রার্থনা করার মতো কিছু নেই। আমার প্রার্থনা অনুমোদন করবে এমন কাউকে আমি তো মানি না। বুদ্ধ বলেছেন তিনি কারও প্রার্থনা অনুমোদন করেন না। চৈত্য থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। পুরো চত্বর শূন্য, শুধু একটি কুকুর কখনো বসে, কখনো ছুটে কি যেন করছে! সেও একা। সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলো। হাওয়ার তোড়ে সিগারেট মুখে দিয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সিদ্ধার্থ ও দেবাশিস প্রার্থনা শেষ করে উঠে এদিক-ওদিক নিজেদের মতো ঘুরে কাছে এলো। ওদের মন ভরাট। অথচ কী যে শূন্যতায় আমাকে পেয়ে বসেছে, একাকীত্ব কেন যে এমন করে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! কে যে আমার দুঃখজাগানিয়া আমি খুঁজেই পাচ্ছি না। একান্ত আপনজনদের কথা মনে এলো। অনেকক্ষণ ধরে তাদের কথা ভেবেছি। ওদের জন্যই কি মন খারাপ? ওরা সঙ্গে নেই বলে? ওরা থাকলে এই অনুভবই হয়তো জাগত না, জাগত অন্য কোনো অনুভূতি। তৃর্থ, জয়ী ও রুবীকে যদি এই যাত্রায় সঙ্গী করতে পারতাম!

বনের হরিণ

আর একজনের কথা মনে পড়ছে। চিয়াং মাইতে এখন তায়কো নেই। অনেক দিন ওকে চিঠি লিখি না। ওর মাদ্রাজী বন্ধুর জন্য সে প্যারী ছুটে গেছে গত বছর। ওর মাদ্রাজী বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে নিয়েও কথা হয়েছে, কিন্তু এখনো ওরা বিয়ে পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে নি। থাইল্যান্ডের সংসারণ নীলক্ষুমাহেং বা সং আর বিয়ে করবে না। ওর বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে কুড়ি বছর আগে। ওর বয়স এখন ৫৫ বছর কি হবে না? সং নববর্ষে বা জন্মদিনে কার্ড পাঠায়। ওর প্রত্যেকটি কার্ড বা কার্ডে লেখা চিঠিতে ছবি থাকে একাকীত্বের। একটি ফুল, একটি পাখি, একটি বাঘিনী বা একটি শ্বেতহস্তী। ইয়াঙ্গুনে আমাদের দেখাশোনা করতে আসা বর্মী উপ-পরিচালক মহিলাও বিয়ে করেন নি। ভারি মিষ্টি করে হেসে কথা বলেন। ওঁর বয়সও পঞ্চাশের ওপরে। মিয়ানমারে এখন অবিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে, তারা আর বিয়ে করবে না, বিয়ে করতে ভয় পায়, আর বয়সও পেরিয়ে গেছে। এটি একেবারেই সমকালীয় ধারা। তায়কো বিয়ে করার জন্য কত চেষ্টা করছে, ওর মা বলছে, ভাই

ও ভায়ের বউ বোঝাচ্ছে। কিন্তু মনের মতো কাউকে তো পেতে হবে! জাপানি ছাড়া অন্য দেশের হলেও সে বিয়ে করতে রাজি। ওর মতো এমন সুন্দর মনের মানুষটি সঙ্গী পাচ্ছে না। একেক মানুষের একেক সমস্যা। ওর অর্থ আছে, তোকিও শহরে একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে অথচ ও একা। ওর দুঃখের কথা ও আমাকে জানাতে চায় নি, আমি জেনে সান্ত্বনা দিয়ে ওর ভার লাঘব করার চেষ্টা করেছি। নাকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছি জানি না। সং ১৯৮২ সালে এক রোববারের ভোরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে তোকিও শহরের রাজকীয় পার্কে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তো উত্তর-দক্ষিণ কিছুই চিনি না, আমাকে ছেড়ে দিলে অন্ধের মতো পথ হাতড়াতে হবে বলাতে সে খুব হেসেছিল। আর নির্জন জুরাজীর্ণ ভাঙা রেলিং ও ইটকাঠের স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তার নিজের নৈঃসঙ্গের কথা বলে যাচ্ছিল। আধঘণ্টা কেটে গেল। তোকিও নগরীর ১৯৮২ সালের পরিশোধিত স্মৃতিভাণ্ডার খুললাম এই বার্মায়। সকালের ফুরফুরে হাওয়া বইছে। রেলিঙে আমার হাতের পাশে ওর হাত। লালচে-কালো ওর চেহারা। থাইদের মঙ্গোল চেহারার পাশে পোড়া-পোড়া গায়ের রঙ-ও আছে। সং কথা বলে যাচ্ছে, আমি ঢোক গিলে কোনোমতো ওকে সায় দিচ্ছি। সম্ভবত ওর মা-বাবা ও সংসারের কথা বলছিল। আর আমি তখন একাকীত্বে দগ্ধ হচ্ছি। আমার ইচ্ছাকে আমি কখনো কোনো মেয়ের কাছে যেমন-তেমন করে প্রকাশ করতে পারি না। পৃথিবীর সব নারীই আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। যাকে আমি পছন্দ করি না তার সঙ্গেও অসৌজন্য আচরণ করা আমার পক্ষে কঠিন। খুব ইচ্ছে করছিল সং-এর সঙ্গে মনের কথা বলি, ভালোবাসার কথা বলি, আমার মধ্যে তখনকার জন্ম নেওয়া বাসনার কথা বলি। বলার জন্য আমি তখন প্রায় ঘোরগ্রস্ত হয়ে উঠেছি। একটু টোকা দিলেই আমি ফেটে পড়ব, একটু ইশারা করলেই আমি ভেঙে পড়ব—সেই দশা আমার। কিন্তু আমি এ রকম ভয়াবহ ভাঙনের কিনারা থেকে বহুবার বেরিয়ে এসেছি, আসতে পেরেছি। হঠাৎ-জাগা আবেগের মধ্য থেকে নিজেকে কী কঠিন অবস্থায় না টেনে আনতে যাচ্ছি! ওর হাত রেলিঙের পারাপার অতিক্রম করে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে, প্রায় বিবশ আমার স্নায়ুতন্ত্র। একটি মানুষ নেই কোথাও, একটি প্রাণী বা পাখি, কুকুর বা ঘোড়া কেউ শাসনের চোখে দেখতে আসছে না। তখন কী আশ্চর্য, শুধু মনে পড়ল তায়কো কুরুকাওয়ার কথা, পরদিন সে আমাকে ‘নো নাটক’ দেখতে নিয়ে যাবে বলেছিল।

সেই রাতে সং আবার আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওর কক্ষে। ইয়ুথ হোটেলের তিন তলায় আমি, পাঁচ তলায় সং। ইন্টারকম টেলিফোন, টিভি, বাথটব সব আছে। ঘণ্টাখানেক কী যে কথা বলেছি, কী যে বকবক করেছি এখন কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে আলোচনার গুরুতে এক সময় সে উঠে উত্তরের বিশাল কাচের জানালা গড়গড় করে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল। সেদিকে অদূরে আরেকটি ভবন। তার জানালাও কাচের। পর্দা আছে। কোথাও লোহার গ্রিল নেই। আমি বুঝতে পারলাম

না সে হঠাৎ এভাবে জানালা হাট করে দিল কেন। সে কি আমাকে সন্দেহ করছে, আমি ওকে জোর করে চুমু খাব, ওর ক্ষতি করব? তার কৌমার্য রক্ষার ভয়? সকালে এতক্ষণ ওর সঙ্গে ঘুরলাম, সে নিজেই আমাকে ফোনে ডেকে নিল গল্প করার জন্য, আর এ রকম ব্যবহার কেন? আমি সিগারেট খাচ্ছিলাম বলে? এসব ভাবতে ভাবতে তখন হঠাৎ আমাকে নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসল, সংকে আর কিছু বললাম না। ও আমাকে অবিশ্বাস করে বসল, আমি যদি ওকে জোর করে চুমু খাই বা সে-রকম কিছু করে বসি! সেই আশঙ্কা থেকেই কি সে উত্তরের জানালা হাট করে খুলে দিল! পুরো দেয়ালটাই প্রায় জানালা। আমার সম্মানবোধও তখন জেগে উঠল। আমার তখন একাকী হওয়ার দরকার হয়ে পড়ল বুঝতে পারলাম। অমনি আমি উঠে দাঁড়লাম।

সং অবাক হয়ে গেল হঠাৎ উঠে পড়াতে। সেও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন ওকে কোনো দ্বিধায় না ফেলে বললাম, আমি যাচ্ছি।

হঠাৎ! তুমি কি আমার কোনো ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছো।

হয়েছিই তো! কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না। আমার মনে পড়ল তায়কোর কথা, ওর বায়বীয় অবয়ব হঠাৎ মনের কোণে আজও মেঘের ফাঁকে কোথা থেকে ভেসে উঠল। কিছু দিন ধরে ওর কথা খুব মনে পড়ছে। পরপর তিন বছর ওর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো হয় নি। ওর দেশে এখন চেরি ফুটেছে।

সং প্রায় আমার বয়সী। হয়তো দু'-চার বছরের ছোট হবে, হয়তো হবে না। আমি আর একটুও সময় না দিয়ে চলে এলাম। ঘরে আসতেই সে ফোন করল। ক্ষমা চেয়ে নিল না-করা বা অজান্তে করা দোষের জন্য। আমার মাঝে যে তখন কি হলো, কি এক নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসল! আমি ওর সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারলাম না। আমার ঘরে আসতে চাইল, আমি এড়িয়ে গেলাম। আজ আমাকে সে-রকম এক বিভ্রান্তিকর নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসল। কোথায় যেন কি হয়ে গেল, কি যেন নেই, প্যাগোডার নিচে খাদের অতলে কে যেন কাঁদছে, সেই কিন্নর-কিন্নরীর মতো ঝরনার দু' কূলে কারা যেন কাঁদছে, অরণ্যের নিঃসঙ্গতায় কে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে, নাকি মুইন থি অথবা নিসা ওয়ে। আমি কোথাও কাউকে খুঁজে পেলাম না। আমাকেও নয়। আমার কোথায় কি খোয়া গেছে, কে আমাকে খুঁজছে অথবা আমার মধ্যেই আমি কাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি। চেকটিউ কি জানে আমার মনের খবর? রাতের কুহক আমাকে প্রস্তুত করে দিয়ে যায় নি তো!

আর নয়। বসে বসে সিগারেট খেলাম। ভালো লাগল না। তারপরও আরেকটি খেলাম। সিদ্ধার্থ ও দেবশিশি পাশে। ওরা তৃপ্ত। প্রার্থনা শেষে ওরা খুশি। আবার রূপোলি বৃষ্টি উড়ে এলো। চলে গেল। আমরা চলে এলাম। কিন্তু বারান্দায় এসে দেখি এক পাটি স্যান্ডেল নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো নিশ্চয়ই কুকুরের কাণ্ড। চামড়ার স্যান্ডেল, পেছনে চামড়ার ফিতে আছে। চতুরের একেবারে এ প্রান্তে

চলে এসেছি, অদূরে ওই প্যাগোডার প্রান্তে একটা কুকুর। ওখানে গিয়ে দেখি সে দিব্যি খেলছে ডানপাটির জুতো নিয়ে। ওমা, দেখি পেছনের ফিতে খেয়ে ফেলেছে। বাকিটা অক্ষত। যাকগে, কাজ চলবে। এক পাটি জুতো কুকুরের কবল থেকে আহত অবস্থায় রক্ষা করে নিয়ে এলাম। ওতেই চলে যাবে। সিদ্ধার্থ বলল, বাঁ পাটির ফিতেটাও কেটে ফেলে দিন, একরকম হয়ে যাবে। আমি ভাবলাম, দেখা যাক।

পেছনে চেকটিউ। একা রাত জাগছে, হাওয়ার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘ, ফ্লোরোসেন্ট আলোয় দুলছে পাহাড়। মনের গভীরে কে যেন কোথায় বসে ডাকছে। আমি হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপরও সে ডাকছে, বিষণ্ণ ব্যথায় গুমরে গুমরে কাঁদছে।

হাওয়া এসে জানালায় ঝাপটা মেরে যায়, পায়ের কাছ দিয়ে ইঁদুর ছুটে যায়। নাক ডাকছে কার কার যেন! সেই ভোর রাত চারটার দিকে ইয়ানুন থেকে দিনের শুরু হয়েছিল, এখন রাত কত? এগারো নাকি বারো। আবার ভোর রাতে উঠতে হবে। এবার মিখথিলা বা প্রাচীন রাজধানী মিথিলা। সেখানে আগামী রাতটি কাটবে।

প্রকৃতিই চিরকুমারী

২৯ মে। খুব ভালো ঘুম হয় নি। ইঁদুরের উৎপাতে স্বপ্নে অনেক কিছু শুনতে পেয়েছি। না, ওরা আমাদের লক্ষ্য করে কিছু করে নি, ওদের-ওদের ব্যাপার ওটা। ভালোবাসার আর কি! ভোর চারটার দিকে প্রথমে মহিলারা উঠেছে নাকি! নাকি শচীনদা! ঘুমুবার আগে সিদ্ধার্থ বাথরুমের সামনের বাল্বে মোটা কাগজের ছায়া দিয়েছিল। সে জানে যারা আগে উঠবে বাতি জ্বেলে দেবে। আমাদের ঘুমটাও ওতে জবরদস্তি করে ভাঙাবে। বাথরুমের বাতিটা আমাদের চোখ বরাবর।

সবার তৈরি প্রায় শেষ হয়ে গেল। তারপর উঠলাম। সারা দিন তো পথে পথে কাটছে। সারা দিন ছুটে ছুটে দেখা, দুপুরে ও সন্ধ্যায় পথে পথে খাওয়া, তাড়াতাড়ি বিছানায় যাওয়া, আবার ভোর রাতে উঠে প্রকৃতি নেওয়া নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে। পায়ের তলায় রাই সর্ষে, স্বপ্নেও দেখেছি হাঁটাহাঁটি।

বিদায় তোমাকে চেকটিউ। তুমি অনেক দিয়েছ। তোমার বিত্তহীন বায়ু, অপকল্প নিসর্গ দৃশ্য, সহজ সরল মানুষের অমলিন ব্যবহার। আর কী চাই, জীবনে এর চেয়ে আর কী বেশি পাওয়ার আছে! পাহাড় বেয়ে ঘুরে ঘুরে নামছি। ওঠার সময় বৃষ্টি পাই নি। এবার ছাতা খুলতে হলো। গাড়িতে ছাউনি লাগায় নি। না লাগিয়ে ভালোই করেছে। দু' চোখ ভরে প্রকৃতির অকপণ সৌন্দর্য তাহলে

দেখা হতো না। হালকা ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, গাড়ির গতির সঙ্গে হাওয়া এসে বলদর্পী হয়ে যোগ দিয়েছে। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে চিৎকার করে বললাম, দেখো দেখো, এক টুকরো মেঘ উড়ে যাচ্ছে তো নয় যেন বনের ভেতর ও গাছের আগায় একখানা জামদানি শাড়ি। মহিলারা চোখ তুলে তাকাল। আমার সামনে বাকসো, গাঁটরি, বোঁচকায় ঠাসা। অরণ্যের গভীরে সবেগে ঢুকে পড়লাম। শুরু হয়েছে শীর্ণ হয়ে জন্ম নেওয়া পাহাড়ি নদীর। ও গাড়ি থেকে বিকিরণ বলল, গান, গান গাও।

গাড়ি নামছে, ছুটছে। গর্জন অনেক কম। শুধু নামছি, নামছি, নামছি। এ যেন অনন্ত নিম্নমুখী যাত্রা। শ্যামল অরণ্যানী, গগনচুম্বী বৃক্ষদেবতা, পর্বতশ্রেণীর শোভা, জনমানবহীন বিস্তার! কল্পসুন্দর স্বর্গরাজ্য! কিন্নর-কিন্নরী। মুইন থি।

এরও শেষ আছে। সামনে অপেক্ষা করছে সমতল ভূমি। আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ আগের সেই বাস, আবার উঠে বসলাম। সামনে সামরিক জিপ, আবার সেই 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও' গুঁয়া গুঁয়া চিৎকার। কেন যে মানুষ মানুষকে শাসায়, ভয় দেখায়, অনুগত রাখতে চায়—কাঁদায়!

নেয়াউং লেবিন (Nyaung Lebin) টাউনশিপ। শহরের ব্যবস্থাপকের বা নগরপিতার পক্ষে দুপুরের ভোজ দিয়েছে আমাদের। বেলা সোয়া এগারোটো। আমাদের সঙ্গে যেহেতু তিনজন ভিক্ষু আছেন সেজন্য দুপুরের খাওয়া বারোটোর আগে হওয়া চাই।

কুচি কুচি করে আম কেটে সালাদ। সঙ্গে হিন জো বা স্যুপ তো থাকবেই। মাছ আছে। সমুদ্রের মাছ পারতপক্ষে বর্মীরা অভিধিদের দেবে না। চিংড়ি গুঁটকির গুঁড়োর সঙ্গে মশলা, পিয়াজ ভাজা, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, সর্ষের তেল দিয়ে তৈরি খাদ্যের নাম বালাচেয়ং (Balacheong)। বাটিতে করে এনে দিল। বাঃ, আমার খুব পছন্দ। টক স্যুপের সঙ্গে নাপ্পি আছেই। নাপ্পি হলো চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের পেস্ট। এতে নুন থাকে। ব্রিটিশরা রুটির সঙ্গে বালাচেয়ং খেত সকালের বা দুপুরের খাওয়ার সময়। বালাচেয়ং মিয়ানমারের মহার্ঘ খাবার। পিকনিকে এটি স্যান্ডউইচের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। চট্টগ্রামে এর নাম বালিচং।

বেড়ার ঘর। টেবিল পেতে খাবার দিয়েছে। এই প্রথম চেয়ার-টেবিলে খাওয়া। আমার জন্য এই সুস্বাদু স্যুপ, আমের চাটনি ও বালাচেয়ংই যথেষ্ট। অন্যরা নানা রকম মন্তব্য করছে গুনতে পাচ্ছি। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে খাচ্ছি। পৃথিবীর সব মানুষ গালমন্দ ও ঠাট্টা-মশকরা দুর্বোধ্য ভাষায় বললেও বুঝতে পারে। আগে একদিন সকলকে এই সম্পর্কে বলেও দিয়েছি। ১৯৯৭ সালে জাপানের দ্বীপের শহর ফুকুওয়াকার 'ভাষা কম্যুনিকেশনে মারাত্মক বাধা নয়'—এই বিষয়ে সেমিনারে অংশ নিয়েছিলাম। সেখানেও আমরা সিদ্ধান্তে এসেছিলাম—ভাষা কখনো যোগাযোগের পক্ষে মারাত্মক বাধা নয়। যোগাযোগ বা মানুষে মানুষে সেতুবন্ধ

রচনার জন্য প্রথম দরকার হচ্ছে। এই হচ্ছে থেকে বন্ধুত্বের সেতু নির্মিত হয়। ভাষা আসে তারপর।

খাওয়ার পর আমি মাথা নিচু করে বাসে চলে এলাম। আমি দেখেছি ওদের কেউ কেউ খাওয়া নিয়ে আমাদের এই ইয়ার্কি ও ব্যঙ্গ বুঝতে পেরেছিল। তবে খাওয়া চমৎকার হয়েছে একথা তাদের জানিয়েই আমি এসেছি। দুপুর তিনটায় টাসু এসে পৌঁছলাম। বাগো ডিভিশনের শহর। ইয়াঙ্গুন ডিভিশনের উত্তরে এই রাজ্য বা প্রদেশ। বাগো প্রাচীন মন রাজাদের রাজধানী। ১৪ থেকে ১৬ শতাব্দীতে তাঁরা এখানে রাজত্ব করেন। এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন রাজা বানায়ং (King Bayinnaung)। টাসু প্রোম শহরের খুব কাছেই। প্রোমের আধুনিক নাম পাই (Pyay)। প্রোম শহর থেকে ৮ কিমি উত্তর-পশ্চিমে থাইয়েখিতায়া (Thayekhittaya বা Sriksetra)। প্রাচীন নাম শ্রীক্ষেত্র। ভারতীয় প্রভাব বোঝা যায়। প্রোম শহরের কাছেই শোয়েসানদউ (Shwesandaw) প্যাগোডা। বাগো শহরে দেখেছি শোয়েমদউ (Shweawdaw) প্যাগোডা। প্রতিদিন শুধু প্যাগোডা দেখেছি। ঘুম থেকে চোখ মুছতে মুছতে উঠে জলখাবার খেয়ে যেই বেরিয়েছি অমনি প্যাগোডা। অনেক প্যাগোডা শুধু দূর থেকে দেখেছি। যত না ভেতরে গিয়ে দেখেছি তার চেয়ে বেশি দেখেছি শুধু দূর থেকে। বর্মীরা প্যাগোডা দেখলেই হাত জোড় করবে। আমরা এসে শাসন হিতকরী হলে উঠলাম। মাত্র গত বছর এটি তৈরি হয়েছে। দোতলায় উঠলাম। জিনিসপত্র রেখে মুখ-হাত ধুয়ে আবার যাত্রা। আশপাশ দেখার জন্য।

শোয়েসানদউ প্যাগোডার আরেক নাম গোল্ডেন হেয়ার টেম্পল। আমাদের এই প্রাচীন প্যাগোডা দেখাতে নিয়ে এলো। এই প্রাচীন রাজধানীতে রাজা বানায়ং বাস করতেন। প্যাগোডার পাশে রাজবাড়ি ছিল। তাঁর রাজত্বের হিসাব অনুযায়ী প্রায় সাতশ' বছর আগে এই প্যাগোডা নির্মিত।

শোয়েসানদউ প্যাগোডার সামনে গিয়ে নামলাম বাস থেকে। জুতো গাড়িতে রেখে যাওয়াই ভালো। সিঁড়ির মুখে তোরণের দু' দিকে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই সৈনিক। একেবারে শিশু। সে কী! শিশুশ্রম? সেই ১৯৫২ সালে নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনে জিতে উ নু হন প্রধানমন্ত্রী। এশিয়ার মধ্যে বার্মাই প্রথম শিশু-শ্রম নিষিদ্ধ করে। সেই দেশে আজ শিশু সৈনিক? আমাদের দেশে পোশাক তৈরি শিল্পে শিশু-বালিকা ছাড়া অচল। সিঁড়ির মুখে ডান দিকের ছেলেটি নিতান্তই বালক। আর আমাদের গাইড গিয়ে ওকে জিগ্যেস করল বয়স কত। শিশু সৈনিক বলল, আঠারো। তাহলেও সে ট্রেনিং নিয়েছে অন্তত এক-দু' বছর ধরে। অত্যাধুনিক রাইফেল তার কাঁধে। বড্ড বেমানান। নিশ্চয়ই ওর মতো আরও সৈনিক আছে। এমনতেই পথে পথে, গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মিলিটারি। স্টিমারেও দেখেছি তরুণ সৈনিকদের। আর মন্দির ও প্যাগোডায় তো আছেই। ১৯৬২ সাল থেকে এই

চলছে। পাকিস্তানও সামরিক শাসনের যাতাকলে ধুঁকছে। আফ্রিকার অনেক দেশের সেনাবাহিনীতে শিশুদের নিয়োগ দিচ্ছে।

সেই মংডু থেকে আমরা সামরিক প্রহরায় গাড়িতে করে ছুটছি। প্রত্যেকটি টাউনশিপ এলাকায় নতুন দল এসে আমাদের স্কট করে। মিয়ানমার সরকার আমাদের জন্য অনেক করছে। ঐতিহাসিক ও প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রগুলোতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিরাপত্তায় তা না হলে কি বিঘ্ন ঘটতে পারে?

শোয়েসানদউ প্যাগোডার সংস্কার চলছে। বাঁশ ও দড়াদড়ি বেঁধে প্যাগোডার চূড়ায় উঠে গেছে শ্রমিকরা। হাওয়ায় চূড়ার ছোট ছোট ঘণ্টাগুলো তেমনি বাজছে ঠুন-ঠুন ঠুন-ঠুন। উপরে হাওয়া থাকেই, আর ঘণ্টাগুলোও অল্প হাওয়ায় সাড়া দেয়। বর্মীদের এই শিল্পবোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। নাকি বলব সঙ্গীত বা শব্দশিল্প! দূর থেকে ভেসে আসা এই ধ্বনি-মাধুর্য প্যাগোডা-দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করবে একথা কী করে বর্মীরা বুঝেছিল? এভাবে একটি জাতির রসবোধ সৃষ্টি হয়, সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

দু' দিন আগে টাঙ্গুতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। বর্মী ও মুসলমানদের মধ্যে। এসব কথা খবরের কাগজে ছাপা হয় নি। আমাদের দেশেও হয় না। সবাই বলে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নেই। আমি জানি আমাদের দেশে সংখ্যালঘুর ওপরে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার হয় একতরফা। আমাদের সংখ্যালঘুরা মার খায়, হামলার শিকার হয়, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় তাদের। মন্দির, প্যাগোডা ও গির্জায় হামলা হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। হিন্দু ও মুসলমান দু' পক্ষ মারামারি করে। দু' পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয়, প্রাণ যায়। বাংলাদেশে তার ঢেউ লাগে। বাবরি মসজিদের ধাক্কায় কত কালী ও বৌদ্ধ মন্দির হামলার শিকার হয়েছিল তার কতটুকু খবর কাগজে ছাপা হয়েছিল! বার্মায়ও সংখ্যালঘুরা মার খায়। তারা প্রতিরোধও করে। এসব জানার কোনো উপায় নেই।

বার্মার সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বা কোথাও এই দাঙ্গার খবর ছাপা হয় নি। বন্যায় মানুষ মরলে বা ভেসে গেলেও না। কেন? তা পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রপক্ষ জানে। বিশ্বের কোনো খবর, কোনো বিশ্বখ্যাত নেতার খবর বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপা হবে না। এই খবর ছাপা হবে তৃতীয় পাতায়। নেপালের রাজা-রানী ও রাজ-পরিবারের এতগুলো মানুষের প্রাণহানির খবর দেখেছি তৃতীয় পাতায়। ইয়াঙ্গুনের একটি মাত্র ইংরেজি পত্রিকায় এই খবর পড়েছি।

টাঙ্গুর শাসনা হিতকরী হল থেকে সামরিক প্রহরায় আমরা বের হলাম। তাদের হুইসেলের শব্দে রাস্তার দু'পাশের দোকান থেকে চা খেতে খেতে লোকজন আমাদের দিকে চোখ তুলে আছে। শক্তিদায়ক জিন ওয়ে জা খাচ্ছে ছোট বাটির মতো কাপে করে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গে ওই চা খেতে আর

ইচ্ছেমতো আড্ডা দিতে মন চাইছে। ওই নিচু টুল ও টেবিলে বসে জিন ওয়ে জা খাব কাপের পর কাপ। সামরিক প্রহরায় প্যাগোডা দেখার চেয়ে অনেক ভালো। ওই শক্তিদায়ক চা খেয়ে প্রচুর জীবনীশক্তি নিয়ে আমি ফিরব। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলব, ওদের বলব আমার কথা...

সেই ইয়াঙ্গুন থেকে চেষ্টা করছি ফ্যাক্স করব। ভোরের কাগজে লেখা পাঠাব। না, ফ্যাক্স করা চলবে না। আমাদের গাইড বলল, না। ই-মেইলও না। মন্ত্রণালয় অনুমতি দেবে না।

তাহলে আমি কি বন্দি? আমার হাত-পা বাঁধা! নজরবন্দি?

সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। মাথার ওপর ছাদ। ডান পাশে ঘরবাড়ি। প্রায় বস্তির মতো। মাঝে মাঝে দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখছে আমাদের। আমরা ২৬ জন। ওদের চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা। কারণ আমাদের চেহারা ও পোশাক। ওদের লুঙ্গি, আমাদের প্যান্ট। আমাদের মহিলারা পরেছে শাড়ি। আমরা যে বাঙালি ওরা জানে নিশ্চয়ই। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। সহজে ফুরোয় না। এ রকম সিঁড়ি দেখলেই আমার মনে পড়ে কাল্পনিক স্বর্গের কথা। এভাবে উঠতে উঠতে একদিন স্বর্গে উঠে যাব। এই সিঁড়ি বেয়েই তো স্বর্গে উঠতে হতো। যুধিষ্ঠিরও জীবিতকালে উঠেছিল।

সিঁড়ি পার হয়ে প্যাগোডা চত্বরে পা দিতেই মন হালকা হয়ে যায়। এতক্ষণের সব মালিন্য মুছে সাফ। ডান দিকে এগিয়ে গেলাম। একেকটি প্রকোষ্ঠ, আর বুদ্ধ। প্রত্যেক গোল প্যাগোডায় চারদিকে চারটি বুদ্ধ থাকবে। অথবা তিনদিকে ঘেরা এক দিক খোলা একটি করে কক্ষ। তাতে বুদ্ধ, বুদ্ধবেদি, প্রার্থনার জায়গা, কাচের দানবাস্ত্র, প্রদীপ ও ফুল উৎসর্গের জায়গা। আর চারদিকের সীমানা দেয়ালের সঙ্গেও আছে অনেকগুলো কক্ষ। আবার চত্বরেও ছোট ছোট বেদি থাকতে পারে। সেই বেদির ওপরও বুদ্ধ অথবা লৌকিক দেবতা, অথবা প্যাগোডা নির্মাতা রাজা, বোধিবৃক্ষ, অন্যান্য গাছ। এভাবে আঙিনা হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়, দর্শনীয় ও আকর্ষণীয়। চারদিক ঘুরে আসতে, প্রত্যেকটি জিনিস একটু ভালো করে দেখতে গেলে আধ ঘণ্টা তো লাগবেই। আর বুড়ি ছুঁয়ে আসার মতো হলেও দশ-পনেরো মিনিট লেগে যায়। সমবেত প্রার্থনা করতে বসলে মিনিট পনেরো যাবে। চিরাচরিত প্রার্থনায় আমার আকর্ষণ নেই। তবুও দলের সঙ্গে বসতে হয়। আমি ওই দশ-মিনিট চোখ বুজে মৌন থাকি। মৌনতাও শান্তি। শুধু মৌনতা, চোখ বুজে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকলেও শরীর ঝরঝরে হয়ে যায়। গাড়ির একটানা বসে থাকা বা চলার ক্লান্তি মুছে যায়। ওদিকে একটি ভাস্কর্য। একটি স্তম্ভের ওপর ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভিক্ষু, নিচে তিনজন মানুষের একটি দল, ওদের মধ্যে একজন স্তম্ভে উঠতে চেষ্টা করছে। নিচে দু'জন। ভিক্ষু লোকটাকে নিষেধ করছে উঠতে, তবুও লোকটি উঠছে স্তম্ভের গা বেয়ে। লুঙ্গির ফাঁক দিয়ে ওর অণ্ডকোষ বেরিয়ে গেছে। এটি কোনো বর্মী কাহিনী হবে, কাহিনীটি আমি না জানলেও দৃশ্যটি

সুন্দর। আশপাশে কেউ নেই যে জিগ্যেস করব। পরে গাইডের কাছ থেকেও আর জানা হলো না।

ইঠাৎ ছোট একটি দমকা হাওয়া এসে প্যাগোডার ঘণ্টাগুলো বাজিয়ে দিল। মধুর সেই ধ্বনিপ্রবাহ, মন ভরে গেল। মিয়ানমারের শিল্পীদের ধন্যবাদ প্যাগোডার ছাতার সঙ্গে ঘণ্টাগুলো বেঁধে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ দরজার দারুশিল্পীদের। দরজার উপরের আর্চ, তোরণের গায়ে ও কার্নিসের ঝালরগুলোতে অপূর্ব কারুকাজ। বর্মী ও চীনে সুতোর মিস্ত্রিদের নাম-ডাক আছে। এক সময় চট্টগ্রামে আসত ওরা। অনেক বৌদ্ধ বিহারের কাজ ওরা করেছে। রামু ও কক্সবাজারের সব বিহার বা প্যাগোডার কাঠের কাজ ওদের করা। এখনো সে কাজ প্রশংসাযোগ্য। এসব মন্দিরের মেঝে কাঠের। সেগুন কাঠের গোল খুঁটির ওপর দোতলা মন্দির। কোনো কোনো মন্দিরের দেয়ালও কাঠের। সেগুনের বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ওরা টিকে আছে। মাটিতেও সেগুন লোহার মতো। জলে ভিজলেও কাঠ বাড়ে-কমে না। সেগুনের গায়ের এক রকম তেল এর জন্য দায়ী। জল নিরোধকের কাজ করে এই তেল। এজন্য সেগুনের আসবাবপত্র ভিজলেও নষ্ট হয় না। আর মন্দিরের নিচের তলা থাকবে খালি। সেখানে মালপত্র থাকবে। বসার উন্মুক্ত জায়গাও হলো। কুকুর থাকে। বর্মায় যাত্রীশালাগুলো এ রকম। মন্দিরতো বটেই। আবার সাধারণের ঘরও এ রকম খুঁটির ওপরেই হবে। বর্তমানে সিমেন্টের মেঝে করে ইটের ঘর উঠছে। সঙ্গতিপন্ন মানুষেরা সিমেন্টের মেঝের ওপর সেগুন কাঠের মেঝে করবে। ফলে শীতকালে ঘর হয় আরামদায়ক। জাপানে এ রকম ঘর এখনও রয়েছে। কাঠের মেঝের ঘরে মাদুর বিছিয়ে বিছানা পেতে শোও, সকালে বিছানা গুটিয়ে দেয়াল আলমারিতে রেখে দাও। ব্যাস্, ঘরে খাট-পালঙ্কের হাস-ফাঁস নেই, চেয়ার-টেবিলের দৌরাতি নেই। সর্বত্র কাঠ আর কাঠের কাজ অথচ চেয়ারে-টেবিলের বাহুল্য নেই।

প্যাগোডা থেকে নেমে এলাম।

শাসনা হিতকরী হলের অতিথিদের কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভাস্করের কক্ষ বুদ্ধবেদির পাশে, আমাদের কক্ষ উল্টো দিকে হলের প্রবেশ মুখের ডান দিকে। বাঁ দিকের কক্ষে মেয়েরা। এই প্রথম হল বা কনফারেন্স রুমে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষ দেখলাম। হলঘরে যথারীতি ফ্যান নেই। ওখানে ঢালাও বিছানায় অন্যরা শুয়েছে। আমাদের ঘরে পাঁচজন, আমাদের খাওয়া হয়ে গেল সন্ধ্যায়। খাইয়েছেন ছয় মহিলা। প্রত্যেকেই তরুণী ও বিবাহিতা। দু'-একটি বর্মী শব্দ ও বাক্য বলাতে ওরা হেসে কুটি কুটি। এত হাসি যে কোথা থেকে ওরা পায়।

পায়ের তলায় সর্ষে

৩০ মে। সকালে খেয়েই যাত্রা। সেই ভোররাতে উঠে তৈরি হওয়া। পরোটা, আলু-মুরগির ঝোল, আলাদা করে পিঁয়াজ ও পুদিনা। আর জিলিপি। বাস্ খেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে বাসে উঠে গেলাম। বাস ছুটল ছুটল। জায়গা পেয়েছি সেই পিছে। ঝাঁকুনিতে শরীরের অবস্থা অনুভূতিহীন-প্রায়।

পথে পড়ল অং থিসার রেস্টুরা। কফি খেলাম। সকালের জলখাবারে চা বা কফি ছিল না। কফি খেয়ে বাসে ওঠার সময় দেখি দেবাশিসের হাতে এক গাদা কফি মিক্সের প্যাকেট। কী ব্যাপার! এখানে কফি মিক্স খুব সস্তা? এক কাপের একেকটি প্যাকেট দু'-আড়াই টাকা। ব্যাস্, আরও কয়েকজন নেমে নিয়ে এলো। বড় এক প্যাকেটে ৪৮টি করে থাকে। দোকানের তাকে সাজানো আছে মদের বোতল। সিন্ধাপুরী ব্ল্যাক লেভেলের বোতল ৩৫০ টাকা, মিয়ানমারের গ্রান্ড হুইস্কি ১৬৫ টাকা।

সব ফেলে আবার যাত্রা। একটানা গাড়ি চলল। সাড়ে দশটায় পৌঁছলাম পিয়ানমানাতে (Pyinmana)। ভাস্তেদের ছোয়াইং খাওয়ালেন এখানে। চায়ের দোকানে বসে আছে যুবকেরা। লম্বা চুলের এক যুবক বসে আছে। গার্ডারে বাঁধা চুল। একজনের খোঁপা করা। কলমি শাক বিক্রি করছে এক মেয়ে রাস্তার ধারে বসে। কচি কলমি শাক কাঁচাও যে উপাদেয় সেটা শিখলাম। ওই যেমন আমরা বাঁধাকপি ও লেটুস পাতা খাই। সঙ্গে থাকে পিঁয়াজ ও সর্ষের তেলে মাখা পোড়া লঙ্কা গুঁড়ো।

টটকন (Tatkon) থানা শহর ফেলে ছুটল বাস। পথে পথে এক পায়ে দণ্ডবৎ তাল গাছের সারি। তাল থেকে গুড় করে। খাওয়ার পর এরা তালের গুড় পছন্দ করে। দেড়টায় ইয়ামেথিন (Yamethin) পৌঁছলাম। শুরু হলো বার্মার রুখু মধ্যাঞ্চল। তেঁতুল ও বাবলা অজস্র। আর মাঝে মাঝে তাল। ছাগল ও দু'-দশটা গরু মাঝে মাঝে। পাখিও কম।

সোয়া দুইটায় পেয়াওপিউ (Peyawpew)। টিলা ও উঁচু ভূমি। মিঝিরি বা জিঞ্জিরা গাছে ভরা। জিঞ্জিরার হলুদ ফুল। একটু তেতো। বছরের প্রথমে বর্মীরা তেতো খায়, গরমে শরীর ভালো রাখে তেতো। বাংলা নববর্ষ ওদেরও নববর্ষ। নিম, উচ্ছে, গিমে এজন্যই চোত-বোশেখে বেশি খায়। চট্টগ্রামের বড়ুয়ারা মিঝিরির কলি দিয়ে ঘন্ট খাবেই। চাকমা-মারমাও। নববর্ষের প্রথম দিনে বড়ুয়াদের মধ্যে তেতো ভিক্ষে করে খাওয়ার নিয়ম আছে। এতে যে-লোক ভিক্ষা করে খায় তার মঙ্গল হয়। বর্ষ শুরুতে হাতাদাগ পালন করে, হাতাদাগ হলো বছরের বিপত্তি থেকে উত্তরণের জন্য পালনীয় প্রথা। বড়ুয়ারা এজন্য তেতো মেগে খায়।

আর তেঁতুল। মিয়ানমারবাসীর কাছে তেঁতুল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলময়

এক গাছ ও ফল। শুধু কি ফল? তেঁতুলের কচি পাতায় সালাদ ও স্যুপ হয়। কচি ফল রসুন, পিঁয়াজ ও লঙ্কা দিয়ে রান্না করে। ওই দিয়ে আচার হয়। পাকা তেঁতুলের হয় পানীয়। এই পানীয় টিনজাত করে বিক্রি হয়। আবার তেঁতুলের স্বাদ ও গন্ধ-মাখা কোমল পানীয়ও হয়। তেঁতুল বিচি দিয়ে নানা রকম খেলা করে ছোট ও বড়রা।

বোশেখের প্রথম বৃষ্টিতে তেঁতুল গাছে আসে কচি পাতা। ওই পাতার স্যুপ নান্নি দিয়ে রন্ধে আমাদের দিয়েছে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে এই স্যুপ। ওতে কখনো কখনো অন্যান্য সবজিও মিশিয়ে দেয়। আবার কচি পাতা, ভাজা চিংড়ি গুঁটকির গুঁড়ো ও সর্ষের তেল দিয়ে হয় চমৎকার ভর্তা। কখনো কখনো গরম পানিতে কচি পাতা ভিজিয়ে একটু নরম করে জল থেকে তুলে নিয়ে সর্ষে বাটা ও কড়কড়ে করে পিঁয়াজ কুচি ভেজে সালাদ করবে। ভারি চমৎকার হয়।

ছোটরা কচি পাতা চিবিয়ে খায়। আবার তারা কচি পাতা তুলে কলাপাতায় মুড়ে অল্প মাটির নিচে পুঁতে রাখবে। তারপর ধরিত্রী দেবীর কাছে প্রার্থনা করবে, হে দেবী, তুমি আমাদের তেঁতুল পাতার উপর একটু তেল দিয়ে দিও। এই প্রার্থনা করতে করতে ছেলেমেয়েরা ওই মাটির ওপর লাফিয়ে পড়বে বারবার। তাতে মাটির নিচের পাতাগুলো চাপ খেয়ে একটু নরম হবে, পাতার রসে পাতা ভিজে যাবে। তারপর মাটির নিচ থেকে তুলে কলাপাতা খুলে গাল ভরে খেয়ে আনন্দ করবে ওরা। না, আমি কখনো খাওয়ার সুযোগ পাই নি। ছেলেবেলায় আমি কর্ণফুলীর কূলে আমাদের ক্ষেতে গিয়ে কচি বরবটি, কচি টেঁড়স, মুলো, কচি বেগুন, পাতাসহ কচি পিঁয়াজ তো খেয়েছি। তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, মটরগুঁটি, শশা, মিষ্টি কুমড়োর ফুলের মধুও ছিল। সেই তো ছেলেবেলা। নদীর হাওয়া ও তাতে সাঁতার কাটা, জ্যোৎস্না রাতে তরমুজ ও ফুটি খেতে হামলাকারী শেয়াল তাড়ানো—মধুর সেই ছেলেবেলার স্মৃতি।

মেয়েদের যৌবন উন্মেষের সময় তেঁতুলের খুব কদর। কচি তেঁতুল পাকার আগে খোসা তোলা যায় সময়ে এক রকম স্বাদ। তখন তার বিচিগুলো থাকে নরম, শাঁস হয় সাদা। ওই তেঁতুলকে উত্তর মিয়ানমারে বলে কেৎসু (Kyetsuu)। এই অবস্থায় তেঁতুল থাকে দু'-এক সপ্তাহ। একে নুনে জারানো মাছ, লঙ্কা, পিঁয়াজ ও রসুন দিয়ে রন্ধে খায় বর্মীরা। এর সুনামও শুধু শুনেছি, চেখে দেখার সুযোগ হয় নি।

তেঁতুল পেকে গেলে খোসা হয় শক্ত ও তামাটে রঙের। বীজ হয় শক্ত ও গাঢ় তামাটে। তখন এই তেঁতুল থেকে খোসা খুলে, বীজ আলাদা করে সারা বছরের জন্য রেখে দেওয়া হয়। প্রতিদিন এক দানা তেঁতুল এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রেখে ওই জল খেলে নানা রকম অসুখ থেকে মুক্তি মেলে। ব্লাড প্রেসার ঠিক থাকে, রক্তে কোলস্টেরলের মাত্রা বাড়তে দেয় না, হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। আমি একবার

শুরু করেছিলাম। কিন্তু ওই যে এ্যাসিডিটির জন্য বাদ দিতে হলো কিছু দিন, তারপর ভুলেই গেছি। আমার আর হুথপিও সবল করা হয়ে উঠল না। মিয়ানমারে এসে তেঁতুলের জৌলুস চোখে পড়ল। কত বড় বড় গাছ, কত তার ডালপালা, ঝুলে আছে তেঁতুল, হাওয়ায় দুলছে, গাছতলায় ছেলেমেয়ের দল, যেন গল্প ও কবিতা। রাস্তার ধারে বিশাল বৃষ্টি শিরীষ গাছের বড় বড় ডাল ছেঁটে দিয়েছে ঝড়ে ভেঙে যায় বলে, কিন্তু তেঁতুল গাছ ডালপালা নিয়ে তার রাজসিক সৌন্দর্য বিস্তার করছে।

মিয়ানমারের ছেলেমেয়েদের স্কুলের পোশাকে দেখা যায় সবুজের আধিক্য। সাদা শার্টের সঙ্গে সবুজ লুঙ্গি পরেছে ছেলেরা। সাদা ব্লাউজ বা জামার সঙ্গে সবুজ লুঙ্গি মেয়েদের। আর কাঁধ থেকে হাঁটুর নিচে ঝুলে পড়েছে থলে। মিয়ানমারের গল্প, কবিতা এবং প্রেমিকদের কাছে একটি এক-অক্ষরবিশিষ্ট প্রিয় শব্দ হলো 'পান্না'। প্রেমিকার পান্না-উজ্জ্বল বেণি ধরার জন্য প্রেমিক গায়কের কতই না আকৃতি। আর সেই বেণিতে দিতে চায় সোনালি পদাউক ফুল। পদাউক বার্মার নিজস্ব গাছ, সেই নামটিও বাংলায় আমরা সরাসরি নিয়েছি। ঢাকার হেয়ার রোডের দু' পাশে দু' সারি পদাউক গাছে মাত্র এক দিনের জন্য ফোটা সোনা-রঙ ফুল দেখে আমার ইচ্ছে জাগত মিয়ানমার যাব। তাহলে কি ইচ্ছে এভাবে সফল হয়। মিয়ানমার মূল্যবান পাথরের দেশ। তার আছে রুবি ও পান্না, জেড পাথর এবং আরও কত সব মূল্যবান পাথর। তার মাঝে পান্না-সবুজ রঙ ও পাথর দখল করে আছে লোকসাহিত্য, গল্প ও গান।

যখন সে কিশোরী থাকে তখন পরে সবুজ স্কার্ট, বড় হয়ে সে হয়ে যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এই ধাঁধার উত্তর কি? তালগাছ। মিয়ানমারের ভূদৃশ্যে তালগাছের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। প্রথম সে যখন মাটি ফুঁড়ে উঠে তখন চাই-মী (Kyay-Myee) বা টিয়ে পাখির লেজ, আস্তে আস্তে লেজ নাড়ে যেন কোনো মেয়ে তার প্রিয়তমের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে হাত নেড়ে। তখন তার নাম লেট হ্‌মায়াদ (Let hmymaw) বা আন্দোলিত হাত। তারপর আরও বড় হয় তালগাছ। আস্তে আস্তে তার পাতার শীর্ষ অনেকখানি আলাদা হয়ে যায়। মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যখন ওঠে তখন তার স্কার্ট যায় খসে। এক পায়ে সে তখন দাঁড়িয়ে থাকে উলঙ্গ হয়ে।

মধ্য মিয়ানমারে আমরা এসে পড়েছি। গাছপালা এখানে কম। তার মাঝে তালগাছের সারি যেন মরুদ্যান। আর বাবলা ও মাঝে মাঝে তেঁতুল গাছ। তালপাতার পাখা মিয়ানমারবাসীর দীর্ঘ গরমের দিনের আবশ্যকীয় সঙ্গী। বাংলাদেশের মতো এখানে গরমকাল দীর্ঘ। মিয়ানমারের বছরের প্রথম মাসের নাম টাণ্ড। আমাদের বৈশাখ মাস তখন। টাণ্ড, কাসন, নায়ন, ওয়াসো, ওয়াগাউং, টাওতালিন, থাডিংউট ও টাজাউং পর্যন্ত গরম চলে। টাজাউং অর্থাৎ অম্রাণ পর্যন্ত তো অবশ্যই। বাকি মাসগুলো হলো নাদাউ, পায়থো, তাবোদোয়ে ও তাবাউং। সারা বছরে অন্তত ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি পড়লে ঠাণ্ডা, বৃষ্টি থেমে গেল তো

অমনি গরম। আমাদের বর্ষাকালে যেমন হয়। আর বিকেল হলেই মা-বাবারা তালপাতার পাখা নিয়ে বারান্দায়, উঠোনে বসে পড়বে। অথবা একেবারে ঘাটায় একটা টুল বা চেয়ার নিয়ে বসবে মা, মায়ের কোলে শিশু, হাতে তালপাতার পাখা। ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যান নেই। আমরা যত যাত্রীনিবাসে ছিলাম কোথাও সিলিং ফ্যান পাই নি। ওরা বলে ফ্যানের হাওয়া স্বাস্থ্য খারাপ করে। আমাদের চেষ্টামেচিতে কর্তৃপক্ষ দু'-একটা প্যাডস্টেল ফ্যান দিয়ে পার পেয়েছে। আর ওরা দিব্যি তালপাতার পাখা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

তালের রস বর্মীদের প্রিয় পানীয়। না, তাড়ি বানিয়ে নয়, গাছ থেকে পেড়ে এনে বাঁশের কাপে করে এই মিষ্টি পানীয়ের স্বাদ ও সুগন্ধ গ্রহণ ওদের খুব প্রিয়। গরমে এর রস প্রশান্তি আনে। পথের ধারে অথবা বাজারে পেলেই আপনি চেখে দেখতে পারেন। না, ওরা তাতে পানি মিশিয়ে বা ভেজাল দিয়ে কলুষিত করবে না। বাঙালির ভেজাল দেওয়ার বুদ্ধি ওরা নেয় নি।

তালপাতার পুঁথিতে আছে সমস্ত ত্রিপিটক। বার্মার প্রাচীন মন্দিরে আপনি দেখতে পাবেন তালপাতার পুঁথি। কল্পবাজারের মহা খিণ্ডী ক্যাং দেখেছেন? তার অনেকগুলো আলমারি তালপাতার পুঁথিতে ঠাসা। সবই বর্মী ভাষায় লেখা। আমি তার এক বর্ণও পড়তে পারি না। প্রত্যেক তালপাতার শেষ প্রান্তে একটি ছিদ্র থাকে। সিক্কের রঙিন সুতো দিয়ে সেগুলো বেঁধে রাখা হয়। তারপর ভাঁজ করে রাখা পাতাগুলো দুই ফালি কাঠের তক্তায় চেপে বেঁধে রাখে। এভাবে একেকটি করে বই সিক্কের কাপড়ে জড়িয়ে লাক্ষার বাস্ত্রে সংরক্ষণ করা হয়। মন্দিরের লাইব্রেরিতে এগুলো জমা আছে। আমার মনে হয় আকিয়াব বা রামুর এসব পুঁথির কোথাও কোথাও চট্টগ্রামের অজানা ইতিহাস থাকবে। বড়ুয়া জাতির কথা লিপিবদ্ধ থাকতে পারে। কারণ চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারের সম্পর্ক হাজার হাজার বছর ধরে। বার্মায় বৌদ্ধধর্ম গিয়েছিল চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে। তারপর শ্রীলঙ্কার সঙ্গে হয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ধর্ম ও সংস্কৃতিই হলো বন্ধনের সূত্রপাত। বার্মায় প্রাচীন ভারতের প্রভাব এখনো খুব সহজে নজরে আসে।

আরও খাবারের কথা পরে বলব। মিথিলা, মান্দালয়, পাগান ঘুরে এসে বলা যাবে। সেখানে খেতে হবে, নতুন কিছু খাবার-দাবার মিলবেই।

সাড়ে তিনটায় মিথিলা (Meiktila) পৌঁছলাম। হ্রদের মাঝখান দিয়ে নিচু সেতু চলে গেছে। ভারি সুন্দর ও বড় হ্রদ, হ্রদের চারদিকে শহর। মাঝে মাঝে উঁচু-নিচু টিলা। তিনটি মসজিদ দেখলাম। হ্রদ পেরিয়েই বিশাল বিহার অঙ্গন। অনেক শ্রামণ-ভিক্ষু থাকেন। ছোট ছোট শ্রামণ কত যে আছে! সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে যাত্রীনিবাস। বেড়ার দোতলা ঘর। নিচে হলঘর ও বাথরুম। দু'-তিন জন ভিক্ষু থাকেন। উপরেও বড় হলঘর, পাশের কামরায় বৃদ্ধ এক ভিক্ষু থাকেন, তাঁর কক্ষ বেড়া দিয়ে আলাদা করা। তাঁর জন্য একটি শৌচাগার আছে। কাঠের

মেঝে। এক পাশে বুদ্ধবেদি আছে রীতি অনুযায়ী। যথারীতি ফ্যান নেই। ঢালাও বিছানা করে থাকতে হবে। তবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বিছানা ও বালিশ। পাশাপাশি বিছানা। ভিক্ষু গুন্ধানন্দ মহাথেরো ও অন্য দুই ভিক্ষুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা, বিশাল বিহার এলাকার এক প্রান্তে, অনেক দূরে।

জিনিসপত্র রেখে গাড়িতে চড়ে বসলাম। পৌঁছলাম ওয়ান তো পে প্যাগোডায়। পুরনো ভবন। জীর্ণশীর্ণ। নিচু দালান, অনেক অনেক কুঠরি। সঁাতা পরা দেয়াল, মেঝের সিমেন্ট উঠে গেছে। অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে বা গোলক ধাঁধা ফেলে উত্থরিয় ভিক্ষুর আবাসস্থলে পৌঁছলাম। আধ ঘণ্টার মতো কাটল সময়। প্রাচীন জগতে টাইম মেশিন নিয়ে ঢুকে পড়ার মতো প্রাচীন স্থবির গুহাপ্রায় পরিবেশ।

বেরিয়ে গেলাম বিভিন্ন অর্হত ভিক্ষু বা ভিক্ষুদের অস্থিধাতু সজ্জিত গোল এবং স্তূপের মতো দোতলা একটি ঘরে। অসংখ্য বোতলে দেহভস্ম রক্ষিত আছে। এই জাদুঘরের প্রধান হলেন উ ওয়েন গী তা। তিনি প্যাগোডার দ্বিতীয় প্রধান ভিক্ষু, বয়স ৫০ বছর। ৩৫ বছর ধরে তিনি এখানে রয়েছেন। তাঁর ভাগারে বুদ্ধের কেশধাতু ও সারিপুত্রের অস্থিধাতু আছে। তিব্বত থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন বুদ্ধের রক্তধাতু ও অস্থিধাতু। থাইল্যান্ড থেকে সংগ্রহ করেছেন মাংসধাতু। তাইওয়ান এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আরও অনেক মহাপুরুষের অস্থিধাতু সংগ্রহ করেছেন। তিনি বললেন আমাদের প্রত্যেককে তিনি বুদ্ধের অস্থিধাতু নাকি দেহভস্ম দেবেন। ভাস্তে গুন্ধানন্দ মহাথেরোকে কাচের চ্যাপটা আধারে স্থায়ীভাবে বন্দি-করা বুদ্ধের অস্থিধাতু দিলেন। আর প্রত্যেককে দিলেন পলি-কাগজে মোড়া ছোট্ট প্যাকেটে। না, আমি নেই নি। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। বুদ্ধের অস্থিধাতু বা দেহভস্ম এত সহজলভ্য হতেই পারে না। আমাদের দলের ২৫ জনই নিলেন, শুধু আমি ছাড়া।

প্যাগোডার অঙ্গনের গাছে আম ধরে আছে। শালিকের বাচ্চা ফুটেছে। একটি গাছে অনেক করমচা ধরেছে। টুকটুকে লাল, তবে ভীষণ টক। নিমের কচি পাতাসমেত ডাল দুলছে হাওয়ায়। সবাই বাসে উঠে বসে যাচ্ছে। দুটি মেয়ে ভারে একটি বালতিতে জল নিয়ে যাচ্ছে কুয়ো থেকে। এখানে সবাই কাজ করে, সব মেয়ে। তরুণী, যুবতী সবাই কঠোর দৈহিক শ্রমের কাজ করে। পিঠে চুল খুলে রেখে, হাওয়ায় ও শরীরের দোলায় দুলিয়ে।

বিহারে ফিরে এলাম। আজ আর কোথাও যাওয়া হবে না। মিথিলায়ও সম্ভবত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নেই।

সন্ধ্যা হতেই রাতের খাওয়া। বিহারের বিশাল অঙ্গনে। মেঘে-ঢাকা চাঁদ। কুকুরেরা অস্থির ডাকাডাকি করছে, ছোট্টাছুটি করছে। ঝিঁঝি ডাকছে। খাওয়ার ডাক পড়েছে। এদিকে মন্দির, ওদিকে অদূরে শ্রামণদের আবাসন, অন্যদিকে অদূরে তাদের খাওয়ার ঘর, বাঁয়ে সারবন্দি শৌচাগার। ডানে আর একটি বেড়ার ঘর,

তাতে শ্রামণরা থাকেন। গাছের ফাঁকে বাতি জ্বলছে, পোকা উড়ছে, কিন্তু একটি পঁচাও ডাকছে না। আমি সচেতনভাবে লক্ষ করছি পাখির সংখ্যা কম। ৬০ ভাগ বনাঞ্চল হলে দেশে পাখির সংখ্যা কম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কেন?

মাঝে মাঝে হালকা কাদা। কাঁচা পথ। বিহারের ভেতরের নিজস্ব পায়ে চলা পথ। আরেকটু সামনে যেতেই ডান দিকে দোতলা বেড়ার ঘর। নিচে ফাঁকা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মচমচ করে উপরে উঠে গেলাম। সেগুন কাঠের সিঁড়ি ও দোতলার মেঝে। জানালা, বারান্দার রেলিং, বুদ্ধবেদি, কাঠের খুঁটি, বিম, চৌকাঠ সবই কাঠের। কারুকাজ করা। জানালায় লোহার শিক বা গ্রিল নেই। আমাদের তো চোরের জন্য জানালায় শক্ত গ্রিল দিতে হয়, দরজার বাইরে থাকে কলাপসিবল। নেপালেও এসবের বালাই নেই। নিচতলায়ও জানালার কপাট শুধু। তবে নতুন তৈরি ইট-সিমেন্টের বাড়ির নিচতলার জানালায় গ্রিল লাগানো হচ্ছে। বার্মায়ও নতুন যুগের ঘরবাড়ি আগের মতো খুঁটির ওপরে হচ্ছে না। মংডুতে বেড়ার দোতলা বাড়ি বা নিচে ফাঁকা রেখে ঘর তৈরি হচ্ছে এখনো। কিন্তু বেড়ার ঘরের জানালায় লোহার রড দিয়ে নিরাপত্তা ব্যাহ গড়ছে।

ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের প্রাক্তন এক রাখাইন ছেলে ঘর করেছে মংডুতে। তার এক ছেলে এক মেয়ে। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের অনাথ ছেলে নিয়ে ধর্মরাজিকে গড়ে উঠেছিল অনাথালয়। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা নামগোত্রহীন ছেলেও আশ্রয় পেয়েছিল। সেই প্রথম ব্যাচের এক রাখাইন ছেলে আ থু মং। সে মংডুতে ঘর করেছে। সঙ্কের প্রথম আঁধার নামছে। সেই মংডু। অন্ধকার। বিদ্যুৎ নেই। মহাথেরাকে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে, আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। সারা বিশ্বে সংখ্যালঘুরা বিপন্ন, তাই তারা নিরাপত্তা পেতে মাতৃভূমি ছেড়ে নিজে যেখানে সংখ্যাগুরু হতে পারবে মনে করেছে সেখানে আবাসন গড়তে গেছে বা গড়ার স্বপ্ন দেখে। আ থু মং এখন নিরাপত্তা পেয়েছে মনে করে। কিন্তু জানালায় লোহার রড দিতে হচ্ছে। মুসলমানরা মংডুতে প্রবল হয়ে উঠছে। মসজিদে আজান দেয় সজোরে। অন্য ধর্মাবলম্বী মেয়েদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করে। নয়তো বিয়েই করবে না। কোনো মুসলিম মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে কোনো রাখাইনকে বিয়ে করবে না। এসব শোনা পাঁচ কথা। আরাকান প্রদেশ এই রোগে এখন জর্জরিত অনুমান করা যায়। আমার মনে হয়েছে আ থু মং আরাকানে সংখ্যালঘু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

দোতলার এই ধর্মশালায়ও যথারীতি একটি বুদ্ধ ও বেদি রয়েছে। সোনার বরণ বুদ্ধ। বেদির বাইরের হলের মতো ফাঁকা অংশ খানিকটা নিচু। সেখানে ভাস্তে শুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও অপর দুই ভিক্ষুর ভূমিশয়া। ভিক্ষুদের পালনীয় অষ্টশীলের একটি শীল হলো ‘উচ্চাশয়ন ও মহাশয়ন’ নিষিদ্ধ। পালঙ্কের উপর বা বৈভবপূর্ণ আরামদায়ক শয়্যায় শয়ন করা অনুচিত। মহাথেরোর শয়্যা পাতা হয়েছে। তিনি পাশে বসে আছেন। অদূরে আমাদের জন্য টেবিল সাজানো হয়েছে। মেঝেয় বসে

নিচু টেবিলে খেতে হবে। বসে পড়লাম। এই বসার মধ্যেই বোঝা যায় কে কাকে নিয়ে বসতে বা চলতে ভালোবাসে। সেই অনুযায়ী সবাই বসে পড়ল গোল টেবিলের চারদিকে। সব জায়গার মতো নিচু টেবিলগুলো গোল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার সময় টেবিলের ছাউনিটা গোল বলে গড়িয়ে নেওয়া খুব সুবিধে। পরে নিচের কাঠামো নিয়ে যায়।

পুলক, দেবশিশ, সিদ্ধার্থ ও আমি বসেছি। কাঁচা আমের ভর্তা দেখতে পাচ্ছি। শুকনো পোড়া লঙ্কা গুঁড়ো ও লেবু পাতা আছে। স্যুপের বাটিও এল। মাছ বা মাংস একটা তো থাকবেই। চায়ের কেতলি ও ছোট পেয়ালা এলো। চামচ ও কাঁটা আছে। হাত ধুয়ে এলাম বারান্দায় গিয়ে। গামলা দিয়েছে। সাবানদানিতে সাবান। আরেক গামলায় পানি, তাতে আছে বাটি। সাবান দিয়ে হাত না ধুলে বড্ড খুঁতখুঁত করে মন। নাপ্লি ও গুঁটকি আমার পছন্দ কিন্তু খাওয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধোয়া চাই। খাওয়ার পর হাতে গুঁটকির গন্ধ থাকলে আমার চলে না। তা সে লাঙ্কা, রূপচাঁদা, চিংড়ি, হাঙরের মতো উৎকৃষ্ট জাতের গুঁটকি বা তৃতীয় শ্রেণীর নরলি, ফাতলা, অলুয়া, চইক্যা যাই হোক না কেন। বাংলাদেশে একমাত্র কক্সবাজারের হোটেলে বুক ফুলিয়ে গুঁটকি রান্না বা ভর্তা হয়। ঢাকার কিছু হোটেলে আজকাল গুঁটকির ভর্তা পাওয়া যায়। আমার পছন্দ কাঁচা লঙ্কা পুড়িয়ে মাটির হামামদিস্তায় পিষে তার সঙ্গে গুঁটকি পুড়ে, মিহি করে কুটে, পেঁয়াজ ও সর্ষের তেলে ভর্তা। হাঙর গুঁটকি সেদ্ধ করে ওই পদ্ধতিতে ভর্তা করলে তো কথাই নেই। বার্মার সঙ্গে চট্টগ্রামের খাদ্যাভ্যাসে কিছু মিল তো আছেই। পাশাপাশি রাজ্য বলে এর-ওর মধ্যে আদান-প্রদানও হয়েছে।

খাওয়ার পর এলো আম। ওই যে রং কুইসি আম। মংডুতে পে চ বা ইচ্ছাপূরণ মন্দিরের চতুরে কাঁধ সমান গাছে ওই আম ঝুলতে দেখেছি। ওই মন্দিরের পাশেই আ থুং মং করেছে বাড়ি। নিজের ছোট্ট পরিবার নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখছে। সবাই স্বপ্ন দেখে, সুখী হতে চায়। কিন্তু সবাই সুখী হতে পারে না। ঠিকমতো খাবারও জোগাড় করতে পারে না সবাই। মানুষও তো আহা-কেন্দ্রিক প্রাণী। সবার শেষে আম এলো। আমের মতো উৎকৃষ্ট ফল আর হয় না। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুধের তৈরি কোনো খাবার পাই নি। না পায়ের, না দুধ, অথবা মিষ্টি বা দই। বুড়োদের মুখে শুনেছি বর্মীরা দুধকে বলে গরুর শরীরের পুঁজ। বর্মীরা বলে বাছুরের হক কেন মানুষ খাবে? মায়ের দুধের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার সন্তানের। তাহলে মানুষের দুধও তো গরুর দুধের মতো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা যেতে পারত। শুধু গরু, মোষ, উট, ঘোড়ার দুধ কেন মানুষ খাবে? আজকাল মিয়ানমারে তাও একটু প্রচলন হচ্ছে গরুর দুধ খাওয়া। মিষ্টির দোকান এখনও পর্যন্ত দেখি নি।

খেয়ে বের হওয়ার সময় ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ মহাথেরো বললেন, আপনি এখানে চলে আসুন, রাতে থাকবেন।

ফিরে এলাম। বিছানা করা হয়ে গেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঘুমাব কেন? জানি ওদিকে ভোর রাতে উঠতে হবে। সম্ভবত কাল ভোরে মান্দালয় যাত্রা শুরু হবে। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। কোনো ভদ্রলোক কি বিদেশে এসে এত আগে বিছানায় যেতে পারে! নাকি যাওয়া উচিত!

পান খাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়লাম। এগোতেই বড় রাস্তা। সামনের দিকে সেতু অতিক্রম করে গেছে হ্রদের ওপর দিয়ে। বাঁয়ে পানের দোকান। কিন্তু ওখানে বসা যাবে না। আমাদের আবাস ধর্মশালার একদম কাছে, চোখে পড়ে যাব। আমাদের গাইড দু' জন কোন দিকে গুতে গেল কে জানে! গেছে বেঁচে গেছি।

ড্রাইভার ও সহকারীকে পাকড়াও করলাম। সিদ্ধার্থ ও দেবাশিস সঙ্গে। ড্রাইভারকে হৃদয়ের বাসনা বললাম। সে নিয়ে চলল। ডান দিক ধরে এগুচ্ছি, বিহারের ফটক পেরিয়ে গেলাম। দশ-পনেরোটা দোকান পেরিয়ে রাস্তার ওপারে ছোট্ট নিরালা একটি দোকান মিলে গেল। এক-দু' বছরের এক বাচ্চা বেড়াল নিয়ে মেঝেয় খেলছে। পাঁচখানা মাত্র টেবিল। একটাতে এক খন্দের যুবক বসে আছে। সে পান করছে। সাদা একরকম পানীয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক চুঁয়ানি মদের মতো। ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইলাম ওটা কি, কী জিনিস? ড্রাইভার ভালো করে দেখে নিল। দোকানের মালকিন এলো। যুবতী। বেড়াল নিয়ে খেলায় মগ্ন বাচ্চাটির মা। ড্রাইভার বলল, ওটা ভালো জিনিস নয়, অল্প দাম, দেশি মাল। যুবতী-প্রতিমার মুখে মোহিনী হাসি।

একান্তই সাধারণ ও স্থানীয়। আমি বললাম, ওটাই খাব। এই সুযোগ আর নাও পেতে পারি।

এমন সময় পাশের টেবিল থেকে যুবকটি এক গ্লাস পাঠিয়ে দিল। তার থেকে অর্ধেক দিলাম দেবাশিসকে, চেখে দেখতে, স্বাদ নিতে। ভালো লাগলে ওটাই কিনে খাব। সিদ্ধার্থের এক কথা। সে ওসব খাবে-দাবে না। ওর জন্য টাইগার। বাঘ চাই। না, নেই। আছে মান্দালে বিয়ার, বোতলে ভরা। আমাদের টাকায় এক বোতলের দাম এখানে চল্লিশ টাকার মতো। ভাত থেকে তৈরি বর্মী হোয়াইট লিকার চেখে ও শুঁকে দেখলাম। বদ গন্ধ নেই, এমনকি ভালো বলা যায়। গলায় লাগছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক চুঁয়ানিও ঢোকে গেলার সময় গলায় জ্বলা করে, গন্ধটাও খারাপ। আধ বোতলের দাম মাত্র পাঁচ টাকা। এর চেয়ে সস্তা জগতে আর কী হতে পারে? তিন বোতল শেষ করলাম। বিয়ার খাচ্ছে ড্রাইভার ও সহকারী। বর্মী ভাষায় এই হোয়াইট লিকারের নাম জেপ সিও। গ্লাসে ঝলমল করছে, কোনো রকম কুথ জমে নি, ঘোলাটেও নয়। ওপাশে জমাট গান বাজছে রেক্তরায়। খন্দেরও আছে। মালকিনের ফুটফুটে বাচ্চাটা বেড়ালের লোম মুঠোয় ধরে টানছে, গলার লোমে মুখ

ডুবিয়ে দিল। মান্দালয় ও মিয়ানমার বিয়ারের বিজ্ঞাপন ঝুলছে পোস্টারে পোস্টারে। বর্মী সুন্দরীরা বিভ্রম দেখিয়ে হাসছে। মডেল পুরুষ ও রমণী হুইস্কির বিজ্ঞাপনে হাসছে। পানাহারের সময় সুন্দর মুখের হাসি নেশা ধরায় তাড়াতাড়ি। অথবা ফিকেও করে দেয়? নয়তো কখনো কখনো এক পেগে শরীর কথা বলে ওঠে কেন, কেন শরীর ঝলমল করে গেয়ে ওঠে! তার অর্থ শরীর ও মন প্রস্তুত, অথবা শরীর ক্লান্ত থাকলেও তাড়াতাড়ি নেশা জমে ওঠে। বাচ্চাটির মা একটু কি মোটাসোটা! লুঙ্গি ও ঝলমলে জামা পরেছে। হঠাৎ বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। মহিলা বাঁশের তৈরি ইজি চেয়ারে বসে ব্লাউজ খুলে স্তন্য দিচ্ছে। ছেলেটি মুখে ওয়া ওয়া শব্দ করছে আর খাচ্ছে। এটা ওর সুখের অনুভূতি। হ্যাঁ তাই। পাশের টেবিলের যুবক এক চুমুকে এক পেগ খেয়ে দু'টোক জল খেয়ে নিচ্ছে। সঙ্গে ভাজা বাদাম। এটিই তাহলে পানের রীতি। পান করাটাও শিখতে হয়।

সামরিক শাসকের এক নম্বর সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার তেন ইয় কি যেন উদ্বোধন করছেন টিভিতে দেখাচ্ছে, সেই সুবাদে বক্তৃতা। মিয়ানমার টিভিতে দুটি চ্যানেল। কে একজন নতুন খবরের এলো। সিদ্ধার্থ মোবাইলের কথা তুলল। আমাদের ড্রাইভার বলল, ইয়ান্গুনের ৫০ মাইলের মধ্যে মোবাইলে কথা বলা যায়।

রাত বাড়ছে। মেঘের ঘন সামিয়ানার ওপারে নক্ষত্রেরা। উত্তর-পূব আকাশের কোণায় বীণামণ্ডলের অভিজিৎ নক্ষত্র আছে। আমাদের সূর্য তার সমস্ত সৌরজগৎ নিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১২ মাইল বেগে বীণামণ্ডলের দিকে ছুটে চলেছে। আমাদের পৃথিবীরও নিজস্ব গতি আছে। চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে আবার এক বছরে একবার সূর্য ঘুরে আসছে। আবার অভিজিতের নিজের যদি কোনো গতি না থাকত, তাহলে প্রায় ৫ লক্ষ বছর পরে সূর্য এবং অভিজিতের সংঘর্ষ হতো। চলাই জীবন তাহলে? চরৈবতি।

রাস্তায় নামতেই আলতো ঠাণ্ডা পরশ ও হাওয়া অনুভব করলাম। বৃষ্টি নেই। আকাশে তো এরি মধ্যে জমে গেছে ঘন মেঘ। কোথাও যে বৃষ্টি হচ্ছে বুঝতে পারছি। রাস্তার পাশের সেন্না গাছগুলো অতিকায় ছায়া নিয়ে ঢুলছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এখন রাত। জাপানে ভোর রাত। কুরুকাওয়া-সান ঘুমুচ্ছে। এখন আমারও বিছানায় যাওয়া দরকার। ঠিক সকাল সাতটায় যাত্রা শুরু হবে।

বিছানায় শুয়েই কথায় পেয়ে বসল আমাকে। পাশে সিদ্ধার্থের বিছানা। ওর সঙ্গে শুরু হোক তাহলে। মনে হচ্ছে পেটের ভেতর থেকে কথা বেরিয়ে আসছে। অস্ত্র থেকে পাকস্থলী হয়ে খাদ্যানালি, তারপর শ্বাসনালির কাছে এসে বাকযন্ত্রের সঙ্গে কথারা মুসাবিদা করছে। অনুভবটা নিজের কাছে বেশ লাগছে। অসংযত হয়ে সব কথা বলা যাবে না। ধর্মশালার দোতলার কাঠের মেঝেয় সবাই শুয়ে পড়েছে। কিন্তু কথা তো বলতেই হবে আমাকে। কথারা কনুই মেরে গুঁতোচ্ছে। তাহলে শুরু হয়ে যাক কথা। সিদ্ধার্থ সরাসরি শোতা।

...এই যে ভোর রাতে উঠে সাজগোজ, ছয়টা সাড়ে ছয়টার মধ্যে প্রাতর্ভোজন, সাতটার মধ্যে বাসে উঠে যাওয়া, বারোটোর আগে দুপুরের খাওয়া, সন্দের আগে রাতের খাবার খেয়ে ঘরে ঢুকে যাওয়া কি আমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে, নাকি মেলানো সম্ভব। সঙ্গে থেকে রাত দশটা বা ঘুমানোর আগে পর্যন্ত এক জায়গায় গাদাগাদি করে পড়ে থাকা কি মনুষ্যোচিত? এজন্যই তো আশপাশে পানশালা খুঁজি, ফাঁক-ফোকর বের করি, তাতে করে সময়টাতো কাটবে! এভাবে কাঁহাতক চলে!

সিদ্ধার্থ হুঁ-হ্যাঁ করছে। অন্যরা সবাই শুয়ে তো পড়েছেই, অনেকে ঘুমের বাড়ির ভেতরে সৈঁধিয়ে গেছে। যারা এখনো ঘুমোয় নি তারা চুপচাপ, ঘুমোনের চেষ্টা করছে চোখ বুজে থেকে। আমি বকবক করে যাচ্ছি। সিদ্ধার্থ ধৈর্যশীল শ্রোতা। ছাইপাশ কত কী যে বলেছি কে জানে! তবে শেষে কী বলেছি মনে আছে। সেটাই বলি।

না বাপু, এই দেশে থাকা যাবে না। সব জিনিসের দাম কম। যা খাচ্ছি তাও, যা খাওয়ার নয় তাও। বাংলাদেশ থেকেও কম। চাল, ডাল, চিনি সব এক দাম। নুন ও চিনির দামও বোধহয় এক। আবার দিনের মধ্যেই দিনের খাবার শেষ করতে হয়। তাহলে রাতে কি খাব? রাতের জন্য তো কিছু করা বা খাওয়ার রইল না। তাহলে চলবে কী করে? রাতটা কি আমার নয়? জীবন থেকে রাত বাদ দিলে আর থাকেটা কী? না, এ দেশে থাকা যায় না, আমি থাকব না। রাত বড় দীর্ঘ, সঙ্গে থেকেই গুরু হয়ে যায়। এটা আমার মতো বিদেশিদের যোগ্য দেশ নয়।

আসলে জেপ সিও-র নেশায় পেয়েছে। বকবক করতে ভালো লাগছে। বর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে হয় ইংরেজিতে। ওরা সবাই ইংরেজি বোঝে না, তাই আলাপ প্রায়ই জমে না। আর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যারা বলতে পারে না, তারা মিটিমিটি হাসে। কথা বুঝে, বলার পর না-বলা কথাগুলো হাসি দিয়ে বোঝালে কতই-না ভালো হতো। বিকিরণ বড়ুয়া কথার চোটে শেষ পর্যন্ত বলে উঠল, তালত, এবার ঘুমিয়ে পড়ুন, আমাদের ঘুম পেয়েছে। বিকিরণ আমার মেজ বৌদির দাদা, তাই তালত ভাই।

তাই তো! ঘুমিয়ে পড়া ভালো কাজ। ঘুমোনো দরকার। সকাল সকাল উঠতে হলে সকাল সকাল ঘুমানো দরকার। ঘুম খুব উত্তম জিনিস। ঘুমের চেয়ে ভালো কিছু নেই। রাত হলো ঘুমের জন্য। ঘুম খুব ভালো, নিশ্চয়ই ভালো। ভালোই তো, ভালো হতেই হবে, হওয়া চাই... দরকার... না... হ-য়ে... উ-পা-য়... আ-ছে? ...ভা-লো... উ-ত্ত-ম... জে-প্ সি-উ খু-উ-ব ভা-লো... জে-প্ সি-ও-ও... চু-প্-কি-উ...

ঘুমুতে ঘুমুতে ভাবলাম কোথায় যেন ওর গলা শুনেছি, চিনতে পারছি ওর ডাকে! অনেক দূর থেকে ডাকছে, ব্যক্তিত্বশীল কিন্তু বিষণ্ণতায় ভরা। চিনতে পারছি আবার

পারছি না। ঘুম জাপটে ধরে কুস্তি করছে, নাক-মুখ-শরীর চেপে ধরেছে। ওরকমই। কিন্তু কুরুকাওয়া-সান এখানে আসবে কি করে? ওর এখন মাদ্রাজ থেকে তোকিও ফিরে যাওয়ার কথা। মাদ্রাজে ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিল, আমি তখন কোলকাতায়। দু' মাস আগে শেষবার কথা হয়েছে। কে জানে মিথিলায় কি করে এলো! ওর পক্ষে সব সম্ভব। থাই এয়ারওয়েজে এরি মধ্যে কত হাজার মাইল যে ভ্রমণ করেছে মনে পড়ছে না ছাই। তাও বছরখানেক আগে বলেছিল। এরি মধ্যে প্যারি, দিল্লি, ব্যাংকক হয়ে আবার মাদ্রাজ গেছে। মানুষের কত রকম সুখ যে আছে, কত রকম থাকে, কত ইচ্ছে! কিন্তু কাছে আসছে না কেন? আমাকে ডাকছে অথচ কাছে আসছে না। আমি সাড়া দিচ্ছি কিন্তু সে গুনতে পাচ্ছে না। নাকি আমার গলায় স্বর ফুটছে না! বিছানায় পড়ে আছি, উঠতে পারছি না। ও-তো সামান্য নারী নয়, নারীরত্ন, তারও বেশি। খুব ইচ্ছে হলো ওর কাছে চলে যাই। ও আবার ডাকল। বলল, বিপ্র-সান, আমার মা হওয়ার সময় যে শেষ হতে চলল। আমার বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল। আবার সে বলল, কী করব বলো!

স্বপ্ন ভেঙে গেল। হয়তো সে তার বিয়ে না হওয়ার দুঃখের বোঝাটি বইতে না পেরে চলে গেল। স্বপ্ন ভেঙে গেল! স্বপ্নটা আবার দেখা যায় না? এর পরের অংশটি যদি আবার দেখা যেত, স্বপ্নটা আবার যদি জোড়া দেওয়া যায়! আবার কি আরম্ভ করা যায় শেষ থেকে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আবার দেখা দিক। হে স্বপ্ন, হে নিদ্রা, হে স্বপ্ন ও নিদ্রার দেবী, তোমরা আবার মৈত্রী ও করুণা দেখাও। ঠিক বাঁ কাত হয়ে শুয়ে রইলাম, যেভাবে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছিলাম সেভাবে শুয়ে রইলাম। আবার নামুক, স্বপ্ন এসে হানা দিক।

সত্যিই স্বপ্ন এসে পড়ল। কিন্তু বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছে, কুয়াশার সাঁকোর মতো ছিঁড়ে যাচ্ছে আর জোড়া লাগছে। কী সাদা আর বড় দানার কুয়াশা, কী তার মহিমা, যেন রাজার ছেলের অভিষেক হচ্ছে। ওর নাম কুরুকাওয়া বা কালো নদী। ওকে ডাকলাম। বেরিয়ে পড়লাম মিথিলার নির্জন রাজপথে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ঘোড়াগাড়ি, ঘোড়ার খুরের কপাৎ কপাৎ শব্দের লহর! ঘোড়াগাড়িতে করে কালো নদী চলে যাচ্ছে... ক্রান্ত বিষণ্ণ শোকে। আমাকে ডাকছে না আর। শুধু একবার বড় বড় চোখ দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল, অমনি আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল। স্বপ্নও ভেঙে গেল। কালো নদী চলে গেল।

রাত বর্ষীয়সী হয়, অপমানের মতো তার মাত্রা ও অন্ধকার বেশি। গভীর। আবার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে ঝুল-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িলাম। হাঁটতে কাঠের মেঝে থেকে শব্দ ওঠে। রাতে সেই শব্দ বড় হয়ে যায়। আকাশে চাঁদ দেখা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সপ্তমীর চাঁদ কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, পূব আকাশের পূর্বাষাঢ়া তারাটি মেঘের আড়ালে পড়ে আছে। ওর থেকে আষাঢ় মাসের নাম। বৃষ্টি হচ্ছে বলে কুকুরেরা ঝুল-বারান্দার নিচে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

একটা কুকুর কেঁদে উঠল ইনিয়ে-বিনিয়ে, তার সঙ্গে মেয়ে কুকুর-একটি যোগ দিল। চিৎকার করে ধমক দিলাম কান্না থামানোর জন্য। থামল। রাত-দুপুরে কারও কান্না শুনতে আপনারও ভালো লাগবে না। মাইল্ড সেডেন সিগারেট খাচ্ছি ক'দিন ধরে। জাপানি সিগারেট। ধরিয়ে নিলাম। নিচের থেকে একটা কুকুর আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। দেখে কী ভাবল কে জানে! বিহারে সাধারণত অনেক কুকুর থাকে। চিৎমরম ক্যাং কাণ্ডাই-এর কাছে। কর্ণফুলীর ধারে। ওখানেও প্রচুর কুকুর থাকে। তিরিশ-চল্লিশটা তো হবেই। মঙ্গোল জাতি পাহাড়-পর্বতে থাকে বলে কুকুরের সাহায্য দরকার, কুকুর পাহাড়ি জীবনের বন্ধু, বিশ্বস্ত পাহারাদার। বন্য জন্তুর নজরদারি করে। ঘরের পোষা প্রাণীদের পাহারা দেয়।

এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুমটা বিরক্ত করছে, কিছুতেই জমপেশ হয়ে চোখ পেতে বসছে না। অন্যদের অন্য অন্য কিছুতে চলে, ঘুমের চাই দুটি চোখ। আমি বুঝতে পারছি জেপ সিও চোখ দুটোতে হামলা করেছে। মাত্রা বেশি হলেই চোখের ওপর দখল নেয়, ঘুমের তখন অসুবিধে, সে চোখের কাছে গিয়েও চড়াও হতে পারে না। দু'জনে দেড় হাজার মিলিলিটার জেপ সিও আত্মসাৎ করেছে। তবুও ঘুম এক সময় মরিয়া আক্রমণ চালায়। কোথায় যেন ঝুমঝুম একটা শব্দ হচ্ছে। আহা! ও যে চিনলোন বলের ঝুমঝুম সঙ্গীত। চিনলোন হলো বেতের বল। মিয়ানমারে এই খেলা খুব চলে। রাস্তার পাশে, গাড়ি রাখার জায়গায়, অথবা উঠোনে ওই পাঁচ-সাত বর্গফুট জায়গা পেলেই হলো। তিন-চারজন ওই অল্প জায়গায় চিনলোন খেলায় গভীর আগ্রহে মেতে উঠল। ও কি! মোয়ে মোয়ে সানের (Moe Moe San) দল নাকি! মোয়ে মোয়ে সান মিয়ানমারের বিখ্যাত চিনলোন খেলোয়াড়। তাঁর নারী বাহিনীই কি খেলছে? মেয়ে, ছেলে, বুড়ো সবাই চিনলোন খেলে। বেতের বলটাকে মাটিতে পড়তে না-দিলেই হলো।

ওরা এসে গেল। একে একে চারজন। আমি তো কোনোদিন চিনলোন খেলি নি। তার মধ্যে মোয়ে মোয়ে সানকে দেখেছি ছবিতে। *মিয়ানমার ক্রনিকলে* ওর সম্পর্কে পড়েছি, ছবি দেখেছি। এলো কুরুকাওয়া, আমার ব্যাংককের বান্ধবী সংসারণ নীলক্ষুমায়েং বা সংক্ষেপে সং, মোয়ে মোয়ে সান আর রুঝী বড়ুয়া। আমি খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম। একই সঙ্গে আমার তিন বিশেষ বন্ধু এবং একজন অপরিচিতা। একজন তো আমার ধর্মপত্নী। এমন সমস্যায় বাস্তবে কোনো দিন পড়ি নি। বেতের বলটি পা দিয়ে ফিরিয়ে দিলাম, মোয়ে মোয়ে সান তার বাঁ নিতম্ব দিয়ে বলটির পতন রক্ষা করে ফিরিয়ে দিল, সং দিল পায়ের পাতা দিয়ে। বলটি পূর্ববৎ শূন্যে ভাসিয়ে দিল। রুঝী বাঁ পায়ের ডিম দিয়ে বলটি কুরুকাওয়ার কাছে পাঠিয়ে দিল। কুরুকাওয়া মাথা দিয়ে মেরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। আমি ওদের দক্ষতা দেখে তো মুগ্ধ! বেতের বলটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে শূন্যে ভাসতে লাগল। মোয়ে মোয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে কোমর দিয়ে বলটি শূন্যে ভাসিয়ে দিল। শূন্যে ভাসছে

বল, সং হাঁটু দিয়ে আঘাত করল। ওর গায়ের রঙ পোড়া পোড়া লালচে। প্রত্যেক আঘাতে শব্দ হচ্ছে, ফুটবলের সমান বেতে বোনা বল। বেতের তৈরি বালিশ হয় এখানে ও ব্যাংককে। পাঁচ-ছয় বর্গ ইঞ্চি মাপের কৌটো হয়। মোটা বাঁশের সমান, বোতল রাখার মাপে কাঁধে ঝোলানোর ঝুড়ি হয়। আমি তো মনে করেছিলাম বোতল বা ফ্লাস্ক বয়ে নেয়ার জন্য বুঝি ওই ঝুড়ি তৈরি হয়েছে। আসলে ওতে পারিবারিক ইতিহাস, পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে নেওয়া হাত বা পায়ের ছাপ ইত্যাদি ভরে বুদ্ধবেদির পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আমি তো ওই ঝুড়িতে পানির বোতল ভরে কাঁধে নিয়ে ঘুরছি। বেতের কত রকম ঝুড়ি ও বাক্সো হয়!

বেতের বলটি আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে যায়। বলের গায়ে বেতের বুনন ভারি সুন্দর। সং, কুরুকাওয়া, মোয়ে মোয়ে ও রুবী কী-একটা বিষয় নিয়ে হাসছে। আমার মনে হলো ওরা আমাকে নিয়ে কোনো ব্যাপারে যোগসাজশ করছে। ওই চিনলোন খেলতে খেলতেই। ওদের চোখ ও ডুরুর নাচন, ঠোঁটের কোণের কাজ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি ভাবছি কার সাহায্যে রহস্যের উদ্ধার করা যায়? না, এখন কেউ বলবে না। এমনকি রুবীও নয়।

কুরুকাওয়াকে অনুরোধ করে বললাম, তুমি বলে দাও, আমি সারা জীবন তোমাকে বন্ধু করে ভালোবাসব।

না, ওর পাশাপাশি হৃদয় গলল না। চোখ দিয়ে ঠেলে আমাকে নাগালের বাইরে ভাসিয়ে দিল। না, ওরা কেউ মানবী নয়।

সং বলল, আগে খেলা শেষ হোক। তোমার কারণে বল মাটিতে পড়লে শান্তি আছে।

মোয়ে মোয়ে বলল, মেয়েদের ব্যাপারে এত নাক গলাতে চাও কেন? একটু সবুর করো!

রুবীও মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। বলল, আমি কি তোমার মনোজগৎ ও এই মানবজগতের শেষ নারী?

আমার মনে হলো ওরা সবাই যেন অমর্ত্যলোকে চলে গেছে। ওদের শরীর দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওরা আসলে ছায়ালোকে খেলছে, কথা বলছে। সেখান থেকে তারা আমার বাস্তব জগতে আসতে চায় না। আমি ভাবলাম কে ওদের সেখানে নিয়ে গেছে, কী তাদের উদ্দেশ্য? যার চরম প্রভাবে আমার অস্তিত্বতা? ওরা কি মানবী হয়েও মানবী নয় তাহলে? কিন্তু কুরুকাওয়ার হাসির সময় ছোট হয়ে যাওয়া চোখ তো তেমনি আন্তরিকতায় ভরপুর। নাকি প্রাক-মানবী, অথবা কল্প-মনোজগতের মানবী?

স্বপ্ন ভেসে চলল। মোয়ে মোয়ে টলটল করে হেসে উঠল। রুবী সারা শরীরের আদরনীয় কোমলতা দিয়ে বলটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। সেই কোমলতার দরুন আমার দুঃখটা কিছুটা লাঘব হয়ে গেল বলে মনে হলো। কুরুকাওয়া সেটা

লক্ষ করল। সং তখন মোয়ে মোয়েকে বর্মী ভাষায় কি যেন বলল মনে হলো। মোয়ে মোয়ে কিন্তু অনিমেষ দৃষ্টি রেখেছে চিনলোন বলের ওপর, সেই দৃষ্টিটা যদি সামান্য সরে যায় তো বল যেন মাটিতে পড়ে যাবে। কুরুকাওয়া, সং এবং রুবী প্রত্যেকেই। স্বপ্ন ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত তিনটে থেকে আমাদের দলের মহিলারা ঘুটমুট শুরু করে দিল। ওদের স্বামীরাও। অল্প-স্বল্প যা ঘুম হচ্ছিল, স্বপ্ন ও জাগরণের মাঝে আর যেটুকু হতে পারত তাও মেঘের ওপর সওয়ারি হয়ে উঠে গেল। স্বপ্নের পর রেশ থাকে। ভালো স্বপ্ন নিয়ে অনেকক্ষণ আয়েশ করে পড়ে থাকা যায়, পরবর্তী ঘুমও তাড়াতাড়ি আসে। এখন দেখি ঘুমেরা আমার চোখে সুখ না পেয়ে মেঘের ওপরে উঠে গেল। ওরা আমার কাছে আশ্রয় না পেয়ে মেঘের উপরে ঘুমতে গেছে। ওই মেঘেরা থাকলে ঘুম নক্ষত্রদের কাছে যায় না। ঘুমেরও তো ঘুম দরকার হয়। আমার থেকে ছুটি-পাওয়া ঘুম মেঘের ওপর ভালো একটা ঘুম দিতে পারবে আর দারুণ বৃষ্টি হবে তখন। মেঘেরা রাতে এভাবে বেশি বৃষ্টি দেয়, ঘুমের মধ্যে কি কাণ্ডের কাণ্ডজ্ঞান থাকে! আমার খাওয়া-দাওয়া-পানাহার চাই। পছন্দমতো শয়্যা দরকার। মেঘের শয়্যা বোধহয় ঘুমের খুব পছন্দ। এসব আমাকে বলেছে কালো নদী। ওর তো ঘুম কম হয়, তখন নাকি মেঘলোক থেকে জোর করে ঘুমকে টেনে আনতে হয়। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কত সমস্যা। কত রকম নিজস্ব কল্পনা, পরিকল্পনা ও স্বপ্ন যে থাকে। আমার এও মনে হয়েছে যে চিনলোনের শব্দ ভালো ঘুম এনে দিতে পারে। সঙ্গীতের মতো তার শব্দ। ঝুম ঝুম ঝুম। ঘুম ঘুম ঘুম। চিনলোন চিনলোন চিনলোন। মোয়ে মোয়ে সান। সং সং সং। রু রু রুবী। কুরু কুরু, কুরুকাওয়া-সান। এবার ঘুমটি পেয়ে গেলাম। আমার কাছে স্বপ্ন ঘুমই শ্রেষ্ঠ ঘুম। সুখের স্বপ্ন—এর বেশি আর কী চাই।

মান্দালায়ে স্বর্গ ও স্বপ্নরাজ্য

কুথুডাও প্যাগোডা। মান্দালায়। কত বড় বই আপনি দেখেছেন? এই বইয়ের ৭৩০টি পাতা বা ১৪৬০ পৃষ্ঠা। প্রত্যেকটি পাতা প্রস্থে সাড়ে তিন ফুট ও পাঁচ ফুট দীর্ঘ। পাঁচ ইঞ্চি পুরু। কাজেই এটি বাঁধাই করা সম্ভব হয় নি। প্রতিটি পাতা খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আর এগুলো দখল করে রেখেছে ১৩ একর বর্গাকার জমি। লেখাগুলোও একটু বড়। যদি একজন মানুষ দিনে আট ঘন্টা ব্যয় করে এই বই পড়তে শুরু করে তাহলে তার ৪৫০ দিন সময় লাগবে বইটি শেষ করতে। আসলে পাঁচ ইঞ্চি পুরু মার্বেল পাথরে এই বইয়ের পাতাগুলো নির্মিত।

আপনাকে এজন্য প্রাচীন চীন বা মিশরে যেতে হবে না। পৃথিবীর এই সর্ববৃহৎ বইটি রয়েছে বার্মার মান্দালয়ে। মান্দালয় পাহাড়ের পাদদেশে এই প্যাগোডা অবস্থিত। প্রতিটি বইয়ের পাতা একটি ছোট ঘরে রয়েছে। প্রতিটি পৃষ্ঠা আপনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে পড়তে পারবেন। এই প্যাগোডার বর্মী নাম মহালোক মারাজিন প্যাগোডা। এটি তৈরি করেন রাজা মিন্দন, তবে এটি কুখুডাও প্যাগোডা হিসেবে বেশি পরিচিত। বইটির সব পাতা প্যাগোডার সীমার মধ্যে অবস্থিত। আপনি এর পাতা পড়তে গিয়ে প্রতিটি ঘরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চমৎকার লুকোচুরি খেলতে পারবেন। আমি মা-তি-ডা ও মা-তা-না নামের দুই তরুণী বোনের সঙ্গে খেলেছি। সে এক অলৌকিক স্বপ্নরাজ্যে, স্বর্গরাজ্যে মায়াময় লুকোচুরি খেলা। অথবা বলা যায় বইয়ের পাতার পেছনে ছোট্টা ও বকুল কুড়ানোর ছেলেখেলা। অথবা একেকটা পাতা দেখে ও গুণে গুণে শেষ করা। আর ছোট্ট থেকে বড় হয়ে এর প্রতিটি পাতার কক্ষে মোমবাতি জ্বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণ করার চেষ্টা করেছি। এগুলো হলো ত্রিপিটকের পাতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মান্দালয়ের পলায়নপর অনেক মানুষ এখানে রিফিউজি হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। যুদ্ধের শেষে অনেককে এখান থেকে অন্যত্র সরানো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারা বহু বছর এখানে ছিল। পরে কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় তারা চলে যায়। ১৮৬৮ সালের ৪ মে এর নির্মাণ শেষ হয়। এর জন্য কোনো তালাবন্ধ দরজার দরকার নেই, কোনো লাইব্রেরিয়ান নেই। যে-কেউ যখন-তখন এগুলো পড়তে পারে। এর কপিরাইট কারও নেই। এই প্যাগোডার চার কোণায় চারটি বকুল গাছ আছে। তার মধ্যে একটির বয়স ২৫০ বছর। প্যাগোডা এলাকার বাইরেও অনেকগুলো বকুল গাছ রয়েছে। বার্মার সর্বত্র অজস্র বকুল গাছ। তলা থেকে বকুল কুড়িয়ে মেয়েরা মালা গাঁথে বিক্রি করছে। নিজেরাও পরে। তার গন্ধে চারদিক মাতোয়ারা।

আমি কয়েকটি বকুল কুড়িয়ে নিয়েছি। তখন মা-তি-ডা ও মা-তা-না বোন দুটির সঙ্গে দেখা। ওদের পাঁচ বোন ও এক ভাই। ভাই বড়। ছবি আঁকে। ভাইয়ের ছবি তারা বিক্রি করে প্যাগোডা দর্শনার্থীদের কাছে। কিছু কিছু কার্ডে বাঁশের চিলতে জুড়ে দিয়েছে। খুব আনন্দোচ্ছল ওরা। ইংরেজিতে কথা বলতে জানে। পেশার কারণে ও বর্মী জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য হাসিখুশি। সুশ্রী ও লাভণ্যময়ী। মোষ নিয়ে কয়েকটি কার্ড আছে। মোষ বার্মার খুব উপকারী পশু। চাষবাস মোষ ছাড়া হয় না। দুটি কার্ডে মোষের পিঠে রাখাল বসে আছে। মা-তি-ডা আমাকে বলল, মোষের ওপর ভূমি। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, ভূমি। বড় বোন মা-তি-ডা ফের বলল, ভূমি। আমার বুকে পাঁচ আঙুল ঠেকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, ভূমি। মোষের পিঠে বসা মানুষ হয় ভাগ্যবান। আমি বললাম, এই দেখো, লাল জামা ওর, তোমারও লাল জামা। ও এবার কাবু হয়ে গেল। আমি জানি কার্ড বিক্রির জন্য সে আমাকে

একথাগুলো বলছে। কি সুবিধাজনক ওর অবস্থান। আমিও ওর বুকের দিকে বুড়ো আঙুল নির্দেশ করে বললাম, তুমি ভাগ্যবতী। সে বলল, তুমি। আমি বললাম, তুমি, তুমি, তুমি। তাছাড়া তুমি এত সুন্দর যে ভাগ্য তোমাকে, তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছে।

না। ভাগ্য তোমার জন্য। তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেছ। তুমি কত ভাগ্যবান যে দেশে দেশে ঘুরতে পার। তুমি আমাদের কাছ থেকে কার্ড কিনে নাও। তুমি এই মোষের পিঠে চড়া মানুষ আঁকা কার্ডটি নাও। আমার ভায়ের করা কার্ড। দেখো, তোমার ভাগ্য আরও খুলবে। বললাম, তুমি কার্ড করো না? সে বলল, না। ছোট বোনকে বললাম, নামে বিলু খলে? তোমার নাম কি? সে বলল, মা-তা-না।

কী উজ্জ্বল! কী জীবন্ত! সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার অন্তস্তল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে বলল, আমার ভায়ের করা কার্ডগুলোর থেকে কয়েকটা নাও। আমি নেব না নেব না করেও দাম জিগ্যেস করলাম। দুটি পছন্দ করলাম। একটি বাঁশের কাজ করা, অন্যটি জলরঙ। দাম একেকটি দু' শ' চ্যা। আমি বললাম পাঁচটি দু' শ'। ওরা দু' জনে এক সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল। চোখ কপালে। আর নামে না। যেন এই মাত্র আকাশ থেকে পড়েছে। যেন আমি ভিন দেশ থেকে এসে মিয়ানমারের রাজা হয়ে বসেছি। ত্রিপিটকের সব পাতা যেন আমিই রচনা করেছি। বলল, না না না। শেষে দুটো দু' শ' বললাম। বর্মীরা দরকষাকষি করতে অপমানিত বোধ করে না। বরং কোমর বেঁধে এতে নেমে পড়ে। আনন্দ পায়। শেষে বললাম দু' শ' পাঁচ। আম্‌হা বা বড় বোন বলল, না-না-না। বললাম দু' শ' দশ। শেষ রফা হলো এই দরে। ওর হাতে একটি দু' শ' ও একটি পঞ্চাশ দিলাম। সে বাকি চল্লিশ চ্যা আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দিয়ে বলল, তুমি কত ভাগ্যবান।

আমাদের দলের পিন্টুর দাদা বার্মার বাসিন্দা। সে এসে মেয়েদের বলল, এজন্য বকশিশ দেবে না। সে বর্মী ভাষা জানে। অমনি বড় বোন আমাকে একটি ভিউকার্ড উপহার দিল। আমি কুড়োনো বকুল দিলাম ওর হাতে। স্বপ্নও কখনও কখনও এভাবে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। স্বর্গও মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে এভাবে পায়ে পায়ে নেমে আসে। কুথুডাও প্যাগোডায় গোধূলিবেলায় ৩১ মে স্বর্গ ও স্বপ্ন এভাবে আমাকে নিয়ে খেলায় মত্ত হয়েছিল।

কুমারী-কন্যার দেশ ও নিষ্পাপ রজনী

সুপ্রাচীনকাল থেকে মিয়ানমার প্যাগোডার দেশ নামে পরিচিত। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে যে মিয়ানমার 'কুমারী-কন্যা' নামেও পরিচিত। মিয়ানমারের

মেয়েদের সারল্য, সচেতনতা ও সমাজে তাদের প্রাধান্য দেখে লোকে মনে করে যে এটা বড্ড বাড়াবাড়ি, মেয়েদের লাজলজ্জা বলে কিছুই নেই। মনে করে পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের মতো মিয়ানমারের মেয়েদের কৌমার্য বলে কিছু নেই, তারা খুব সহজলভ্য। কিন্তু যারা সেখানে গেছে এবং মিয়ানমারবাসীরা জানে তাদের মেয়েরা বিয়ের আগে কুমারী থাকতে কত বেশি পছন্দ করে এবং থাকে। তাদের এই কৌমার্যসম্পদ সুদীর্ঘকাল ধরে তারা ঐতিহ্য হিসেবে রক্ষা করে আছে।

কাম-জীবন সম্পর্কে মিয়ানমারবাসীর কিছু রাখঢাক ব্যাপার আছে। এই ব্যাপারে তারা অন্তর্মুখী ও গোপনীয়তা পছন্দ করে। কাম সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা বা ব্যবহার অপছন্দ করে। বিরত থাকে। এটি তারা ধর্মের প্রভাব মনে করে। তাদের আচরণীয় ধর্মে যৌনতা বা কামকে পাপ হিসেবে গণ্য করে। গৃহী বৌদ্ধরা তাদের নিত্য আচরণীয় পঞ্চশীলে ‘অবৈধ কামাচার’ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা পায়। প্রতি মাসে আসে অষ্টমী, পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যা। এই চার দিন তারা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালন করে। পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের পঞ্চমশীল হলো, ‘অবৈধ কামাচার থেকে বিরত থাকব এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।’ এটি তাদের মজ্জাগত বা অবশ্যপালনীয় ধর্ম।

“কোনো কোনো মন্দ জিনিসের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের লুকিয়ে রাখাই উচিত, যেমন কাম”—এটি মিয়ানমারের বহুল প্রচলিত উক্তি। ধর্মীয় শিক্ষকেরা অনবরত বলে বলে একে জনগণের মাথার মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। মিয়ানমারবাসীরা এভাবে সারা বিশ্বে অল্প কামুক জাতি হিসেবে পরিচিত।

সবকিছু মিলিয়ে মিয়ানমারের মেয়েদের বিয়ের আগে পর্যন্ত কুমারীত্ব রক্ষা করা উচ্চ প্রশংসার বিষয় হিসেবে দেখা হয়। এটি তাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। বার্মার মতো রক্ষণশীল সমাজে ডেটিং প্রায় অচল বলা যায়। তবে এও সত্য কথা বেশির ভাগ তরুণ-তরুণীই প্রেমে পড়ে এবং প্রেমে বিশ্বাসী। কিশোর-কিশোরীদের ছেলে বা মেয়ে বন্ধু থাকবেই, আর তা স্বাভাবিকও। তাদের বেশির ভাগই প্রেমের ব্যাপারে ধীরে চলার নীতি মেনে চলে। এটি তাদের ঐতিহ্য। বিয়ের আগে পর্যন্ত কৌমার্য বিসর্জন না দেওয়াই ভালো মনে করে। খুব কম জুটিই বিয়ের আগে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। আর কোনো ছেলে জোর-জবরদস্তি করলে মেয়েটি সাধারণত তার গালে চড় দিয়ে প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ করবে। জোর করে দৈহিক সম্পর্ক এখানে হয় না বললেই চলে। তাদের ভালোবাসা প্রকাশের বা প্রেম নিবেদনের প্রধান উপায় হলো প্রেমপত্র অথবা মৌখিক প্রকাশ, আর এখন হয়েছে টেলিফোন।

তাহলে কি মিয়ানমারের তরুণেরা বিশ্রী ও অসহ্য জীবনযাপন করে? না, তাদের জন্য আছে কনসার্ট, যার নাম স্টেজ-শো। ভিডিওর সঙ্গে তারা কণ্ঠ মেলায়। ভিডিও ছবি ও যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে উচ্চৈঃস্বরে আর তার সঙ্গে মাইক্রোফোনে গান

করছে কোনো যুবক। এসব গানে জনপ্রিয় মডেলরা অভিনয় করে। জনপ্রিয় শিল্পীর গান অনুযায়ী ভিডিও করা হয়। এ রকম গান শোনায আমিও অংশ নিয়েছি। শ্রোতা-গায়কের সঙ্গে অন্যরাও কণ্ঠ মেলায়। পপ গান ও এয়ারোবিক ব্যায়াম করবে। এসব দেখে বা শুনে আপনার মনে হবে মিয়ানমারের যুবকেরা কামচর্চায় শীতল, এ যুগের বাসিন্দা নয়।

মিয়ানমারবাসীর স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি বিশেষ নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন আছে কি নেই বড় কথা নয়, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটনাই এখানে বিরল। বলাৎকারের ঘটনা দুর্লভ। আর যদি থাকেও স্কুল-কলেজে তা দেখা বা শোনা যায় না। স্কুলের অল্প বয়সী মেয়ের ওপর যৌন নির্যাতন তো অকল্পনীয়। বিশ্ব থেকে পিছিয়ে থাকার এটা সুফল কি না কে জানে! কারণ হয়তো অন্য কোথাও নিহিত। মেয়েরা এত বেশি দিন ধরে কুমারী থাকার কারণ কি তাহলে তারা মাদকাসক্ত নয় বলেই! ওরা মদ ছোঁয় না, ড্রাগ ব্যবহার করে না। অথচ সমাজে মদ প্রচলিত। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামেও একই রীতি। এখানেও মেয়েরা মদ খায় না, স্বজাতির কাছে কৌমার্য হারায় না, হারাতে হয় না, যৌন-নিপীড়ন নেই।

পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে মিয়ানমার কত আলাদা! এখানে নাইট ক্লাব নেই বললেই চলে। ইয়াঙ্গুন ও মান্দালয়ের মতো বড় বড় শহরে স্ট্রিপ-টিজ শো বলে কিছু নেই। ম্যাসেজ পারলার নেই। পর্নোগ্রাফিক সিনেমা দেখতে পাবেন না। পর্নো বই নেই। সিনেমায় যৌন ও অন্যান্য নির্যাতনের কাহিনী ও দৃশ্য নিষিদ্ধ। যন্ত্রসর্বস্ব নাচ-গানও নিষিদ্ধ। রেডিও-টিভি যৌন উদ্বেজক কিছু প্রচার করে না। বিজ্ঞাপনে যৌন সুড়সুড়ি দেয় এমন দৃশ্য দেখানো যায় না। এখানকার শহর-বন্দর শান্ত, স্নিগ্ধ এবং এক অর্থে অলস বলা যায়। পৃথিবীর কোনো শহরে এ রকম আপনি পাবেন না। মিয়ানমারে বড় জোর দেখবেন হঠাৎ কিছু তরুণী একটু উগ্র পোশাক হয়তো পরেছে। তাতেও ঠিক পাশ্চাত্য উগ্রতা নেই। ইয়াঙ্গুন বা মান্দালয়ে দু' একটি নাইট ক্লাব যা-ও আছে তা পাশ্চাত্যের তুলনায় নিঃপ্রভ।

তাহলে পৃথিবীর আদিতম দেহ-ব্যবসা কি এখানে নেই? আছে। তা অত্যন্ত সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে আছে। তারপরও দেখা যায় জাতিসঙ্ঘের এইডস বিষয়ক সংস্থার মতে, মিয়ানমারের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ লক্ষ মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত। বার্মা-থাইল্যান্ড সীমান্তে এর প্রভাব বেশি। মিয়ানমার সরকার এটা স্বীকার করে না। মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত সিরিঞ্জ ব্যবহার না হওয়া বা কনডম ব্যবহার না করা এর কারণ মনে করা হয়। আর এই বিষয়ে শিক্ষাও নেই। মিয়ানমারে চিকিৎসা সেবার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারপরও বলা হয় কাম মিয়ানমারবাসীর নাগরিক জীবনে চোখে পড়ার মতো বড় ভূমিকা পালন করে না। তার বড় কারণ গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা। ভোগ-বিলাসকে তারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য কখনও মনে করে না। জীবনের আসল উদ্দেশ্য

‘নির্বাণ’, চরম ও পরম মুক্তিও নির্বাণ। জন্ম থেকে মৃত্যু, দুঃখ ও আনন্দের পরম প্রশান্তি ওই নির্বাণ।

সংসার-ধর্ম পালন করেও নির্বাণ পথে যাওয়া সম্ভব একথা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে। জীবনে দুঃখ আছে, তার থেকে মুক্তির উপায়ও আছে। এজন্য দরকার সং কৰ্ম। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্যাগোডা ও বিহারে-আছে অজস্র তরুণ শ্রামণ ও ভিক্ষু। অগণিত তরুণ-তরুণী সকাল-সন্ধ্যা সেখানে প্রার্থনা করছে। দুপুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করছে। দান-ধর্ম তাদের জীবনের স্বভাবধর্ম। সকালে দলে দলে ভিক্ষায় যায় শ্রামণ ও ভিক্ষুরা। বিহারকেন্দ্রিক স্কুলে শ্রামণ-ভিক্ষুরা শিক্ষা দিচ্ছে। জন্মের সময় মিয়ানমারবাসীরা উৎসব করে না, মৃত্যুর পর তাদের উৎসব দেখার মতো। শ্রামণ হওয়ার সময় অনুষ্ঠান হয় জাঁকজমক করে। প্রত্যেক মিয়ানমার তরুণ জীবনে দু’-একবার চীবর ধারণ করে শ্রামণ হবেই। অজস্র কুমারী মেয়ে শ্রামণী বা মিছিল হয়ে ধর্মজীবনযাপন করবেই। এটি সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য মিয়ানমারের। মানুষের মৃত্যু হলে বিলাপ করে কাঁদার জন্য ভাড়া করে লোকও নিয়ে আসে শুনেছি।

মিয়ানমার দেশটি সেক্সকে সম্বল করে পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে চায় না। তার একটি অসাধারণ সম্পদ হচ্ছে প্রাচীন প্যাগোডাসমূহ। শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্পের এই অপূর্ব বিস্ময় একান্তভাবেই মিয়ানমারীয়। দেশে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি নেই। রাত-দুপুরে একজন পুরুষ বা নারী নির্ভয়ে কোথাও আশ্রয় পেতে পারে। গন্তব্যেও পৌঁছতে পারে। ধর্ষণের ঘটনা বিরল। সন্ধ্যের বা রাতে মেয়েদের ঘরে ফেরা নিয়ে মা-বাবার কোনো চিন্তা থাকে না। বিদেশিরা নির্ভয়। হত্যা, গুম খুন নেই। মিয়ানমারের প্রকৃতির সুদীর্ঘ এই ঐতিহ্য ও সুনাম বিস্ময়কর। সমাজের গভীরে প্রোথিত আছে তাদের অতিথিবাৎসল্য। বন্ধুত্ব ও আতিথ্য বিদেশিকেও কাছে টেনে নেয়। দীর্ঘ মিলিটারি শাসন ও অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যেও দেশটি আশ্চর্যভাবে এই সদগুণাবলিকে ধারণ করে আছে।

কেউ কেউ মনে করেন এর একটি কারণ মেয়েদের মুখে-হাতে-পায়ে সেনেকার মাখা। সেনেকার এক রকম গাছের ডাল-বাটা প্রসাধনী। হালকা এর সুবাস। এক টুকরো কাঠ পানি দিয়ে পাথরে ঘষে চন্দনবাটার মতো এই প্রসাধনী তৈরি করে। প্রত্যেক নারী, কী তরুণী, কী বৃদ্ধা, সবাই তা গালে ও হাতে-পায়ে মাখবে। মিয়ানমারের নারীর স্নিগ্ধ পেলব ত্বকের এটি গুঢ় রহস্য। বহুকাল ধরে এটি পরীক্ষিত। রাষ্ট্র ও সমাজের কত বিপর্যয় ও বিবর্তন হয়েছে, বিদেশি ব্রিটিশ চলে গেছে, কিন্তু সেনেকার এখনও পূর্ণ মহিমা নিয়ে আশ্চর্য জীবন্ত। ত্বক ও মনের লাভ্য রক্ষার এ এক অপূর্ব ভেষজ। বিদেশি প্রসাধনী এখনও এর কাছে পরাজিত।

মিয়ানমারের তরুণীর দীর্ঘ চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকে যেন তার কুমারীত্বের রক্ষক হিসেবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই চুল দীর্ঘ হয়ে পিঠ ছাড়িয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে

পড়ে। সেই খোলা চুলের সৌন্দর্যও এক প্রশান্তি। তার মধ্যে হয়তো বর্ণচোরা কেউ কেউ লুকিয়ে থাকে। থাকতে পারে। তারা তো বর্ণচোরা, আসল নয়। তারাও সেনেকার মাখে, খোলা চুলে পিঠ ঢেকে রাখে। জীবনানন্দ দাশ কি মিয়ানমারের তরুণীদের দেখে লিখেছিলেন, “চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য...”! দীর্ঘ চুল ও মুখে সেনেকারের কারুকাজ কি মিয়ানমার তরুণীর কৌমার্যের রক্ষাকবচ হতে পারে!

ওরা বলে, হ্যাঁ।

প্রাচীন-আধুনিক শহর মান্দালয়

১ জুন। সকাল সোয়া সাতটায় মিথিলা থেকে যাত্রা শুরু। তাল ও বাবলা গাছের রাজ্য। রুখু বালিময় মাটি। রাস্তার ধারে দোকানে মেয়েরা আড্ডা দিচ্ছে। গাড়ি থামলে তবেই তো খন্দের। গ্রামের খন্দেররাও তো জিনিস কিনতে এসে এক প্রস্থ আড্ডা মারবে। তবে ঠিক আড্ডা দিচ্ছে না মেয়েগুলো। কারণ ওরাই তো দোকানের বিক্রেতা-কর্মী। খন্দের না এলে বসে বসে গাল-গল্প করতেই পারে। ছোট শহর ওয়ান টোয়েন Waim Twin ছেড়ে গেলাম।

মিথিলা থেকে মান্দালয়ের দূরত্ব বেশি নয়। বাসে আমাদের লাগল চার ঘণ্টার মতো। ঘণ্টায় গড়ে ৩০ মাইল গিয়ে থাকলে ১২০ মাইল হবে। মান্দালয় বা মান্দালে ইরাবতী (Ayeyarwady) নদীর পূর্ব পাড়ে। প্রায় সোজা দক্ষিণ দিকে নেমে ইয়াঙ্গুনের কাছে ইরাবতী নদী মার্ভাবান সাগরে পড়েছে। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব দিকে মার্ভাবান, এদের মধ্যে যোগ রয়েছে। ইরাবতীর মুখে পদ্মা-মেঘনার মোহনার মতো অনেক ব-দ্বীপ রয়েছে। এই অঞ্চলটির সঙ্গে বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রচুর মিল রয়েছে। মৌলমিনকে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। চট্টগ্রাম জেলার অবস্থান মন স্টেটের মতো, পশ্চিম দিকে সমুদ্র। আমাদের মতো ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হয়, ঘূর্ণিঝড় হয় এখানে। সমুদ্রের সঙ্গে এই দুই নগরীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগর, মৌলমিনের মার্ভাবান সাগর।

মান্দালয়ে চলে যাই এবার। যাওয়ার পথে মান্দালয় শহরে দেখি বড় এক আধুনিক শপিং মল-এ এক মহিলা খাঁচা-ভর্তি অনেকগুলো চড়ুই পাখি নিয়ে যাচ্ছে। আমি তখনই ভেবে নিলাম এজন্যই তো এখানে পাখি এত কম। তাহলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নির্বিচারে পাখি হত্যার বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই? কে জানে! এসব চড়ুই ভাজা করে খায়। পথে পথে পাখি ভাজা বিক্রি করছে তো দেখছি।

মান্দালয় বার্মার কেন্দ্রভূমি। প্রাচীনকাল থেকে বার্মার রাজধানী মান্দালয় বা

কাছাকাছি শহর বাগান আরেকটি প্রাচীন রাজধানী। মান্দালয় সমতল ও অল্প পাহাড়ি অঞ্চলে ভরা। পশ্চিম দিকে পাহাড়ময় শান স্টেট। মান্দালয় বার্মার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। একে সংস্কৃতির শহর বলে গণ্য করা হয়। ভ্রমণকারীরা এখানে এসে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার অনুসন্ধান ও নিরীক্ষা করে। আমরাপুরা, ইনওয়া ও মিস্থুন মান্দালয়ের আশপাশেই রয়েছে। আমরাপুরা রেশমের শহর বলে পরিচিত। মিস্থুন যেতে হয় নৌ-পথে। অন্যান্য এলাকায় মোটর ও রেলগাড়িতে করে যাওয়া যায়। পিন-ও-লুইন হলো অদূরবর্তী পাহাড়ি রেল স্টেশন। আড়াই ঘণ্টায় গাড়িতে করে পৌঁছা যায়।

পথে গাড়ি একবারের বেশি আর থামল না। মান্দালয় প্রাচীন সুশৃঙ্খল নগরী। ব্রিটিশরা সুন্দর করে রাস্তাঘাট সাজিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, তাই এখনও মান্দালয়ের রাস্তাঘাট সুপ্রশস্ত, প্রাচীন বৃক্ষের বীথি বিস্ময় উদ্বেক করে। শিল্প নগরীটি দেখলাম বাসের জানালা দিয়ে। সবকিছু দেখা বা আমাদের দেখানো তো সম্ভব নয়। মান্দালয়ের পথঘাট দেখে দেখে ঢুকে যাচ্ছি। দেবদারুর বীথি সড়ক দ্বীপে। সবই একই উচ্চতার, একই গড়নের। রাতে বৃষ্টিতে ভিজ়ে চকচকে হয়ে আছে। জিজ্ঞরা গাছে মাঝে মাঝে হলুদ ফুল। কখনও পদাউক বীথি, হঠাৎ একটি গাছে তার সোনালি ফুলের গুচ্ছ। মাঝে মাঝে আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন নিয়ে মাথা তুলেছে আধুনিক অট্টালিকা। সাবেকি দোতলা বা একতলা ভবনগুলো একান্তই বর্মী। জাপানের ফুকুয়াকা শহরেও এ রকম, তোকিও শহরেও প্রায় তাই। ছাদের খাবড়া বা টাইল্‌স্‌, জানালা, বারান্দা বা বাইরের সজ্জা দেখলেই স্বকীয়তা ধরা পড়ে।

এগারোটায় পরিয়ন্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। এটি একান্তই বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণদের বিশ্ববিদ্যালয়। পালি ভাষায় এখানে উচ্চতর ডিগ্রি দেওয়া হয়। সারা দেশ থেকে ছাত্ররা আসে, এমনকি বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশগুলো থেকেও আসে। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক-ছাত্র সবাই এখানে থাকে। সঙ্গে কতক অতিথি ভবন আছে। দোতলা ভবন। প্রত্যেক কক্ষে চার জন। আমরা নিচের কক্ষে, মহিলারা দোতলায়। এক পাশে গণ-শৌচাগার। বড় জলাধারে পানি, তার থেকে মগে করে পানি নিয়ে স্নান। এক সঙ্গে চার-পাঁচজন মিলে স্নান করতে হয়। সামনের খোলা বারান্দায় রেলিং আছে। পেছনের খোলা বারান্দায় কাপড় শুকোতে দিতে হয়। তারপরেই গাছপালা-ঘেরা পেছনের অঙ্গন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শব্দ দূষণ নেই। পাঠাগার আছে। বাধ্যতামূলকভাবে সন্ধ্যায় হলঘরে গিয়ে প্রার্থনায় অংশ নিতে হবে। শিক্ষকদের খাওয়াও গণ-রান্না থেকে। ভিক্ষু-ছাত্রদেরও ছোয়াইং সময় মতো খেতে হয় খাওয়ার হলঘরে গিয়ে।

দু' রাত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার বা অন্যান্য সবকিছু দেখার সময় পাই নি। ভিক্ষু-ছাত্রদের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় বিকিরণ ও আমি কথাবার্তা অল্পক্ষণ বলে

যা জানতে পেরেছি তাও অসম্পূর্ণ। খুব ইচ্ছে ছিল লাইব্রেরিটা দেখার। পালি বা ত্রিপিটক পড়তে হলে এখানে আসা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পালিভাষা শিক্ষার মান স্বাভাবিকভাবেই এর থেকে অনেক নিচুতে।

খাওয়ার ডাক এলো। হলঘরের সজ্জা দেশের সর্বত্রই এক রকম। মেঝেয় বসে গোল টেবিলে পাঁচজন করে খাওয়া। স্যুপ, কাঁচা আমের ভর্তা, বালিয়াচং, বরবটি সেক্ধ, আলু দিয়ে মুরগির মাংস ও মাছ। জিন ওয়ে জা তো আছেই। অনেক দিন পর এ-বেলায় আলুর দেখা পেলাম। না, আলুর জন্য প্রাণ আইটাই করেছে বোঝাতে চাইছি না। আলু এখানে কম হয় হয়তো। খাওয়ার শেষে আম বা কলা থাকে। জিন ওয়ে জা ছাড়াও দুধ-চা এলো। মহিলারা পরিবেশক। টেবিলে বাটিতে বাটিতে সব সাজানো, শেষ হওয়ার আগেই ভর্তি করে দিচ্ছে। আমি কাঁচা লঙ্কা-পোড়া ভর্তা আয়েশ করে খেয়েছি। তার সঙ্গে কচি লেবুপাতা দারুণ। ফরাস বিনও ছিল।

খেয়ে এক ঘণ্টাও সময় পাই নি। অমনি ডাক পড়ল গাড়িতে ওঠার। এবার আর লটবহর সঙ্গে নিতে হবে না। এখানে দু' রাত থাকব। কাজেই ক্যামেরার কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাসের গহ্বরে ঢুকে পড়লাম। পায়ে সেই কুকুরে খাওয়া সাইকেল সু। একটার পেছনের ফিতে আছে, একটার নেই। কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে। করুক। জুতো খুলে রেখে গোল্ডেন টেম্পলের সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। এটি পরিয়ন্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই। আমাদের সঙ্গে এখন আরও দু' জন বাঙালি। পিন্টুর ভাই ও ভায়ের মেয়ে। ওরা মান্দালয়বাসী। ইয়াঙ্গুন থেকে খবর দিয়েছিল পিন্টু। খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছে। এই দু' দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওদের সঙ্গে এক দফা কথা হয়ে গেল সকলের।

গোল্ডেন টেম্পল অন্যান্য মন্দির থেকে একেবারে আলাদা ও অতুলনীয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ এটি রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কোনো ভিক্ষু এখানে থাকে না। ভূমি থেকে উঁচু এর মেঝে, একতলা সমান উঁচু। গোল বিশাল গম্বুজ ছাদের উপরে। এর নির্মাণ রীতি সিংহলীয়। হলের এক প্রান্তে প্রবেশপথ থেকে সোজা বেদির ওপর একটি বড় বুদ্ধ আছে। কাচের কাজ আছে দেয়ালে ও স্তম্ভে। ছাদে মুরল করা। দেখতে দেখতে সময় ফুরিয়ে গেল। বাইরে ঝঝঝকে কড়া রোদ, জষ্টি মাসের কাঁঠাল পাকার তীব্র গরম। খোলা বারান্দার মেঝেয় পা পুড়ে যাচ্ছে। আবার বাস।

মান্দালয় শহরের মাঝখানে গভীর পরিখা বেষ্টিত রাজবাড়ি এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে চলে গেছে। রাজা মিন্দন (King Mindon) ও প্রধান রানী সাতচারদেবী (Satkyardevi)। রাজা মিন্দন ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর রাজা থিবো (King Thibow) ও রানী সুফায়ালাত (Queen Suphayalat) ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত রাজত্বকালে এই প্রাসাদে অবস্থান করেন। এই রাজবাড়ি মূলত একটি প্রাসাদ-শহর। এখানে রাজার

প্রয়োজনীয় সবকিছু মজুত থাকত। প্রাসাদ-শহরটি ৮ বর্গমাইল। রাজবাড়ির চারদিকে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে ৫০-৬০ ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা রয়েছে, তারপরেই গভীর পরিখা জলে পূর্ণ। শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রাসাদ রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা। জাপানেও এ রকম রাজবাড়ি দেখেছি।

মূল প্রাসাদটি রাজপ্রাসাদ এলাকার কেন্দ্রে অবস্থিত। প্রাসাদ-শহরটির চারটি মূল দরজা, পূর্ব দিকের প্রবেশপথটি মূল গেট ধরা হয়। মূল প্রাসাদকে বলা হয় কাচের প্রাসাদ। এখানে পাটরানীর পবিত্র বা ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন হতো। রাজপুত্র ও রাজকন্যার একান্ত অনুষ্ঠানগুলো হতো। রাজকন্যার কান বিধানো যেমন। এখানে আছে ভ্রমরাসন (Bee throne), এটি কারাওয়ে কাঠের তৈরি। এটি রাজার ঘুমানোর জন্য রাজকীয় হেলানো চেয়ার বলা যায়। সিংহলে তৈরি। প্রধান চার রানী ছাড়াও রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাজমাতা, অন্যান্য ছোট রানী এখানে প্রবেশ করতে পারতেন অনুমতি নিয়ে। পূর্ব-পশ্চিমে এটি ১০০ ফুট দীর্ঘ, উত্তর-দক্ষিণে ৮৯ ফুট। ৬২ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু প্রাসাদ।

রাজকন্যার প্রাসাদ। সাধারণত বড় রাজকন্যা থাকত। তাকে সুন্দরী ও শিক্ষিতা হতে হতো। রাজা মিন্দনের কন্যা সালিন সুপায়া এখানে বাস করতেন। এটি সম্পূর্ণরূপে সোনার পাতে মোড়া বা সোনালি পদার্থ দ্বারা গিলটি করা। তিন তলা। পশ্চিম পাশে একটি ছোট কক্ষ আছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা মহিলাদের এখানে অপেক্ষা করতে হতো। এটি ৬৩ × ২৭ ফুটের প্রাসাদ, উচ্চতা ৮৪ ফুট ৩ ইঞ্চি।

বিজয় হলঘর। এটিও সোনার পাতে ও সোনালি রঙে মোড়া প্রাসাদ-ভবন। এর আকৃতি নেওয়া হয়েছে জায়দাউন বৌদ্ধ মন্দির থেকে। এজন্য এর নাম জায়দাউন জায়ুন। এখানে সম্মেলন ও আলোচনা সভা হতো। বিভিন্ন বিপদ বা কোনো কারণে রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে এখানে মন্ত্রণা চলে। একটি রাজহংস সিংহাসন আছে এই প্রাসাদ-ভবনের সম্মুখভাগে। কূটনৈতিক সভা ছাড়াও এখানে ধর্মীয় গুরুর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হত। শ্রাবস্তীর বৌদ্ধ বিহারের অনুরূপভাবে এটি নির্মিত এবং বুদ্ধকে এখানে বন্দনা ও পূজা করা হতো। এছাড়া ভাবী রাজার অনুষ্ঠানও এখানে হতো। এর দু' পাশের দুটি ছোট কক্ষে ধর্মীয় বই ও পাণ্ডুলিপি রাখা হতো। রাজা মাঝে মাঝে এখানে বসে পড়াশুনো ও বিশ্রাম গ্রহণ করেন। উত্তর-দক্ষিণে এটি ৫৩ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৭৩ ফুট দীর্ঘ। উচ্চতা ৫৩ ফুট।

বাউংদাউ সাউং (Baungdaw Saung)। এটি তিন স্তর ছাদবিশিষ্ট প্রাসাদ-ভবন। এটি রাজারানীর সকালে হাঁটার বারান্দার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এটিও সম্পূর্ণ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত প্রাসাদ-ভবন। এখানে রাজমুকুট, রাজপুত্র ও রাজকন্যার মুকুট ইত্যাদি রক্ষিত থাকত। এছাড়া নানা রকম মণিরত্ন ও মূল্যবান অলঙ্কার রাখা হতো।

রাজা এখান থেকে পছন্দমত মুকুট ও অলঙ্কারাদি নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন। একে রাজার সাজসজ্জা ঘরও বলা যায়। রাজার নিয়োগপ্রাপ্ত পদস্থ ব্যক্তিরাজার সঙ্গে দেখা করতে এলে এখানে অপেক্ষা করত, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজার আদেশ পাওয়া না যায় এখানে তাদের অপেক্ষা করতে হতো। উত্তর-দক্ষিণে এটি ৫২ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা। উচ্চতা ৫৩ ফুট।

এছাড়া আরও প্রাসাদ-ভবন রয়েছে। রান্নাবান্না, ভৃত্য, রানী ও রাজকন্যার পরিচারিকাদের কক্ষও রয়েছে। পুকুর, শাক-সবজি ক্ষেত, ধানক্ষেত, প্রাসাদরক্ষীদের থাকা-খাওয়ার জায়গা সবই আছে। আট বর্গমাইল এলাকা কি এই অল্প সময়ে ঘুরে দেখা সম্ভব! প্রাসাদ থেকে পেছন দিকে বেরিয়ে ভাস্তে শুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও আমি গাছতলায় ছোট্ট মিউজিয়ামের পাশে খোলা চত্বরের ভাসমান দোকানের ছাতার নিচে বসলাম। তেঁতুলের সুগন্ধযুক্ত টিনে-ভরা পানীয় খেলাম আমরা। দু' দিকে দুটি দোকান। বড় বড় ছাতা, মাথার ওপর বিশালকায় গাছ। পাশ দিয়ে রেলপথ চলে গেছে। একদিন এই পথে রাজা মিন্দন তাঁর প্রাসাদ-সীমায় ঘুরতেন। রাজকন্যা ও রাজপুত্র সাক্ষ্যকালীন বা জ্যোৎস্নারাত্রে আনন্দ উপভোগ করত। চোখের ওপর ভেসে উঠল ধবল জ্যোৎস্নারাত, রাজকন্যা একাকী বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাশে রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, রাজকন্যার মনের মানুষ তখনও এসে পৌঁছায় নি...। আমি কী করতে পারি!

মান্দালয় শহরের কেন্দ্রেই মান্দালয় পাহাড়। সেখানে আছে মিয়ানমারের আরেক বিস্ময় সুতাউংপিয়াই প্যাগোডা (Sutaungpyai Pagoda)। মিয়ানমারের প্রাচীন যুগের রাজারা শুধু কি প্যাগোডা নির্মাণের জন্য তাঁদের প্রতিভা ক্ষয় করে গেছেন। রাজ্যে যত পাহাড় আছে তার শিখরে মন্দির না থাকুক একটি চৈত্য অবশ্যই আছে। চৈত্যগুলোর রঙ সোনার বরণ, এজন্যই কি বার্মার প্রাচীন নাম গোল্ডেন ল্যান্ড বা সুবর্ণভূমি।

পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে বাস থামল। নেমে চড়ে বসলাম পিক-আপ গাড়িতে। দুটি গাড়িতে ভাগ হয়ে উঠলাম। দীর্ঘ চড়াই। দু' কিমির বেশি হবে চড়াই, পাকা রাস্তা, এক পাশে পাহাড় অন্যদিকে খাদ। খাদ গাছপালায় ভরা, পাহাড়ও গাছে গাছে ঢাকা। ঘন গাছপালার সৌন্দর্য উপচে পড়ছে। এক রকম গাছে ধূসর-সাদা রঙের ফুল ফুটে আছে। মাঝারি গাছ, ছোট ছোট ফুলের থোকা ডালের শীর্ষ দখল করে আছে। নাম জানি না। অনেকটা শাল ফুলের মতো। পাহাড় বেয়ে উঠছি আর আস্তে আস্তে মান্দালয় শহর দৃষ্টিসীমায় ভেসে উঠছে। মিন্দন রাজার বাড়ির প্রাকার দেখা গেল একবার, তারপর পাহাড় ঘুরতেই আড়ালে চলে গেল। ক্রমে নিচে দেখা যাচ্ছে শহর মান্দালয়। তার সৌন্দর্যের শেষ নেই।

সুতাউংপিয়াই প্যাগোডার পাদদেশে গিয়ে গাড়ি থামল। সামনে প্যাগোডায় ওঠার জন্য চলন্ত সিঁড়ি বা এ্যাসকেলেটর ঘর। মোট তিনটি এ্যাসকেলেটর। আরেক পাশে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পথ। প্যাগোডার পশ্চিম দিকে পাহাড়ের একেবারে নিচ থেকে হেঁটে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে। এই পায়ে-হাঁটা সিঁড়ির উপরে আছে চাল। সেদিক দিয়ে হেঁটে উঠতে হলে কতবার যে বসতে হতো কে জানে! সেই সিঁড়ির দীর্ঘ পথের দু' পাশে আছে দোকান।

এ্যাসকেলেটর থেকে নেমে প্যাগোডার চত্বরে পা দিতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন প্যাগোডা কর্তৃপক্ষ। মেজর ই তু না আমাদের সামনে এসে অকৃত্রিম অভিবাদন জানানো হাতে হাত মিলিয়ে, করমর্দন করে। সঙ্গে আছেন উ মা উহে। তিনি মন্দির পরিচালনা কমিটির বড় কর্তা। প্যাগোডায় ঢোকার সময় দিলেন ফুল, সেই ফুল বুদ্ধবেদির সামনে ঘটে দিলাম। সুতাউংপিয়াইকে সুন্দর বললে খুব কম বলা হবে। সমুদ্র থেকে ৭৭৬ ফুট উঁচুতে। প্যাগোডার চারদিকে ঘুরে ঘুরে পুরো মান্দালয় শহর দেখা যায়। রাজা মিন্দনের রাজবাড়ির তিন দিকের সীমানা দেয়ালের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। রাজবাড়ির প্রায় সম্পূর্ণটাই গাছে ঢাকা। এত সবুজ, এত নিবিড় সবুজ যে অরণ্য বলে ভ্রম হয়। উত্তর দিকে অদূরে পাহাড়, বিল ও প্রান্তর। রাতে চাঁদ উঠলে না জানি কত সুন্দর দেখাবে। কল্পনায় দেখছি বিশাল প্রান্তরে চাঁদ বুলে আছে এক পাশে, দিগন্তরেখার ওপরে, তার রৌপ্যভস্ম মাটি ভেদ করে জাগিয়ে তুলেছে ঝিঝিদের, ইয়েং পোকাগুলো গাইছে ইয়েং ইয়েং ইয়েং। সেই সুরে নাচছে প্রান্তর। জ্যোৎস্না ও চাঁদ এবং পরীরা সুতাউংপিয়াইকে ঘিরে নাচছে...।

পিটু চৌধুরী এখানেও অনেক চ্যা দান করল। প্রত্যেক প্যাগোডায় সে দান করে যাচ্ছে। প্রতিবারে দশ হাজারের কম নয়। দেবতাদের আবাহন করে সূত্র পাঠ করলেন তিন ভিক্ষু—ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ মহাথেরো, পরমানন্দ ভিক্ষু ও সুমনতিস্‌স ভিক্ষু। আমি চুপচাপ বসে আছি দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে চারদিকটা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। চারদিকের চত্বর চৌকো টাইল্‌স্‌ বসিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। হালকা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। সাবধানে পা ফেলে হাঁটছি। কী অপূর্ব চারদিক। গলা সমান উঁচু রেলিং। রেলিংয়ের সঙ্গে বসার জন্য উঁচু চেয়ার রেখেছে। ওতে বসে আয়েশ করে দূর দিগন্ত পর্যন্ত তাকালাম। ক্রমে ক্রমে সবাই এসে গেল। ততক্ষণ একা একা দৃশ্য উপভোগ করলাম। পূর্ব দিক থেকে ইরাবতী নদী নেমে এসেছে এঁকেবেঁকে। শহরের সঙ্গে কী সুন্দরই না লাগছে। কে জানত মিয়ানমার সত্যিই কুমারী ও এমন সমীহ আদায়কারী সুন্দরী!

প্যাগোডার মুখ পূর্ব দিকে, পেছনে পশ্চিম দিকে সুন্দর একটি ঘর বা পশ্চিম-খোলা ঘর। ওখানে চেয়ার পেতে আমাদের জন্য কোমল পানীয়, ফল ইত্যাদি

সাজিয়ে রেখেছে। রাজসিক ব্যাপার। প্রত্যেক টেবিলে চারজন। হেলান দেয়া সোফা। কাচের গ্লাস ও ঠাণ্ডা হরেক রকম পানীয়ের টিনে গরম হাওয়া লেগে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমেছে। আহা কী মধুর! চেরি ও আঙুর দিয়েছে। প্রকৃতির অপূর্ব শোভা রেখে কে খায় এত খাবার। আমি তাড়াতাড়ি এক চুমুকে এক গ্লাস তেঁতুল-পানীয় খেয়ে চলে গেলাম, রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছি। পশ্চিম দিকে এক দল মেঘ ছুটে আসছে দক্ষিণ থেকে। দেখতে দেখতে সেই মেঘ হয়ে গেল বিশাল দুর্দান্ত এক দল মোষের মতো, তেড়ে আসছে। পুরো দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশ দখল করেও ওদের জয়ের নেশা কাটল না। পুরো আকাশ দখল না করে ক্ষান্ত হবে না। ওদিকটা হয়ে গেল গাঢ় মসিকৃষ্ণ। ওখানে ঝড় চলছে, ধুলো উড়ছে, বিশাল পশ্চিম প্রান্তরে। মেঘের খেলা দেখার এমন সুযোগ আবার কবে যে পাব! রাজা মিন্দনের রাজবাড়ির পাশ কাটিয়ে মেঘেরা দক্ষিণ থেকে পশ্চিম প্রান্তর চেষ্টা, হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের গহ্বরে। দিগন্ত যেন ওদের গ্রাস করার জন্য মুখ খুলে আছে। এভাবে পশ্চিমে যেতে যেতে ওরা টেকনাফ ও কক্সবাজারে পৌঁছে যাবে। সে রকম শক্তি নিয়েই ওরা ছুটছে। প্যাগোডার পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে চেরি পৈ, গাছে পাতা তেমন নেই, শুধু ফুল আর ফুল। হালকা গোলাপি, কিছু ফুল বাসি হয়ে আরো হালকা হয়ে গেছে। এবার ডাক পড়ল। যাওয়ার সময় হয়েছে। এবার কোথায় যাব, জানি না। ঝাঁকের পাখি ঝাঁকের সঙ্গেই উড়বে। পাখাহীন গৃহপালিত পাখি।

মহামুনি বিহারে যখন পৌঁছলাম সেটা আরেক বিস্ময়। এখানে প্রত্যেকটি বিহার বা প্যাগোডা একেকটি কমপ্লেক্স। একটির মধ্যে অনেকগুলো বিহার ও অসংখ্য বুদ্ধ। প্রত্যেকটি বুদ্ধের আলাদা বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এরা কি সৃজনশীল শিল্পসত্তাকে আজও এই প্যাগোডা তৈরিতে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করে রেখেছে? যুগ যুগ ধরে শুধু এই কাজই করেছে? ধর্ম ছাড়া আর কিছুই জানার চেষ্টা করে নি?

লম্বা হলঘরের মতো বারান্দা পেরিয়ে চলে গেলাম শাক্যমুনি বুদ্ধের কাছে। ভক্তরা বসে প্রার্থনা-ধ্যান করছে। আমাদের তো আবার বিশেষ মর্যাদা, বিদেশি আমরা। মন্দির বড় নয়, বরং ছোটই বলব। এই মূল মন্দিরের মাঝখানে উঁচু বেদিতে বুদ্ধ বসে আছে, সেই বেদিতে উঠে গেলাম ঘুরে ঘুরে। বিহার কর্তৃপক্ষ সামনে। বুদ্ধের শরীরের কাছে চলে গেলাম। আমাদের হাতে তুলে দিল কাগজের ভাঁজে রাখা পাতলা সোনার পাত। ওই যেমন পাতলা রাস্তা। কাগজের ভাঁজ খুলে তার থেকে সোনার পাতলা পাত খুলে বুদ্ধের শরীরের যেখানে হালকা কালচে হয়ে আছে সেখানে লাগিয়ে দিতে হবে। মহাধেরো সবার আগে। পিন্টু চৌধুরী প্রার্থনা করছে নিচে বসে। ওর ছবি নিলাম। দেবী, মীরা, আলপনা, স্মৃতি, অমিতা, প্রীতিকণা নিচে বিষণ্ণমুখে।

খুব খারাপ লাগল যে এখানে নারীদের ওঠা নিষেধের নোটিশ দেখে। মিয়ানমারে এই একটি জায়গা বা বিহার পেলাম যেখানে মেয়েরা ঢুকতে পারে না। ঢুকতে পারে, বুদ্ধের কাছে গিয়ে সোনার পাত শরীরে লাগাতে পারে না। শোয়েডাগ প্যাগোডায় পারে। সেখানে এভাবে সিঁড়ি বেয়ে বেদিতে উঠতে হয় না। শ্রীতি, দেবী, অমিতা, স্মৃতিরেখা, মীরা, আলপনা বন্দনা করতে বসেছে। সমবেত প্রার্থনায় বসল সবাই।

মহামুনি বুদ্ধের প্রতি মিয়ানমারবাসীদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি গভীর। তারা মনে করে একমনে প্রার্থনা করলে মহামুনি কাউকে বঞ্চিত করে না, যে-কোনো প্রার্থনা পূরণ করে।

এটা বিশ্বাসীদের কথা। আমার তো এত সহজে মন ভরে না, আমি পারি না। কিন্তু এত সুন্দর পরিবেশ যে মন এমনিতেই ভরে যায়। এত প্রকোষ্ঠ, আর প্রতি প্রকোষ্ঠে চকচকে সোনা, পেতল বা কাসার বুদ্ধ। খুঁটে খুঁটে দেখব সেই অফুরন্ত সময় কোথায়? পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। তবে না, এখানে আছে সুন্দর দোকানপাট। মন্দিরের সঙ্গে পরিকল্পনা করে দু' সারি পাকা দোকানঘর। মহিলারা, তাদের স্বামীদের নিয়ে প্রথমে আক্রমণে নেমে পড়ল। তারপর সবাই। আমিও ঢুকে পড়লাম একটি দোকানে। পাথর কেটে হাতি বানিয়েছে ভারি সুন্দর। বুড়ো আঙুলের সমান সাদা-সবুজে মেশানো পাথর কেটে করেছে হাতি, ঘোড়া, পেঁচা, ব্যাঙ, কচ্ছপ ইত্যাদি। আর ওই পাথরের আংটি। চোখ ফেরানো যায় না। মুঠো করে এক গাদা নিয়ে দাম জিগ্যেস করলাম। বর্মী মহিলা দাম হাঁকল আট হাজার চ্যা। দরাদরি তো এখানে আইনসিদ্ধ। কিন্তু সিকিভাগ নাকি আধাআধি থেকে শুরু করব তা তো জানি না। পিস্টুর দাদাকে ধরে নিয়ে এলাম। সে দরদস্তুর করে কিনে দিল। কিন্তু বিভিন্ন রকম দামি পাথর পেলাম না। শেষ পর্যন্ত এক সেট পেলাম। রুবি পাথরের।

ওদিকে গিয়ে ব্রোঞ্জের শাক্যমুনি বুদ্ধ নিলাম। একটি-দুটি-তিনটি করে বেশ কয়েকটি হয়ে গেল। বার্মার শ্বেতহস্তী তো পাব না তাই বিশাল শ্বেতহস্তীকে পাথরের শিল্পকর্মে ছোট করে কাঁধের থলেয় ঢুকিয়ে নিলাম। অনেকগুলো হল। ওরা জানান দিচ্ছে ভেতর থেকে। আমি কল্পনায় ওদের বৃহন্ন শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, কাঁধের থলে বেশ ভারি হয়ে উঠছে। মহামুনিও কি বড় হয়ে যাচ্ছে? কত বড় হবে? জীবন্ত সোনার পাতে মোড়া চকচকে ধ্যানী চোখওয়ালা তিনতলার ছাদ-ছোঁয়া বুদ্ধের সমান? থলের মধ্যে আমার যত সম্পদ। ক্যামেরার বাড়তি জুম লেন্স, নানা রকম কলম-পেন্সিল, নোটখাতা, মাইন্ড সেভেন সিগারেট, দেশলাই, মিচিও তাকেয়ামার 'হার্প অব বার্মা' উপন্যাসটিসহ অন্যান্য বইয়ের তালিকা, মিয়ানমারের মানচিত্র ও চশমার খাপ, জরুরি ওষুধপত্র, মোষের শিং-এর একটা চিরুনি, পকেট ঘড়ি, নোখ কাটার যন্ত্র ইত্যাদি আর কি!

ওদিকে সবাই কেনাকাটা করছে। এই সুযোগে তেঁটাটা মিটিয়ে আসি। বাইরে পেলাম আইসক্রিম। তাই-বা কম কি! তারপর মাইন্ড সেভেন। তোকিও শহরে ওটা আমাকে খুব সঙ্গ দিয়েছিল ১৯৮২ সালে। এখানে বিজ্ঞাপন দেখে জানতে পারলাম। সব জায়গায় পাওয়া যায় না। ওদিকে পাথরের, গ্রাস, বাটি, থালা ইত্যাদি আছে। দেখলাম। বড্ড ভারি, বয়ে নেওয়া কঠিন। এগুলো ঘরে ব্যবহারের জন্য। গরমের দিনে পাথরের থালায় ফল রাখলে চমৎকার ঠাণ্ডা থাকে। যারা ফ্রিজের ঠাণ্ডা খেতে পারে না তাদের জন্য।

মিয়ানমার কুটির শিল্পে অনেক এগিয়ে আছে। দারুশিল্প, মূল্যবান ও সাধারণ পাথরশিল্প, সোনার গয়না, মূর্তিশিল্প, বেতের কাজে ঈর্ষণীয় দক্ষতা অর্জন করেছে। প্যাগোডার আশপাশের দোকান ঘুরলেই বোঝা যায়। আমাদের মতো প্লাস্টিক শিল্পের দিকে গণ্ডারের গৌ ধরে ছোটো নি।

সকলকে টেনে নিয়ে আসতে হলো। আমাদের দুই গাইডের একজনের বোনের দোকান আছে। ওখানে গিয়ে সবাই কিনছে বলে তারও তাড়াহুড়ো কম। অন্য কিছু তো আমি কেনাকাটা করব না। আমার দরকার বিচিত্র বুদ্ধ, কম দামের পাথরের কিছু জিনিসপত্র আর কিছু বই—মিয়ানমার সম্পর্কে এবং মিয়ানমার সাহিত্য যদি ইংরেজিতে থাকে। না থাকারই কথা। আমাদেরও যেমন নেই, ওদের তো আরও থাকবে না। তবে মিয়ানমার সম্পর্কিত বই তো থাকবে। আর কুমারী ও যুবতীদের হাসি। সেই অর্থে আমি অনেক হাসি সংগ্রহ ও বুক পুরে নিয়েছি। ওদেরও হাসি ছড়াতে কোনো কার্পণ্য দেখি না। আমি শুধু কুড়িয়েছি, বুক ও থলে ভরে গেছে।

মান্দালয়ে জুনের প্রথম রাত্রি। বৃষ্টি হচ্ছে এদিকে-ওদিকে। পরিয়ত্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয়। আমাকে ডেকে নিলেন মহাথেরো। তাঁর জন্য থাকার জায়গা আলাদা একটি ঘরে। এয়ার কন্ডিশন করা। তিন ভাস্তে ও সেবক পুলক থাকেন। আরও দুটি কক্ষ খালি পড়ে আছে। একটিতে আমাকে যেতে হলো দলনেতা মহাথেরোর নির্দেশে। সুমনতিস্‌স ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খালি পেটেও যা-কিছু খাচ্ছেন বমি হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত কোনো খাবার খাওয়ার সময় ঘেন্না জন্মেছিল, অপছন্দের খাবার থেকে হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তি আসে। তাই হয়েছে। কেবল বমি করছেন। কাজেই তিনি সকালে আমাদের সঙ্গে বাসে করে বের হতে পারলেন না।

পরদিন সকাল সাকাল হলঘরে একসঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাজা মিনদনের রাজবাড়ির পরিখার পানি টলটল করছে। পাশে দেবদারু বীধি গত রাতের বৃষ্টিতে নেয়ে রূপসীর সেরা রূপসী হয়ে উঠেছে। দু'-একজন প্রাতঃর্মণবিলাসী তার নিচ দিয়ে নেচে নেচে ছুটেছে। একা মহিলা ও তরুণী আছে। ঝকঝকে পথ ও ফুটপাথ। এত পরিচ্ছন্ন শহর আমাদের কাছে অকল্পনীয় মনে হয়।

ইরাবতী নদী পেরিয়ে উ পঞ্ঞাসি প্যাগোডার পাহাড়ের নিচে গিয়ে থামল গাড়ি। ওখানে অপেক্ষা করে আছে ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া দুটি পিক আপ ভ্যান।

দু' পাশে বেষ্টিত পাতা। এ রকম যানবাহনে শহরের মানুষ যাতায়াত করে। পাহাড়ে বাস উঠতে পারে না। আমরা পিক আপে সওয়ার হয়ে উ পএএসি প্যাগোডায় উঠলাম। গাড়ির রাস্তা ছাড়াও এখানে যথারীতি সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পথ আছে। সেই সিঁড়িতে আগাগোড়া টিনের চাল। সিঁড়ির দু' পাশে দোকান তো আছেই। খুব ইচ্ছে করে এ রকম সিঁড়ি বেয়ে উঠি। কিন্তু গাড়িতে করে ওঠার সময় ও উচ্চতা হিসাব করে বুঝতে পারি ওই সিঁড়ি-পথে কী পরিশ্রম হবে। হৃৎপিণ্ডের ওপর কতখানি চাপ পড়বে, রক্তচাপ কী মাত্রায় বেড়ে যাবে।

প্যাগোডা কর্তৃপক্ষ আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহণ করলেন। ভিক্ষুরা নিজ কাজে ব্যস্ত। সদালাপী সহাস্য সামরিক কর্তা তো আছেই। সেই সঙ্গে প্রহরারত সৈনিক। বড় একটি বুদ্ধ তো থাকবেই। বেদি ও দেয়াল সুসজ্জিত। মেঝে মোজাইক করা। প্যাগোডার চারদিকে সুপরিসর চত্বর। বেরিয়ে পড়লাম। ছবি তুলতে গিয়ে দেখি অদূরে এক মহিলা বসে আছে সামনে খাঁচা নিয়ে। কী হতে পারে খাঁচায়? ছুটে গেলাম সতর্ক খালি পায়ে। বৃষ্টি পড়ে ভিজ়ে আছে টাইল্‌স বসানো চত্বর। খুব পিছল। অন্তর থেকে নাকি বাইরে থেকে কে যেন ধমক দিল।

খাঁচার ওপর বসে আছে বুক সাদা পেঁচা। বেশ বড় তবে ভুতুম থেকে ছোট। তার পায়ের নিচে চড়ুইরা খাঁচায় চিপচিপ করছে। অনেক চড়ুই। পঞ্চাশ একশ' হবে তিনটি খাঁচায়। ছবি তুলে নিলাম। পিন্টু চৌধুরী পাশে। একটা একটা করে কিনে মুক্ত করে দিলাম। চারটা কিনেছি আট চ্যা দিয়ে। কোলকাতার পাখিবন্ধু নূরের কথা মনে পড়ল। নূর নবী মোল্লা নিজের কষ্টার্জিত টাকায় বাজার থেকে পাখি কিনে সেই পাখি আকাশের ঠিকানায় ছেড়ে দেন। কারণ তার নিজের, ভাইয়ের ও কাকার তিনটি ছেলে একদিন পাশের বাড়ির পুকুরে অল্প পানিতে ডুবে মারা যায়। একদিন নূর স্বপ্নে শুনলেন, 'কাউকে বাঁচাও।' নূর কাকে বাঁচাবে? নিজের সন্তানই মরে গেল, সঙ্গে আরো দুটি তরতাজা ছেলে। তিনি গরিব, কাপড়-চোপড় সেলাই করেন, তাঁর ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু ওই যে স্বপ্নে শুনছিলেন, 'কাউকে বাঁচাও', সেই থেকে পাখিদের ছেড়ে দিয়ে বাঁচাচ্ছেন। আসিব, আবদুল্লাহ ও চিন্টু। আসিব নূরের ছেলে, বয়স ছিল আট। আবদুল্লাহ বড় ভায়ের ছেলে, নয় বছর। চিন্টু কাকার, দশ বছর। এরা পানিতে ডুবে মারা যায়। একই সঙ্গে।

পাখি কিনে নিয়ে খাঁচা খুলে প্রত্যেকটি পাখিকে নূর বসিয়ে দেন ওদের কবরের ওপর। পাখিরা মুক্তি পেয়ে প্রথমে খতমত খেয়ে যায়, এদিক-ওদিক চায়, তারপর ফুড়ুৎ। কিন্তু কবরে বসিয়ে দেওয়ার আগে পাখিদের কানে কী যেন বলে দেন। কী বলেন?

বলেন, 'বলি, হে রাজা, হে আল্লাহ, কিছু ভালো কাজ তো করতে পারি নি। পাখিদের আজাদ করে দেওয়া ভালো কাজ কিনা তাও জানি না। তবে যদি তুমি মনে করো এটা ভালো কাজ, তাহলে আমাদের বাচ্চাদের ভালো রেখো।'

এই খবর পত্রিকা মারফত জানতে পারেন কানাডার সুন্দরী ডেরোনিকা। তিনি কানাডা থেকে ছুটে আসেন কোলকাতায় নূরের কাছে। এই বিষয়ে তিনি শিশুদের জন্য গল্প লিখবেন, ছবি আঁকবেন। আমার 'ও বৃক্ষ, ও নিসর্গ' বইতে এই কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। পাখিদের আজাদ করে দেওয়ার মতো ভালো কাজ আর কী হতে পারে? কিন্তু মিয়ানমারের পথে পথে বাস থামার পর দেখেছি ঠোটসহ আস্ত পাখি-ভাজা বিক্রি হচ্ছে। একদিকে আজাদ করে দিচ্ছে এই উ পঞ্প্রসি প্যাগোডায়, অন্যদিকে পাখি খাওয়ার প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা। মনটা ভারি হয়ে গেল। এত সুন্দর প্যাগোডার পরিবেশ, পাখি ছেড়ে দেয়ার এমন মহৎ কাজ! কিন্তু একজন বলল, আবার এই পাখি ধরা পড়বে, আবার বিক্রি হবে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, অথবা খাদ্য হবে। এই ধর্ম, ব্যবসা ও খাওয়ার প্রতিযোগিতা! মানুষের হাতে পাখিরা কত অসহায়!

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পাশের সেনেকার কাঠ বিক্রির দোকানে গেলাম। তিন-চার ইঞ্চির টুকরোগুলো সাজিয়ে বিক্রি হচ্ছে। এগুলো পাথরে ঘষে মুখে-হাতে লাগায়। এসব মিয়ানমারে প্রচুর পাওয়া যায়, প্রত্যেক নারী ও ছোট ছেলেরা মুখে-হাতে-পায়ে মাখবেই। পাশে বেতের ছোট ছোট বুড়ি। ওসব ফেলে এগিয়ে গেলাম। ডানে প্যাগোডা, বাঁয়ে রেলিং। অন্তত সত্তর-আশি ফুট চওড়া চত্বর প্যাগোডার চারদিকে। নিচে মান্দালয় শহর সকালের হাওয়ায় ভাসমান রোদ পোহাচ্ছে। সামনে সিঁড়ির মুখে ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ মহাথেরো দাঁড়িয়ে আছেন। উপভোগ করছেন সৌন্দর্য। ভাবছেন নিজের হাতে গড়া ফেলে আসা ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের কথা।

নিচ থেকে সোজা সিঁড়ি উঠে এসেছে। ওপরের শেষ মাথায় একটি চায়ের দোকান। প্যাগোডার চত্বর থেকে সাত-আট ফুট নিচে। মা, দুই মেয়ে ও এক ছেলেতে মিলে দোকান করেছে। দুই মিলিটারি যুবক চা খাচ্ছে। মহাথেরো ও পিন্টুসহ চায়ের দোকানে নামলাম। চা খেলে যদি মনের পাখি-বিষয়ক বিষণ্ণতা কাটে। মহাথেরোও বললেন চা খাবেন। নুডল্‌সের মতো মুচমুচে ভাজা খাবারের প্যাকেট কিনল পিন্টু। মাটির প্রলেপ জড়ানো দুটি ডিম কিনলাম। সেদ্ধ ডিম। এভাবে সিকি ইঞ্চি পুরো করে সাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে সেদ্ধ করা ডিম বোধকরি কয়েকদিন ভালো থাকে। ওদের কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারি নি। কারণ ভাষা। মহিলা চা বানাচ্ছে। তার এক মেয়ে সেনেকার ঘষছে পাথরের ওপর। মুখে মাখবে। দিনের শুরুতে মাখার নিয়ম। চা এলো। মহাথেরোর জন্য চিনি ছাড়া। টিনের ঘন দুধ ও চিনি দিয়ে বানানো চা আমার জন্য। পিন্টুও খেল। না, চায়ের স্বাদ এখানে কোথাও জমছে না। তার চেয়ে ওই যে বিনি পয়সার চা জিন ওয়ে জা অনেক ভালো।

বসে বসে মেয়েটি সেনেকার ঘষছে। মুখে লাগাচ্ছে। দোকানের মাঝখানে

একটি গাছের চারদিকে বাঁধাই করা বড় গোল চত্বর। হাঁটু সমান উঁচু বেদি। তার চারপাশে বেশ বড় জায়গা নিয়ে চায়ের দোকান। সঙ্গে সিগারেট, চুরুট, টুকিটাকি জিনিস। খাবার জিনিসও আছে। কুড়ি-পঁচিশটির মতো চেয়ার এবং টেবিল। মাথার ওপর টিনের ছাউনি। বকুল গাছটি মাঝখানে। প্যাগোডার চত্বরের সঙ্গে সিঁড়ির পাশে এই দোকান। ওখান থেকে বেশ কিছু দূর দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি নেমে গেছে। তারপর তো নিচে ও অদূরে মান্দালয় শহর আছেই।

আমি গিয়ে তরুণী মেয়েটির কাছে বসলাম। সে ততক্ষণে সেনেকার বেটে নিজের কাজ শেষ করেছে। আমি ওর থেকে দেখে সে-রকম করে পাটার ওপর ঘষছি। একটু পানি দিতে হয়, সাদা চন্দনের মতো হয়ে যাচ্ছে। পরিমাণমতো বেটে সামনের আয়নায় দেখে দুই গালে লাগলাম। চমৎকার ঠাণ্ডা একটা মনোরম অনুভূতি পেলাম। মেয়েরা ও মা হাসছে। ওদের ভাষায় কথা বলছে। সৈনিকটিও যোগ দিল। একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। ঠাণ্ডা অনুভবে মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। মহাধৈর্যে অনুমোদন দিয়ে হাসলেন। পিন্টু চৌধুরী টাকা দিল। পাশের দোকান থেকে সিগারেট নিতে হলো দোকানির আগ্রহে। নেওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। পিন্টু ভাস্কের জন্য দু' প্যাকেট বর্মী চানাচুর জাতীয় খাবার কিনে দিল। আমার কাঁধের থলে আরেক দফা ভারি হলো। রাজ্যের টুকিটাকি ওখানে জমেছে। পরিয়ন্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ওটাকে ভদ্রস্থ করে নিতে হবে। আর ওই মাটি-জড়ানো দুটি ডিমও নিলাম, পরে স্বাদ নেব বলে।

কামুউদ প্যাগোডায় পৌঁছলাম দশটায়। আবার সমবেত প্রার্থনা, পঞ্চশীল গ্রহণ। দিনে এতবার পঞ্চশীল নেওয়ার কানো দরকার নেই। তবুও গতানুগতিকতা করে যেতেই হয়। শোক-রোগ থেকে মুক্তি, দেবতাদের আবাহন কত কী নিয়ম! এই প্যাগোডাকে রাজামুনি চুল ফয়া বা কামুউদ বলে। ১৬৩৬ সালে নির্মিত। সম্পূর্ণ হতে ১২ বছর সময় লাগে। প্যাগোডার উচ্চতা ২১০ ফুট। পঞ্চধাতুর নির্মিত বুদ্ধ। লোকের বিশ্বাস এখানে যা প্রার্থনা করা হয় তা মেলে। শ্রীলঙ্কা থেকে সে সময় এখানে গৌতম বুদ্ধের দন্তধাতুর অংশবিশেষ আনা হয়। নকশা শ্রীলঙ্কার। মন্দিরে ঢোকান মুখের দেয়ালে কাচের জমকালো কারুকাজ। স্তম্ভও সে-রকম। তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পঞ্চধাতুর জমকালো বুদ্ধ। দেখে চোখ ও মন ভরে যায়।

এখানে ১১টায় দুপুরের খাওয়া। আমাদেরও ভিক্ষুদের সঙ্গে একবারে খেয়ে নিতে হয়। ভাতের পর এলো লেপ্ পে ছউ। কাঁচা সবুজ চা পাতা ভিজিয়ে নারিচ শাকের মতো করে ছোট বাটিতে পরিবেশন করেছে। এই পাতা ঘুম দূর করে, হজম শক্তি বাড়ায়। সঙ্গে ট্রের মধ্যে বাটির মতো খাপে খাপে চার রকম শিম বিচি ও বাদাম ভাজা এনে দিল। লেপ্ পে ছউ ভাতের পরে একই টেবিলে বসে খাওয়ার নিয়ম। সঙ্গে বিস্কুট আছে। এই দ্বিতীয়বার লেপ্ পে ছউ খেলাম। গ্রামে গুনতাম

বার্মা গেছি, লেপ্ পে ছটু খেয়েছি? বর্মা-ফেরত লোকেদের বলতে শুনতাম ছেলেবেলায়। এখন খেলাম। একটু তেতো স্বাদ। শুনেছি বর্মীরা প্রচুর মিষ্টি খায়। কিন্তু কই, কোথাও দেখি নি মিষ্টি।

বাইরে বেতের তৈরি সামগ্রীর চমৎকার দোকান। বেতের বালিশ, ঝুড়ি, চিনলোন বল, মেয়েদের ফ্যাশনদার হাতব্যাগ বা পাউজ, পাদানি, টুপি, অর্কিড ঝোলানোর জন্য টব, ট্রে, পিঠ চুলকানোর হাত, দেয়ালে ঝোলানোর ঝুড়ি ইত্যাদি কত কী! পিঠ চুলকানোর জন্য দুটো হাত কিনলাম। কাঠের তৈরি, ভারি সুন্দর। আমার আবার খুব পিঠ চুলকায়। আর বেতের ঝুড়ি, ফ্লাস্কের মতো। কাঁধে ঝোলানো যায়। বর্মীরা এতে ঠিকুজি, কোষ্ঠীপত্র ইত্যাদি রাখে। এতে পানির বোতল নিয়ে কাঁধে ঝোলানো যাবে। মোয়ে মোয়ে সানের (বিখ্যাত নারী চিনলোন খেলোয়াড়) চিনলোন বল নেওয়া হলো না। ভ্রমণপথে বেশি জিনিস কেনা খুব সমস্যা। আমি এড়াতে চাই কিন্তু এমন এমন সব সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় যে লোভ হয়। কিন্তু লোভ সামলে নিলাম। ওদিকে রূপোর জিনিসপত্র, প্যাগোডার বড় বড় ফটো, ভিউকার্ড—কত কী!

বারোটায় বুদ্ধ মিউজিয়ামে এলাম। সম্ভবত এটা কামুউদ সাগাইন জেলা। আমাদের গাইড বলেও দেয় না কোথায় এলাম। বারবার জিগ্যেস করে এত সব জেনেছি। ইংরেজি পুস্তিকাও খুব কম। সব প্যাগোডায় থাকে না। মিউজিয়ামে কত জিনিসই না থাকে। এক পাশে সব কাঠের জিনিসপত্র। প্রাচীনকালের কাঠের বুদ্ধ, প্লাস্টার অব প্যারিসে করা প্রাচীন মূর্তি। তালপাতার পুঁথি ও ড্রিপিটক, প্রাচীন কাঠের বাস্র, কাঠের ছাবাইক বা ভিক্ষুদের ভিক্ষাপাত্র। আবার কত ধরনের কাঠের কাজ! পালঙ্ক, পালকি, সিন্দুক, ঘরের কার্নিস, কাঠে প্যাগোডার চূড়ার কারুকাজ, দরজা-জানালা ও খিলানের কাজ। প্রাচীন চিত্রপট, ফ্রেমে বাঁধানো রাজা-রাজড়ার চিত্র। কিন্তু ছবি তোলা নিষেধ। কেন সে ছবি তুলতে দেয় না বুঝতে পারলাম না। রাজা থাইবাউ (Thaibaw) ও তাঁর রানীর ছবি ফ্রেমে বাঁধানো আছে। এক পাশে অনেকগুলো প্রাচীন মং। এগুলো বৌদ্ধ মন্দিরে ও প্যাগোডায় ঘণ্টা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মং (Moung) হলো পাড় তোলা কাঁসা বা পেতলের বড় থালা, থালার পিঠের মাঝখানটা উঁচু থাকে। দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে পিঠের উঁচু জায়গায় কাঠের দণ্ড দিয়ে পিটিয়ে ঘণ্টা ঘোষণা করা হয়। বিশেষ করে সন্দের সময়-ঘোষণা করার কাজে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ বিহারে আগে মং ব্যবহার করা হতো। আমি ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের ইছামতী ধাতুচৈত্য বিহারে এর ঘণ্টাধ্বনি শুনতাম। চট্টগ্রামে এর নাম ভং। শব্দও হয় ক্যাংসনন্দিত ভং...ভং...ভং...। সন্দের আধার ঘনিয়ে আসার আগে বেজে উঠত। গৃহস্থেরা এই শব্দ শুনে দরজায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়ে দিত। আমরা বিলে বা রাস্তায় খেলা ফেলে ঘরে ফিরতাম। দেরি করলে ঘরে জুটত বকুনি অথবা পিটুনি। ছেলেবেলায় মা মারা গেছে। বাবার স্পষ্ট নির্দেশ ভং বাজার সঙ্গে

সঙ্গে ঘরে দৌড় দিতে হবে, সঙ্গে বাতির মুখে ভং...ভং...ভং..., ঘরে ফেরা চাই-ই চাই...।

মিয়ানমারের সব প্যাগোডার মাথার ওপর থাকে অনেকগুলো ঘণ্টা, শোয়েডার্গতে সাত সারি ঘণ্টা আছে। তার পটচিত্র আছে মিউজিয়ামে। প্রাচীন কোনো রাজার ঘরে ব্যবহৃত বিশাল পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে। পাথরের কিছু বুদ্ধ আছে। সবকিছু বড় অথুত্বে রাখা। প্রাচীন মুদ্রা, সমকালীন বিশ্বের মুদ্রা ও কাগজের নোট আছে। সবই একনজরে দেখে শেষ করতে হচ্ছে। সময় ছুটছে মহাকালের গর্ভে।

সবচেয়ে মজা লাগল 'ইচ্ছাপূরণ পাথর' দেখে। এই পাথর হাতে তুলে ইচ্ছে প্রকাশ করতে হবে মনে মনে। তারপর রেখে দিন। ব্যাস্, আপনার ইচ্ছে পূরণ হবে। আমি আমার দূরদেশি তরুণী বান্ধবীর সাক্ষাৎ কামনা করছি। আমি জানি না কবে ওর সঙ্গে দেখা হবে, আমার ইচ্ছে কবে পূরণ হবে? তবে এও জানি ওর সঙ্গে দেখা হবে, দু'-এক বছরের মধ্যে সে হয়তো একবার আসবে বাংলাদেশে। হে ইচ্ছাপূরণ পাথর, তুমি আমাকে ওর সঙ্গে দেখার সুযোগ করে দিও, আর কিছু না, শুধু চোখের দেখা। অকৃত্রিম ও নিষ্পাপ বন্ধুত্ব।

ইচ্ছেপূরণ পাথর হাত থেকে নামাতে না নামাতেই ডাক পড়ল। শুধু একটি মাত্র ইচ্ছেই জানানো যায়। হায় হায়, আমার বউ ও ছেলে-মেয়ে কি বলবে? মেয়ে বলবে বাবা, তুমি এত নিষ্ঠুর? বউ বলতে পারে, এমন সৃষ্টিছাড়া ইচ্ছে তোমার কেন? জগতে তোমার চাওয়ার আর কিছু নেই? বোলো, মহামুনি বুদ্ধের কাছে কি চেয়েছ? শোয়েডার্গ প্যাগোডার সেই বিশেষ জায়গায় বসে কী ইচ্ছা ব্যক্ত করেছ? না, তোমাকে কোথাও একা ছাড়া বড্ড ঝামেলা। আবোল-তাবোল জিনিস চাও, জীবনের প্রয়োজন ওই বন্ধুকে দেখা, এবং শুধুই দেখা? অন্য কিছু নয়তো?

আমি কি করব? তখন যে আমার মনে পড়েছে ওর কথা। তোমাদের জন্য অনেক কিছু অনেক জায়গায় চেয়েছি। ওই গোল পাথরটা এমনিতেই খসখসে, ধূসর কালচে রঙের, এমন আহামরি কিছু নয়, পাথরটা হয়তো শুধুই পাথর। মানুষের কানে এত কথা বলে কিছু হয় না, পাথরকে বলে কি কিছু হবে বলে তোমার মনে হয়? এই পাথরের কি প্রাণ ও মন থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা?

আমার বউ বলবে, পাথরের কথা নয়, আমি তোমার ইচ্ছের কথা বলছি। ইচ্ছের শ্রী-হাঁদ।

দ্রুত আমাদের শেষ করতে হলো মিউজিয়াম দেখা। ছোট মিউজিয়াম, জিনিসপত্রের ঠাসা। তার ওপর সময় ঠেসে বসেছে, দশ মিনিটে দেখা শেষ করতেই হবে। হয়েছে, তবে কুড়ি মিনিটে। সকাল থেকে তিনটি প্যাগোডা দেখা হলো। এবার বোধহয় ফিরতে হবে পরিয়ন্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাস চলল। পথে মাঝে মাঝে চাকমা নারীদের মতো পিনন পরা মেয়ে দেখলাম। ওই যে কালো কাপড়ের

ওপরে ও নিচের দিকে লাল পাড়। পাড় তো থাকে কাপড়ের প্রান্তে, এটি থাকে প্রান্তের এক বিঘৎ উপরে। চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা মেয়েরা সাধারণত এ রকম পিনন পরে। তবে তাতে ওই পাড়ের সঙ্গে আঁচলের আলাদা ডোরাটি চাকমা জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে।

মান্দালয় শহরে এসে প্রায় সবাই সেনেকার পাউডার কিনতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজকাল কাঠ ঘসে সেনেকার তৈরি করার চেয়ে কেউ কেউ এই পাউডার ব্যবহার করে। মিয়ানমারে পুরুষের হাতে সচরাচর উষ্ণি দেখা যায়। মেয়েদের কেউ হাত কাটা ব্লাউজ পরে বাইক চালাচ্ছে। মাথায় হেলমেট। ওই লুঙ্গি পরে চালাচ্ছে। দু'-একজন প্যান্ট পরে রাস্তায় নেমেছে।

এবার পৌছলাম শোয়ে চি মে (Shwe Kyi Myin) প্যাগোডায়। একেবারে উল্টো অবস্থা। এমনটি আর কোথাও দেখি নি। আগে অনেক প্যাগোডায় মিলিটারি দেখেছি, কোথাও কুড়ি-তিরিশ জন হয়তো দেখেছি। কিন্তু শোয়ে চি মে একেবারে ভিন্ন সাজে বন্দি। বড় রাস্তার পাশে এই বিহার। এটি প্যাগোডা নয়। এখানে প্যাগোডার মাথা উঁচু সুঁচালো, গম্বুজওয়ালা স্তূপ-মন্দির নেই। বিশাল এলাকা জুড়ে বিহার। অনেকগুলো মন্দির নিয়ে গঠিত, অনেক কক্ষ। আবাসিক ভিক্টুরা থাকেন। এখানে সম্ভবত শতাধিক ভিক্ষু-শ্রামণ আছেন। রাস্তা থেকে উঠে তোরণ পেরিয়ে ঢুকতেই দু' পাশে দুটি মন্দির, মাঝখানে সাত-আট ফুটের পথ। মন্দিরে বেদির ওপর বুদ্ধ। একটি বড় এবং তার সঙ্গে ছোট ছোট অনেক বুদ্ধ। বেদির সামনে ৩০ বাই ৩০ ফুটের মতো জায়গা। সেখানে ভক্তরা বসে প্রার্থনা-আরাধনা করে। ওখানে এদিক-ওদিক করে প্যান্ট বা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ঘুমুচ্ছে সৈনিক ভায়েরা। তাদের অস্ত্র, হেলমেট এমনকি প্যান্ট রেখেছে বুদ্ধবেদির ওপরে। আমি তো জানি বৌদ্ধরা কখনো বুদ্ধবেদিতে গৃহীদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখবে না, এমনকি ভিক্ষু-শ্রামণরাও না। ওখানে প্রদীপ, ফুল ইত্যাদি অর্ঘ্য থাকবে।

বেরিয়ে গেলাম। মাঝখানের বারান্দা বা পথ দিয়ে একটু পরে আরও দুটি-দুটি ছোট মন্দির। এগুলোর প্রত্যেকটিতে একটি করে মাঝারি ধরনের বুদ্ধ। তারপর মূল মন্দির। বেশ বড় বুদ্ধ, দু' পাশে অনেক বুদ্ধ। স্তম্ভগুলো কাচের প্রলেপে সুসজ্জিত। দেয়াল-খিলানেও কাচ। কিছু পুরনো তৈলচিত্র আছে। তাতে বুদ্ধের জীবন ও ঘটনা চিত্রায়িত। মূল মন্দির থেকে ভেতরের এলাকা ঘুরে দেখতে গেলাম। পিন্টু চৌধুরী মন্দিরে কয়েক হাজার চ্যা তো দেবেই। ওর মতো দানশীল ও ধনী আমাদের দলে আর কেউ নেই। ডান দিকে ভেতরে চলে গেলাম। সেখানেও বড় একটি হলঘরে বুদ্ধ। ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বুদ্ধ। প্রত্যেকটি সুন্দর। একেকটি প্রকোষ্ঠ থেকে আরেকটিতে যেতে মাঝে খোলা আঙিনা। আঙিনা মোজাইক করা। আবার একটার গায়ে আর একটা প্রকোষ্ঠ ও বুদ্ধ। এরা কি সারা জীবন ও শত শত বছর শুধু এই একটি কাজই করেছে, শুধু বুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। এরি মধ্যে টিপটিপ

বৃষ্টি হয়ে গেছে দু'-এক পশলা। আমি প্রকোষ্ঠ ও মন্দিরের সঙ্গে লুকোচুরির মতো খেলে আগের জায়গায় অর্থাৎ প্রথম দুটি মন্দিরে চলে এলাম। সৈনিকদের চারজন বসে ওখানে তাস খেলছে, সেই ঘুমন্তরা ঘুমুচ্ছে। আমার মাথায় খেয়াল চাপল ওদের তাসখেলাসহ বুদ্ধবেদির ওপর রাখা অস্ত্রশস্ত্র ও প্যাণ্টের ছবি তুলব। সব ঠিক। ফোকাস, দূরত্ব ঠিক করে নিলাম অটোতে দিয়ে, কিন্তু ফ্লাশ বন্ধ করতে ভুলে গেছি। ব্যাস্, যা হবার তাই হলো। আমি বেরিয়ে এলাম। পাশের কক্ষের ছবি নেব কি না ভাবছি। সেখানেও সৈনিকরা। এমন সময় তাসখেলা থেকে উঠে এক সৈনিক এসে বলল, তুমি আমাদের তাসখেলার ছবি তুলেছ? আমি আকাশ থেকে সবেমাত্র পড়ার মতো বিস্ময়ে বললাম, সে কী, আমি তো বুদ্ধের ছবি তুলেছি। তোমরা তো ও-পাশে খেলছিলে। সে বলল, ঠিক তো? তোলো নি বলছ? আমি তখন নিজের নাম বললাম, বললাম বাঙালি, বড়ুয়া অর্থাৎ বৌদ্ধ। কারণ ততক্ষণে সৈনিকটি একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে মনে হয়েছিল। আমার পরিচয় এবং করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে আর কিছু বলল না। আমি ধন্যবাদ দিলাম। সি জু তুম্বারে, সি জু তুম্বারে। আমাকে মিথ্যে বলতেই হলো। জানি এর ক্ষমা নেই।

সামরিক কর্তৃপক্ষ প্যাগোডা ও বিহার এভাবে দখল করে আছে কেন? কেউ এর প্রতিবাদ করে না কেন? কেন সামরিক সরকারের এত কড়া নজর ধর্মস্থানের ওপর? আকিয়াবে বড়ুয়াদের ক্যাং শ্রীহীন। আর মান্দালয় ও ইয়াঙ্গুনে দেখি বিহার ও প্যাগোডা ওদের দখলে। তবে কোথাও মসজিদে সৈনিক পাহারা দিয়ে আছে দেখি নি বা শুনি নি। আসলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় ভিক্ষুদের অবদান অবিস্মরণীয়। শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডেও তাই। ভিক্ষুরা এ সময় অহিংসনীতিতে অটল থেকে নিজেই নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। এভাবে জনমত গঠন করেছে, জনগণকে সংগঠিত করেছে।

গতকাল এখানে এসেছি। তার আগের রাতে বোমা হামলা হয়েছে। স্থানীয় এক বড়ুয়া থেকে জানতে চেয়েছি ঘটনা সম্পর্কে। পিন্টুর ভাই থেকে। তিনি বললেন, কী করে বলব কারা মেরেছে, কারা বোমা হামলা করে। কে জানে কার মনে কী আছে?

আমি বললাম, এই অনুমান জানতে চাই আর কি!

তিনি সোজা এবং একটুও দেরি না করে বললেন, না, জানি না।

সোজা-সাপটা উত্তর। আমার একবার মনে হলো তিনি সত্য গোপন করেছেন। আমিও আর জোর করলাম না। সামরিক চর কোথায় আছে কে জানে। এজন্যই হয়তো ভয়। আমি তো বুঝি, দু'-দু' বার সামরিক শাসন দেখেছি বাংলাদেশ আমলে, পাকিস্তান আমলে দু' বার। যতই দেখেছি বুঝতে পারছি বার্মার সামরিক শাসন ভিন্নতর।

গতকাল কথা বলার সময় পিন্টুর দাদা বলেছিলেন, বর্মীরা আমাদের বিশ্বাস

করে না। মুসলমান মনে করে। কারণ আগে আমরা নিজেদের বাঙালি পরিচয় দিয়েছিলাম। ওরা মনে করে বাঙালি মানেই মুসলমান। অতীতে এক সময় মনে করা হতো বাঙালি মানেই হিন্দু। বাঙালির সংজ্ঞা এখনো কি ঠিক হয়েছে? আমার ভাবনা ঘুরপাক খায়। আমি বুঝতে পারছি বর্মীরা বিদেশি সম্পর্কে সতর্ক। আর সতর্ক হওয়াই তো উচিত। এজন্যই হয়তো সামরিক শাসনকে মাঝে মাঝে আমি ভুল বুঝে বিরোধিতা করেছি।

আকিয়াবে ন্যূন বড়ুয়া ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছে তারা বৌদ্ধ, কিন্তু মার্মাথী। মার্মাথী অর্থ মারমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নয়তো বর্মীরা তাদের মুসলিমদের দলে ফেলে দেবে। ন্যূন বড়ুয়া লাল কার্ডধারী ব্যবসায়ী। এই লাল কার্ড হলো তার পরিচয়পত্র। পরিচয়পত্র ছাড়া এখানে বিমানের টিকিটও করতে পারে না। লাল কার্ডের জন্য সে আকিয়াব থেকে ইয়াঙ্গুন যেতে পারে। মিয়ানমারের সর্বত্র যেতে পারে। কারণ এই লাল কার্ড।

কামুউদ প্যাগোডায় যে মেজর আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তাকে দেখেছি সামরিক কর্মচারী বলে তিনি গর্ববোধ করেন। সিদ্ধার্থের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। পিন্টুও কথা বলেছে। মেজরের এক ছেলে, এক মেয়ে। কিন্তু চল্লিশ-বিশাল্লিশ বছরে বড্ড মুটিয়ে যাচ্ছে। সৈনিক হলেও তো তিনি মানুষ। নিজের ছেলেমেয়ে ও পরিবারের কথা অকপটে বলে দিচ্ছেন। একজন সৈনিকও এক সময় মনের ঘরে ঢুকে সাধারণ মানুষ হয়ে যায়। না, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বলা যায় হয়তো, কিন্তু ব্যক্তি সৈনিকের বিরুদ্ধে নয়। মিয়ানমারে না এলে এতকিছু নির্ভয়ে দেখতাম কী করে? না, মিয়ানমারের সামরিক শাসন সম্পর্কে আমার মত অনেক পান্টাতে হবে। সাধারণ মানুষ সেনা শাসনের ওপর খুশি মনে হচ্ছে। তাহলে আমি কেন অখুশি হচ্ছি! আমি কেন দু' দিনে আমার সিদ্ধান্ত পাকা করে নেব!

আমারি তুষাটুকু পুরাবে না

বার্মার স্বাধীনতার ইতিহাসে ভিক্ষু উত্তম এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন বড় ৮৭-এর প্রধান ভিক্ষু। ৮৭ হলো বৌদ্ধ বিহার, যেখানে অনেক ভিক্ষু ও শ্রামণ বিদ্যাশিক্ষা করেন। ভিক্ষুগণও থাকেন। ১৯২০ সালে বার্মার উনথানো পার্টির জন্মদাতা তিনি। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলে তাঁকে আড়াই বছর জেল খাটতে হয়। কারাভোগের পর ব্রিটিশরা তাঁকে বার্মা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ভারতে তিনি গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন। এ সময় তিনি সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েছিলেন। দু' বছর পর তিনি আবার বার্মায় ফিরে আসেন। ইংরেজদের তাড়াও, বার্মাদেশ বর্মীদের করো—এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

বার্মা স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের নিষ্পেষণে পড়ে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। এতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান অবিস্মরণীয়। শ্রীলঙ্কায়ও তাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অহিংস নীতিতে অটল থেকে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দেন। জনমত গঠন ও জনগণকে সংগঠিত করেন—এই সহজ কাজটি করা কত কঠিন! সামরিক শাসকরা এখন বড় বড় প্রত্যেক প্যাগোডায় মিলিটারি প্রহরা বসিয়েছে। সারা বার্মায় এখন ধুমধামে ভাব। এ যেন বিক্ষোভের আগে বা যুদ্ধ শুরুর আগের শান্ত ভাব। মান্দালয়ে এসেছি। ইয়াঙ্গুন থেকে মান্দালয় পর্যন্ত সামরিক গাড়ির প্রহরায়। সামনে সামরিক জিপ বা পিকআপ। সারাক্ষণ পোঁ-পোঁ বাজছে। অন্য সব গাড়ি পথ ছেড়ে দিচ্ছে। যেন আমরা অভিজাত কয়েদি।

গাড়িতে করে একের পর এক প্যাগোডা দেখে দুপুর আড়াইটায় ফিরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি রেস্টুরায় চা। দশ মিনিট সময়। চমৎকার চা। কিন্তু ওই যে প্রচুর চিনি! দেশে গবাদিপশু চাষের এত সুবিধা তবুও সেদিকে এদের গা নেই। ডেইরি ফার্ম গড়ে ওঠে নি। চারণভূমি বেশি কিন্তু সেই তুলনায় পশুসম্পদ কম। সরকার কৃষি ও সেচে খুব জোর দিয়েছে বোঝা যায়। সারা দেশে মাঝে মাঝে পাকা নালা করে সেচের ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু মোষ বা গরুর দুধের চা নেই।

চায়ের দোকানি মোটাসোটা সুন্দর মহিলা। এক পাশে দুই মেয়ে। অন্য দু' জন চড়কির মতো ঘুরে ঘুরে কাজ করছে। ওরা পাঁচ বোন, ভাই নেই। বললাম, মেয়েই ভালো। আমার কয়জন ছেলেমেয়ে জানতে চাইল। দোকানে প্রচুর খন্দের। বাইরে বৃষ্টি। চমৎকার কেক খেলাম। মেয়েরা কী চটপটে। ঝলমলে স্বাস্থ্য ও তারুণ্য। একটুও সঙ্কোচ বা দীনতা নেই। আমাদের দেশের মতো মেয়ে দেখলে হামলে পড়ার স্বভাব পুরুষদের নেই। সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনে এরা স্বাধীন। তালাকের হার খুব কম। সুন্দরী দু' বোন কাজ তো করছে না যেন পাখা মেলে উড়ছে!

গত রাতে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে যেতে দেয় নি। কিন্তু তা পুষিয়ে নিয়েছি আমাদের ড্রাইভারের মাধ্যমে। সব ব্যবস্থা সে করে দিয়েছে। বাঘ নিয়ে এসেছে আমার জন্য। হলফ করে বলছি বাঘিনীর মুখোমুখি হতে বড় ভয়। কোথাও একা যাওয়ার উপায় রাখে নি। আমাদের গাইডের নজর সুতীক্ষ্ণ। এরি মধ্যে কত প্যাগোডা যে দেখেছি, কত মিলিটারির মুখোমুখি হয়েছি তার হিসাব নেই। দোকানি মহিলা ও মেয়েরা ছবির জন্য পোজ দিল। এমন অমলিন হাসি টাকা দিয়ে কেনার নয়। এই অন্তরঙ্গতা একান্তই প্রাচ্য-দেশীয়। অমন জীবলাস ও জীবভঙ্গ কেন যে সৃষ্টি হয়েছে! আর যদি হলোই তাহলে আমরা পানে ভুলে পড়বে না কেন? রবীন্দ্রনাথ কি বার্মা এসে 'বিধি ডাগর আঁখি' গানটি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন?

গত রাতে বেরুতে যেতে দেয় নি পরিয়ন্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সন্দের

পর নয়টার দিকে গেটে গিয়ে দেখি দারোয়ান বাইরে যেতে দেবে না। ওকে-সহ নিয়ে যেতে চাইলাম। উদ্দেশ্য দোকানে গিয়ে সিগারেটের সঙ্গে দু-এক বোতল বিয়ার বা হুইস্কি কিনে নেব। সারা দিন ঘুরতে ঘুরতে হাত-পা-গা ব্যথা হয়ে গেছে। শরীরটাকে একটু জুত করে নেওয়া দরকার। আর জিনিসটাও এখানে খুব সস্তা, দেশে তো মেঘ-ছোঁয়া দাম, ধরতে গেলে মেঘের মতো পালিয়ে যায়। আর এটি মিয়ানমারের আকাশ ও মেঘ, অনেক নিচে, হাতে ধরা যায়—আহা, এমন কেন সত্যি হয় না সব।

দারোয়ান বলল কী চাই বলুন, এনে দিচ্ছি। কিন্তু বিয়ারের কথা বলি কোন মুখে। নিজেদের গুটিয়ে নিলাম আমরা। এই যে কোথাও আমাদের একা যেতে দিচ্ছে না তার কারণ কি! সরকারের ভয় পাচ্ছে আমরা হারিয়ে যাই, পালিয়ে যাই বা কোনো কেলেক্সারি করে বসি? পাছে আমাদের কোনো ক্ষতি হলে তাদের দায়িত্ব বেড়ে যাবে বলে? হারিয়ে গেলে মহামুশকিল! থানা-পুলিশ করো ইত্যাদি কত ঝামেলা। আমাদের গাইড দু' জন সবসময় সতর্ক। আমাদের গাড়িতে ধর্মীয় পতাকা ওড়ানো। রাস্তার লোক সবসময় তাকিয়ে থাকে। তার ওপর আগে মিলিটারি গাড়ি ছিল পথে পথে। আমাদের দেশেও ধর্ম মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে দেশের নানা ধর্মের মানুষকে করে দিয়েছে আরো বিভক্ত। এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্ম তো আলাদাই। তার ওপর ধর্ম মন্ত্রণালয় নানা কাণ্ড করে আমাদের প্রতিনিয়ত আলাদা করে দিচ্ছে। পৃথিবীর যে যে দেশে ধর্ম মন্ত্রণালয় আছে সেখানে বারবার একথা বলে দিচ্ছে মানুষ হিসেবে নয় ধর্মই হচ্ছে আসল পরিচয়। ধর্মে ধর্মে সংহতি এ পথে তো সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে এভাবে বিভেদ বেড়েই চলেছে। স্কুলে যার যার ধর্ম তাকে তাকে পড়তে দিয়ে ছেলেবেলা থেকে তাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে দিচ্ছে। ছেলেবেলাতে শিখিয়ে দিচ্ছে মানুষ নয় ধর্মই মূল পরিচয়, এই কথাটি তাদের মনে গেঁথে দিচ্ছে। তার বদলে আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত, পালি বা ল্যাটিন ভাষা পছন্দমতো শিখতে দিলেও হয়তো লাভ হতো। ভাষার বদলে আমরা ধর্ম পড়ছি, নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মকে জানতে পারছি না।

বৃষ্টি হলো আবার। বিকেল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া ভারি। বর্ষাসুলভ বৃষ্টির কি শেষ আছে! অন্য কোথাও হয়তো আরো বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। চট্টগ্রামে বেশি হচ্ছে কি? ঢাকায়, সুন্দরবনে, পাগানে, চিয়াং মাই, ইফল বা আন্দামানে? গতরাতও মুঘলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। আকাশটা কোথাও ফুটো হয়ে যায় নি তো? কাল খুব দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে না হলেও ঘণ্টা চারেক একটানা চলতে তো হবেই। তবেই পাগান পৌঁছতে পারব। মিথিলা, মান্দালয় ও পাগান হলো সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে তিনটি প্রাচীন শহর।

এই দীর্ঘতম বাসভ্রমণ

২ জুন, ওয়ান টুইন (Wan twin) শহর এলাকার দিকে ছুটল বাস। সকাল ছয়টায় যাত্রা শুরু। গত রাতে ভারি বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা মাঝে মাঝে ডুবে গেছে। জাতীয় সড়ক। প্রায় জমির সমতলে রাস্তা। উঁচু-নিচু টিলাভূমি। যেদিকে নিচু পথ পাচ্ছে সেদিকে পানির ধর্ম অনুযায়ী হ-হ বেগে ছুটছে। এক জায়গায় দেখি রাস্তা ডোবা। সেটা পেরিয়ে যেতে পারলাম। সামনে আবার রাস্তার ওপর পানি। ধনুর মতো বাঁকা রাস্তা। গাড়ির লাইন পড়ে গেছে। পাঁচ-ছয়টি মোটর গাড়ি। এমনিতে সারা দেশে গাড়ি কম। বাংলাদেশ থেকে অনেক কম। বাস দুটি, ট্রাক তিনটি। রাস্তায় লোকজনও কম। পথে পথে দোকান থাকলেও খুব কম মানুষ। বাংলাদেশে হলে তো গিজগিজ করত মানুষে মানুষে, গাড়িতে গাড়িতে।

গাড়ি থেমে গেছে। আমাদের গাড়ির একটা চাকা ফুটো হয়ে গেছে। ড্রাইভার লুঙ্গি তুলে কাজে নেমে পড়েছে। মোটাসোটা শক্ত ড্রাইভার। পথে এই পর্যন্ত একবারও মনে হয় নি সে খারাপ চালিয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সামনের রাস্তার ওপর দিয়ে, পাশের নিচু জমির ওপর দিয়ে তীব্র বেগে পানি ছুটছে। শব্দ হচ্ছে খলখল কলকল। আকাশ দজ্জাল হয়ে গেছে। মেঘে মেঘে ব্যাকুল। ডান পাশে ছোট নদী মনে হচ্ছে। কূল ছাপিয়ে গেছে বলে বোঝা মুশকিল। হয়তো নদীই নয়। মাঝে মাঝে খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে। তাতে আবর্জনা আটকে অস্থির হয়ে উঠেছে ওটা। একটা চালসহ বেড়া ভেসে যাচ্ছে তীর বেগে। চালের ওপর আবার তিনজন মানুষ, চালে চড়ে ভেসে যাচ্ছে। আরো একটা চাল ভেসে এলো। সে কী! বিপজ্জনক অবস্থা। ঘরের দরজা ভেসে গেল যে! দুটি নৌকোও গেল লোক নিয়ে স্রোতের ইচ্ছে অনুযায়ী। পানিতে ডুবে যাওয়া ঘর থেকে লোকজন রাস্তায় উঠে এসেছে দু'-একটা পোঁটলা-পুটলি নিয়ে। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম ছাতা নিয়ে। ওদিকে মাইকে বর্মী ভাষায় কী সব বলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি সতর্কতামূলক হুঁশিয়ারি। মেঘ বলছে সে ঝরবে। বায়ে ডুবে যাওয়া বাড়ি। ডানে ডুবে যাচ্ছে ঘর। রাস্তার দু' পাশে একই সর্বনাশা দৃশ্য। কত ঘর যে ভেসে গেল কে জানে!

গাড়ির চাকা ঠিক হয়ে গেল। আবার পেছন ফিরে যাচ্ছি। সামনে যাওয়া অসম্ভব। বিলের ওপর দিয়ে পানি ছুটে আসছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি। মুহূর্তে মুহূর্তে পানি বাড়ছে। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে মানুষ। বিলটা বিশাল নদী হয়ে গেছে। বিলের দু' পাশে উঁচু টিলা। টিলার কিনার পর্যন্ত পানি। বাস থেকেই লোকের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। চিৎকার পেছনে ফেলে গাড়ি ছুটছে। পাগান ছেড়ে কোনদিকে যাচ্ছি কে জানে! লোকজন বলেছে এমন পানি ওরা দশ বছরে দেখে নি। এমন বানও নয়। সাঁতরে একজন কূলে আসতে চাইছে। চাইলেই কি হয়,

স্রোতের তোড়ে সে চলে যাচ্ছে, আমাদের বাস উল্টো দিকে চলছে। আর দেখতে পেলাম না। পাগান কি যেতে পারব না তাহলে, নাকি ঘুরপথ ধরেছি?

অনেক দূর এসে ছোট একটি থানা বা সে-রকম জায়গায় থামল। ওদিকে টিলার উপর কয়েকটি একতলা পাকা ঘর। সরকারি অফিস-টফিস হবে। জায়গার নামটিও জানি না। আমাদের গাইড চলল সেদিকে ফোন করতে। আমাদের পাগান সম্ভবত যাওয়া হবে না, পথ বন্ধ পানিতে। একটা দোকানে আমরা বসলাম। এটা রেস্টুরাঁ এবং ভাতও পাওয়া যায়। ওপাশে একটা তাঁতঘর আছে, সঙ্গে দোকান। লুঙ্গি বোনে আর দোকানে বেচে। সিদ্ধার্থ গিয়ে পাঁচটি লুঙ্গি কিনে আনল। খুব সস্তা। প্রতিটি লুঙ্গি ৮০০ চ্যা বা সস্তর-আশি টাকার মতো। অন্যরা দেখল। পিন্টু চৌধুরী নিল একটা, আর একজন নয়টা, অন্যজন এগারোটা, আর একজন দশটা বা ওরকম কিছু হবে। সলিলদা বা প্রদীপ কে কতটা নিল হিসাব রাখে কে? এতক্ষণ সবাই বানে ভেসে যাওয়া মানুষের জন্য হাত্তাশ করছিল। পথের ধারের বাচ্চাদের চকলেট ও খাবার দিল। এখন অন্যরূপ। সামনে যা পাচ্ছে কিনে খাচ্ছে। দুপুর প্রায় সাড়ে এগারোটা। খিদেও পেয়েছে সবার, প্রতিদিনের অভ্যেস অনুযায়ী। টিনভর্তি কোমল পানীয় শেষ। যার যার ব্যাগে যা জমা ছিল তাও খেয়ে শেষ করে ফেলেছে এরি মধ্যে।

খ্রীতিদি গিয়ে মহাথেরোর জন্য ছোয়াইং-এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখছে। আমিও গিয়ে দোকানিকে কোনোমতে বোঝাতে পারছি না ডিম সেদ্ধ করে দেওয়াটা। আধ সেদ্ধ হলেই হয়। খ্রীতিদির সঙ্গে বালিয়াচং আছে। চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। ব্যায়াম ভর্তি করে বার্মা থেকেই যায় চট্টগ্রামের বাজারে। পাঁচশ' গ্রামের মতো হবে এক কৌটোয়, ১১০ টাকা দাম। ওটা কাজে লাগল। মহাথেরোকে বারোটার আগে দিনের আহার শেষ করতে হবে। প্রণববাবুর পেটের অসুখ হয়েছে গত রাত থেকে। সারা পথে কিছু খায় নি। সকালেও না। বললাম চিনি ও কলা মেখে ভাত খেতে। তিন ভাত্তে ও প্রণববাবু খেয়ে নিলেন।

সুবোধ কান্তি বাইরে থেকে ঘুরে বাসে গিয়ে উঠলেন। বসার জায়গা ও জানালা মোছার লুঙ্গি দিয়ে একজন জুতো মুছে নিল। মহিলারা বাসে বসে আছে। সলিল বিহারী ও প্রকাশচন্দ্র বাসে চলে গিয়ে তাকিয়ে আছে। কী করবে ভাবছে। ইন্দু ও অমলেন্দু এসে দোকান থেকে একপ্রস্থ কফি খেয়ে গেল। মৃদুল কান্তি চৌধুরী লুঙ্গির দোকানের দিকে ঘুরতে গেল। শচীনদা বৃষ্টি থেকে গা বাঁচাতে বসে আছে রেস্টুরাঁয়। সবার মুখ প্রায় মেঘের মতো ভারি। সবার জন্য রেস্টুরাঁয় ভাতের ব্যবস্থা হচ্ছে। সবাই বলছে উল্টোপাল্টা খেয়ে পেট যেন খারাপ না করে। তার জন্য দরকার হলে হুইস্কি ওষুধের মতো ব্যবস্থা করতে। কত মত, কত কথা, আর বিশ্লেষণ।

আলোচনা কত রকম! কেউ বলে বর্মীরা আমাদের পেয়ে ঠকিয়ে দাম বেশি নিচ্ছে। সুযোগ বুঝে চড়ে বসছে। একজন একটা অসংস্কৃত শব্দসহ বলল, একটুও

দাম কমায় না। ওরা ওঁত পেতে আছে ঠিকানোর জন্য। কিন্তু নিজেরা যে তীর্থ করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেনাকাটা করছে সে-দিকটা কেউ দেখছে না। দোকানের লুঙ্গি শেষ, খাবার জিনিস শেষ, কফি নেই। আমিও কফি খেতে পেলাম না। প্রত্যেক প্যাগোডার পাশে দু'-দশটি দোকান থাকে, কাজেই কেনাকাটার কোনো অসুবিধে নেই। এদিকে পাগান যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে এলো। গাইড দু' জন এসে বসলেন। কিন্তু বর্মীদের অবিশ্বাস করার বিষয়টি আমি কিছুতেই মানতে পারলাম না। আমার বিশ্বাস ওরা বাঙালির থেকে অনেক বেশি সৎ ও সরল। দরদাম করে ওরা, কিন্তু গলাকাটা দাম কোথাও নিয়েছে বলে আমার একবারও মনে হয় নি।

বিপত্তি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কারও পলি ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে। কারো-বা সুটকেসে একটুও জায়গা নেই। বাসের মাঝখান দিয়ে চলাচলের জায়গা জিনিসপত্রে ভর্তি। বৃষ্টি বাসের ভেতরে পড়ছে চাল বেয়ে, জান্দার ফাঁক দিয়ে। কেউ তার ব্যাগটি অন্যের ব্যাগের নিচে রাখতে রাজি নয়, কিন্তু একটা ব্যাগের ওপর আরেকটা তো রাখতেই হবে। একবার এখানে, আবার ওখানে ব্যাগ টানছে একেকজন। আর নিজের পাশটিতে রাখতে চায় প্রায় সবাই। তাতে হাঁটার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিকিরণ ফুঁসছে, প্রণববাবু মুচকি হাসছে। পান চিবুচ্ছে অমিতাদি। আমি কারুর কাছ থেকে চেয়ে পান খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কেনাকাটা তো একদম না। আমি চূপসে গেছি পাগান যেতে পারব না ভেবে। আমার আর এই জন্মে ঐতিহাসিক পাগান দেখা হলো না।

এদিকে এগারোজনের খাবার শেষ। প্রকাশ, বিকিরণ, প্রীতি, মৃদুল, প্রদীপ আম ও বালিয়াচং দিয়ে খাওয়া শেষ করে নিল। ভাগ্যিস প্রীতিদি বালিয়াচং এনেছিল। পানির বোতলও শেষ। দোকানের জুসের টিন শেষ। লুঙ্গির দোকানের লুঙ্গি শেষ। একজন মন্তব্য করল গাইডদের টাকা শেষ, তাই ভাত দিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়েছে। কী অবিশ্বাস্য মন্তব্য, কী ছোট মন! দোকানে সাজানো আছে শুধু ড্রাই জিন, রাম, হুইস্কি ও মান্দালয় বিয়ার। একজন বলল, পেট ভালো থাকার জন্য যেন এক বোতল রাম কিনে সবাইকে অল্প অল্প খাইয়ে দিন। আবার আমার ওপর ভার দিতে চায়। আমি বললাম, রাম নয় হুইস্কি। এরি মধ্যে কয়েকজনের পেট খারাপ হয়ে গেছে। আমার পেটে সবসময় খিদে। আমি তো সবসময় কম খাচ্ছি, যাতে হজম তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। অটেল থাকলেও খাচ্ছি পরিমাণমতো। আমি বললাম, না হুইস্কি-টুইস্কি আমি খাওয়াতে পারব না বাপু। দশজনের দশ রকম মতি। তারা পরে প্রচার করবে বিপ্র মদ খায় আর সবাইকে খাইয়েছে, বিপ্র তো খায়ই। রাখঢাক তো নেই তার। সবাইকে দেখিয়ে খায় না, হয়তো প্রতিদিনই খাচ্ছে। দেশে ফিরে গিয়ে তারা বিপ্রের বিরুদ্ধে বলবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। পঞ্চশীলের পঞ্চম শীল হলো, 'সুরা মৈয়রয়ে ইত্যাদি নেশাদ্রব্য পান না করার শিক্ষা।'

গাড়ি আবার সচল হলো। সবার পেছনের আসন আমার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। ইয়াঙ্গুন থেকে আসার সময় বেশ কিছুদূর গাইডের পাশে বসতে পেরেছিলাম। একজন সেটা মাঝপথে ছিনতাই করে নিয়ে নিল কোমরের ব্যথার দোহাই পেড়ে। রোগের সঙ্গে তো আর তর্ক চলে না। ইন্দুভূষণ হোমিও ডাক্তার, কিন্তু ওষুধ কাকে দিয়েছে জানি না। হোমিওপ্যাথে হজমশক্তি বাড়ানোর ওষুধ কী থাকে না? আমাকে বারবার করে বলেছে কোনো দরকার হলে বলতে। একজন সকালে গাইডকে বলেছে, আমাদের ইয়াঙ্গুন ফিরিয়ে নিয়ে গেলে হয় না? গাইড বললেন, আমার তো সেই ক্ষমতা নেই। আমি তো মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছা পূরণ করছি। ইয়াঙ্গুন ফেরার প্রস্তাব শুনে আমার মাথা টং। পাগান না দেখে ফিরে যাব? ওখানে চল্লিশ হাজার প্যাগোডা ছিল এক সময়। মুখের কথা! দেখতে পাব না?

আরেকজন বলল, আমাদের মান্দালয় ফিরিয়ে নিন। আরেকজন অন্য কথা। সবার মুখে নানা কথা। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। গাইড বিরক্ত। অন্য একজন কী বলল আর বললাম না। বিমলেন্দু, প্রকাশ, শতীনদা, সলিল সবাই কে কী বলল এখন থাক। বিকিরণ তো বিরক্তই। কাউকে থামানো যায় না। দলের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদলি শুরু হয়ে গেল।

গাড়ি চলেছে। বানের পানি একটু কমেছে মনে হয়। রাস্তার পাশে কোথাও কোথাও পানি নামছে, ঘর থেকে বের হচ্ছে। এক বউ বাবলা গাছে আটকে পড়েছে। তাকে দড়ি বেঁধে নামাচ্ছে। ওদের ছেলে নাকি ভেসে গেছে। আরো কে কে নাকি ভেসে গেছে। সকাল আটটায় ঘরে পানি ঢুকেছে, ঢল এসেছে। লোকে দড়ি নিয়ে ছুটছে। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি।

সাড়ে তিনটায় মিথিলায় ফিরে এলাম।

মিথিলায় তিনটি সুন্দর মসজিদ। একটির নাম জানতে পারলাম। থিরি মিস্গুলার মসজিদ (Thiri Mingular Mosque)। পাগান যাওয়ার যত পথ আছে খুঁজতে খুঁজতে বানের জন্য পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মিথিলায় চলে এসেছি। কিন্তু মিথিলার লেকে পানি এত বেড়ে গেছে যে তার উপরের সেতুটিও ডুবে গেছে। ব্যাস্, ওই পথে যাওয়া গেল না। আবার আমাদের থামতে হলো। গাইড নেমে খবরাখবর নিচ্ছে। লোকজন ভিজে এদিক-সেদিক যাচ্ছে। অনেকে যাচ্ছে পানি দেখতে। এমন বান নাকি অনেকেই জীবনে দেখে নি।

শনিবার। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই ছুটছে লেকের ডুবে যাওয়া সেতু দেখতে। এই সেতু নাকি আজ পর্যন্ত কখনো ডোবে নি। কী ভয়াবহ! বাসে বসে আছি। কথা ঘুরতে ঘুরতে কেনাকাটায় গিয়ে আটকে পড়ল। একজন অমনি বলল, টাকা গুণে না নিলে মুশকিল, কম দেয়। এখানকার মানুষ সৎ নয়। অন্যজন বলল, এরা শুধু শয়তান নয়, মহাশয়তান। অন্য একজন বলল, আমার থেকে লুগি প্রতি ২০ চ্যা বেশি নিয়েছে, পরে ড্রাইভার বলাতে ফেরত দিয়েছে। আর একজন বলল,

এখানকার মেয়েরা শয়তান। টাকা বেশি নিতে ওস্তাদ।

আমি তো কখনো টাকা গুণে নেই নি। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস নিয়ে ঠকতে রাজি। বড় নোট হলে মোটামুটি দেখে নেই বৈকি। খুচরোগুলো দেখি না, বড্ড গোলমালে। দু' দশ চ্যা আর এমন কি! কুড়ি চ্যা কম দিলে আমাদের দু' টাকাও নয়। তাতে যদি কোনো সুন্দরী খুশি হয় হোক না। এমন সুন্দর হাসির জন্যও তো বিশ-পঞ্চাশ চ্যা এমনিই দিয়ে দেওয়া যায়। না, ওরা মোটেই খারাপ নয়। ঠকায় বলে আমার মনে হয় না। ভুল করতে পারে। কারণ আমাদের লোকেরা যখন দরাদরি করে এবং খুচরো ফেরত নেওয়ার সময় এত বাক-বিতণ্ডা করে যে ওরা ভুল করে বসে। আমাদের দু'-তিনজনকে এক সঙ্গে টাকা নিয়ে ঝামেলা পাকাতে তো দেখেছি আমি। আর কম দেওয়ার অভিসন্ধি আমাদের নেই একথা হলফ করে বলতে পারব না। দোকানি বলেছে ১৭০ আর ক্রেতা বলেছে ১৬০ চ্যা। দোকানি রাজি না হয়ে হয়তো অন্য কথা বলছে। তখন ক্রেতা মনে করল বুঝি ১৬০ চ্যা-তে রাজি হয়েছে। আসলে সে তো রাজি হয় নি। তখন খুচরো নেওয়ার সময় বাধে গগুগোল। ব্যাস্, অমনি দোকানি হয়ে গেল মিথ্যাবাদী। এমন তো হয় দেখেছি। না, আমি মনে করি না বর্মী মেয়েরা ঠকায়। ওরা ভীষণ দরদস্তুর করে। মস্কোলদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হঠাৎ রেগেও যায়; কিন্তু পরক্ষণে আবার হাসিখুশি হয়ে আগের কথা ভুলে যাবে। এটা ওদের বৈশিষ্ট্য। মিথ্যা কথা, চুরি কর ওদের রক্তে নেই। আমাদের চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যারাও না। গারোরাও নয়। ওরা সততা রক্তে বয়ে বেড়ায়, আমাদের রক্তে বরং ওদের মতো সততা নেই। আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সততা এখনো প্রবলভাবে উপস্থিত। আমাদের রক্তে অনেক কাল আগে দোষ ঢুকে পড়েছে। আমি হোটеле দরজা খুলে রেখেছি, কোনো চুরি হয় নি। হোটেলওয়ালা বলেছে, এখানে চুরি নেই। কুলিরা মালপত্র নিয়ে উধাও হবে না কখনো। পথে-ঘাটে রাত-বিরেতে আপনি খুব নিশ্চিন্ত। ঠকানো বা চুরির অপবাদ এদের দিতে পারব না আমি। ভুল হওয়াকে চুরি বলা যায় না।

বিকেলে মিথিলা শহর থেকে বের হচ্ছি। কান্দায়ের (Kandaye) একটি গ্রামে আবার আটকে গেলাম। মিথিলা থেকে যে রাস্তা দিয়ে ইয়াঙ্গুন ফেরার কথা সে রাস্তা ডুবে গেছে। আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরছি। মাইল ছয়েক এসে আবার বাধা। সামনের রাস্তা ধনুর মতো বাঁকা। রাস্তাটা বেশ ঢালু হয়ে নেমে আবার তেমনি করে উঠে গেছে। মাঝখানে ছোট সেতু বা কালভার্ড আছে। আর নিচে ছোট শ্রোতস্থিনী থাকতে পারে। দুই টিলার মাঝখানে নিচু জমি থাকলে এ রকমই তো হয়। সেই নিচু জায়গাটা ডুবে গেছে। ডুবে রাস্তার ওপর দিয়ে হ-হ করে পানি ছুটেছে। পানির প্রচণ্ড তোড়। আমাদের গাড়ি থেমে গেল চাকায় কী যেন হয়েছে, নাকি চাকা পাল্টে

নিচ্ছে। সামনে দুটি বড় বড় মাল-ভর্তি ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন দম নিচ্ছে। মিনিট দুয়েক পরে রাস্তা ও পানির মতিগতি এবং রোষ পরীক্ষা করে নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তার পানির ওপর। গর্জন করে পানির স্রোতকে পরাজিত করে পার হয়ে গেল। আমাদের ড্রাইভার যখন গাড়ি পরীক্ষা করে শেষ করল তখন পানির তীব্রতা আরো বেড়ে গেছে। না, আর সাহস হলো না। আমরা আটকে গেলাম। তীব্রতা একটু কমলে আমরা যাব। আস্তে আস্তে দুটো যাত্রীবাহী পিকআপ এসে দাঁড়াল পেছনে। নিরুপায় যাত্রীরা নেমে গেল, পিকআপ ফিরে গেল মিথিলায়। আর একটা মোটর কার এলো। ফিরে গেল। গাড়ি খুব কম। আস্তে আস্তে বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম। আমরা আটকে পড়লাম।

সামনে একটা দোকান। বৃষ্টি নেই কিন্তু মেঘ করে আছে। টিলা জায়গা। নিম, বাবলা, তাল প্রধান গাছ। কত কথা সবার। ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরা বর্মী মেয়েরা দু'চারজন জড়ো হচ্ছে। এদিক-ওদিক যাচ্ছে। খোঁপা বাঁধা চুল। ওই যে হর্স টেলের মতো, তবে একটু নিচুতে বাঁধা। এ-রকমই বেশি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাঁধে ধলে নেয়। স্থানীয় রমণীদের মাথায় টোকা। দূরে বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়, মেঘের আড়াল থেকে চূড়ো দেখাচ্ছে, যেন স্তনচূড়ান্ন। তার শিখরে মেঘ চুমো খাচ্ছে, গোড়ায় লুটোপুটি খেলছে, আবার অনেকখানি ঢেকে ফেলছে। মেঘের আদর কাড়ার কত রকম ভঙ্গি, কখনো আস্তে আস্তে কখনো-বা ক্ষিপ্ত বেগে সরে যাচ্ছে বা পুরো পাহাড় অদৃশ্য করে দিচ্ছে। কবি কালিদাস তো আর অমনি অমনি এ রকম কথা 'মেঘদূতে' লেখেন নি, 'দৃশ্য হবে ধরার স্তনতট অমর মিথুনের ভোগ্যা/গর্ভ সূচনার মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো।' না, আর ভাবতে পারব না। আমি আতুর হয়ে পড়ব। হে মেঘ, হে পাহাড়, ও ময়ূরী, তোমরা আমাকে রেহাই দাও।

একটা হট্টি হট্টি পাখি চিৎকার করতে করতে চলে গেল আকাশ পাড়ি দিয়ে। বর্ষা এদের প্রজননকাল। গোটা দশেক চড়ুই ইলেকট্রিক তারে এসে বসল। এখানেও পাখি আশ্চর্যজনক হারে কম। এত নিম গাছ, নিমফল পেকে আছে, খাওয়ার পাখি নেই। যতদূর চোখ যায় পাখি নেই। বাবলা গাছ থেকে চড়ুইগুলো দু'দফায় চলে গেল। খলখল, শৌঁ-শৌঁ আওয়াজ আসছে। পানির। এত তাল গাছ, কোথাও বাবুই পাখির বাসা দেখলাম না। গরু ও মোষ চরছে, ওদের পিঠে বসে নেই কোনো ফিঙে বা বক। ছাগলের পিঠেও এখানে ফিঙে বসে না বোধহয়।

পাশের দোকানের মালকিন বিধবা। আমাদের দেশের নির্জন রাস্তার পাশের ভিড়-ভাট্টাহীন নিঃসঙ্গ দোকানের মতো। বেশি ও টুল-চেয়ার আছে। একটা বড় খাট পাতা আছে। তাতে চাটাই। বড় শোকেস আছে, কিন্তু মালপত্র কিছুই নেই। বিস্কুটের প্যাকেট বা চানাচুর অথবা কলা, খই, মুড়ি, সিঙাড়া, মালপোয়া, ছোলা ভাজা কিছুই নেই। মুড়ির খালি টিনও নেই। এ রকম প্রায় দোকানে অন্য কিছু না থাকুক আম থাকে, এখানে তাও নেই। প্যাকেটে কফি নেই। আছে হুইস্কি আর

ব্রাভি। তো ওসব ছাই-ডস্ম কী দিয়ে গলাধঃকরণ করব! নিদেনপক্ষে আম তো চাই। আম দিয়ে খাওয়া এখানে শিখেছি। মরুক গে ব্র্যাভির বংশধর, ওর সাত পুরুষ দোজখে যাক। ওখানে গেলে তো আবার পাপীতাপীদের পোয়াবারো। হোক, সব কি শুধু বড়লোক আর পুণ্যাআরা ভোগ করবে? গরিব-গুরবো আর পাপীতাপীরা চিরকাল তৃষ্ণার্ত থাকবে কেন? কিন্তু সুরার প্রতি মোহ অনেকের, শুধু সমাজের ভয়ে অনেকে স্বীকার করে না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ক'জনা সাহস করে বলতে পারে এমন ইচ্ছের কথা! আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকের চোখ চকচকে হয়ে উঠেছে। দু' জন বলে ফেলেছে সাধের কথা। কিন্তু সাহস করে কিনে খাওয়া বড় লজ্জার ব্যাপার।

সিদ্ধার্থ আমাকে ডেকে নিল। ওরা তো সবার সামনে সিগারেট খেতে পারে না। আমাকে ঢাল করে একপাশে গিয়ে খায়। হাঁটতে হাঁটতে টিলার মাথায় একটা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। রাস্তার পাশে, বাড়ির সামনে মাঠ, এদিকে-ওদিকে দুটি বাড়ি। পেছনেও আছে। মাচার ওপর ঘর। নিচে ছোট দোকান। চাল-ডাল-নুন বেচে। পিন্টু এসে ঘুরে গেল। প্রদীপ এলো। বাড়ির মহিলা ও ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। ছেলে ইংরেজি বলতে পারে। বয়স সতেরো-আঠারো। ছাত্র। পরিবারের আয় কৃষি থেকে আসে। বাবা কৃষি কাজ করে। ছেলের নাম মং খো খো। গ্রাম কান ধান আইক। মিথিলা টাউনশিপ, মান্দালয়। দেবাশিস ও সিদ্ধার্থ নানা প্রশ্ন করছে। আমি শুনছি। আমাদের পাঁচজনকে রাতে থাকতে দেবে বলল। বাসে তো বসে বসে কাটাতে হবে! আমরা এরি মধ্যে জেনে গেছি পানি না কমা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব, যখনই সুযোগ পাব পার হয়ে যাব নিচু জায়গাটা। কিন্তু সেই সময়টা অত তাড়াতাড়ি আসবে বলে মনে হলো না। পানির চাপ বাড়ছেই, এরি মধ্যে আরো চার হাত রাস্তা ডুবে গেছে।

মহিলা ঘরের দরজায় বসে আছে। মাচার ওপর। আমরা নিচে, চেয়ারে। একরকম বীন দিল খেতে। ভাজা কড়কড়ে বীন। তারপর নুনদানি ও সর্ষের তেলের বোতলটা এগিয়ে দিল। ও মা, এসব কী হবে। মহিলা হাতে দেখিয়ে দিলেন বীনে তেল ঢেলে দিতে। তাই তো! বাটিটা টেনে নিয়ে কয়েক ফোঁটা তেল ও পরিমাণ মতো নুন দিয়ে মেখে নিলাম। ছোট চামচও দিল মাখার জন্য। প্রদীপ ও দেবাশিস তাকিয়ে আছে। বাঃ, চমৎকার! আগের চেয়ে তো ভালোই। মুটমুট শব্দ হচ্ছে। সন্ধেবাতি জ্বলে দিয়েছেন মহিলা। আমি খেয়ে চলেছি। অন্যেরা খেল না।

সন্ধে নেমেই এলো। আকাশে মেঘেরা ছুটেছে। উড়ো চিঠি বলব? সাদা-ধূমল লেখায় ভরা চিঠি। পেছনে চাঁদ আছে, দু'-তিন দিনের মধ্যে পূর্ণিমা। চাঁদ দেখতে পাচ্ছি না বলে বুঝতে পারছি না। মেঘের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তার আদ্য রাগের নজর পাঠিয়ে দিচ্ছে। জ্যোৎস্নার উড়ন্ত চুম্বন পাঠাচ্ছে। কার কাছে কে জানে! সামনে যাওয়ার পথ নেই। এদিক-ওদিক একই জায়গায় কতক্ষণ ঘোরা যায়! তাহলে কি আবার মান্দালয় ফিরে যাব? সেখান থেকে জাতীয় সড়ক ধরে ইয়ান্সুন?

সেই রাস্তাও যদি ডুবে যায়! মেঘের খেলা দেখতেও তো স্থির হয়ে বসা চাই, মনের স্থিরতা চাই। মৃত বাসে এসে বসলাম।

পানির তোড়ে উজান থেকে এক মাঝবয়সী লোক ভেসে এসে ওই ডোবা সেতুর পাশের গাছে আটকে গেছে। গাছটার গায়ে এটা-ওটা জঞ্জাল এসে জমপেশ হয়ে আটকে গেছে। লোকটা ভাগ্যক্রমে নাকি দুর্ভাগ্যের তাড়ায় আটকে গেল বলব? আটকে না গেলে হয়তো এতক্ষণ নিচের দিকে কোথাও কূল পেয়ে যেত। অথবা ভাসতে ভাসতে ডুবেও যেতে পারত। এখন তার পক্ষে সাহস করে সাঁতার কেটে কূল ধরা কঠিন। সাহসে কুলোচ্ছে না, না কুলোবারই কথা। সে গাছের ডালে আটকে যাওয়া এটা-সেটার ওপর দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। নিচে সেতুটা ডুবে গেছে। না এদিকে, না ওদিকে কোন কূলে যাবে? উত্তর থেকে পানি আসছে, দক্ষিণ দিকে ছুটছে পানি। লোকটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু কী করে উদ্ধার করবে? একূল-ওকূল সমান দূরত্ব, সমান বিপজ্জনক। কেউ দড়ি নিয়ে সাঁতরে যাবে তার উপায় নেই। কোথাও নৌকো নেই। নদী তো নয় যে নৌকো পাওয়া যাবে। মাইক থেকে ঘোষণা দিচ্ছে বর্মী ভাষায়। সামরিক লোকজন এসে পড়েছে। কত রকম বুদ্ধি তারা করছে। সবই ব্যর্থ। দড়ি পাঠানো যাচ্ছে না। ছুঁড়ে মেরে দেখেছে। একটু উজান থেকে ভাসিয়ে দিয়ে চেষ্টা করেছে। বোতলে দড়ি ঢুকিয়ে ছুঁড়ে মেরেছে। সামরিক অসামরিক সব চেষ্টা ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে।

এদিকে আমাদের খাওয়া শুরু হয়েছে। মহিলারা দোকানির বাড়িতে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে। আমি আবার গেলাম স্রোতের পানির কাছে। না, কোনো বুদ্ধি আমার মাথায়ও এলো না। স্রোত এত তীব্র যে সাঁতরে যাওয়া অসম্ভব। অনেক লোক এসে জুটেছে। হাজারক বাতি এসেছে। পাশে একটা মন্দির ছিল ওটা ডুবে গেছে সেই বিকেলে। তার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। ভিক্ষু চলে এসেছেন। ছোট বুদ্ধ নিয়ে এসে পাশে কার বাড়িতে যেন রাখলো।

দোকানি মহিলা আমাদের খাওয়ায়। ২৭জনের খাওয়া বাবদ নিল ২১০০ চ্যা। ধরুন ২১০ টাকা। মহিলার স্বামী বিমান বাহিনীতে চাকরি করত। মারা গেছে। দোকানটাও প্রায় গুটিয়ে এনেছে। একবার বলল নতুন করে শুরু করবে দোকান। তবুও মহিলা নিজে থেকে বলল আমাদের খাওয়াবে। তার মেয়ে এলো। খাওয়ায়। টাকা দিয়েও তো এখানে খাওয়া পাওয়া মুশকিল। একেবারে পাড়াগাঁ, বাজার হলে তো অসুবিধে হতো না।

সর্বের তেলে ভাত ভাজা, তাতে কয়েকটা বাদাম। কাঁচা টমেটো, পিঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কার সালাদ। ডিম ওমলেট একটি করে। বাঃ, আর কি চাই। অমৃততুল্য খাবার। পেটে খিদেও জমেছে আকাশের মেঘের মতো। আবার টিপটিপ বৃষ্টি নামল। জ্যোৎস্না উধাও। আরও মেঘ চড়াও হয়ে বসেছে শত্রুপক্ষের অগণিত সৈন্যের মতো।

সন্ধে থেকে লড়াই করে রাত দুটোয় লোকটিকে উদ্ধার করল। তালত ভাই বিকিরণ একটা ব্র্যান্ডি এনে দিল। সবাইকে এক পেগ করে খাওয়াতে হবে। প্রত্যেক দিন নাপ্তি খেয়ে কারো কারো পেট দমে গেছে। উৎপাত শুরু হবে বলে সবাই ভয় পাচ্ছে। সুবুদ্ধি হলো। দোকান থেকে চায়ের গ্লাসে করে সবাই খেল খাওয়ার আগে। প্রীতিদিরও হজম-শক্তি গোলমাল শুরু করেছে।

মুর্ছিত বাসে উঠে এলাম। দোকানের খাটে দু' জন শুয়ে পড়েছে। ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ মহাথেরোর শোয়ার কথা ছিল সেখানে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া দু' জনকে তিনি তুলতে দিলেন না। তাঁর সর্দি হয়েছে গতকাল থেকে। তার ওপর ডায়বেটিস তাঁর। এদিক-ওদিক খুঁজে তাঁর জন্য পাওয়া গেল দুটি আম। সুমনতিষ্য দু' দিন ধরে খালি বমি করেছে। পরমানন্দ ভিক্ষু ভালো আছেন। ড. প্রণব বড়ুয়া ভালো হয়ে উঠেছে। পেট ভালো, কথা বলছে। বিমলেন্দু বড়ুয়া ভালো। দোকানের খাট হয়ে গেছে পালঙ্কতুল্য দামি।

দোকানের বেঞ্চ, টুল নিয়ে কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। দোকানের মালকিন মহিলার বাড়িতে গেল কে কে যেন। ওদিকের ঘরে গেল তিন-চারজন। বাসের সিটে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছি আমি। হাঁটু ভেঙে, জানালায় পা তুলে দিয়ে, কখনো পেছনে বা ওপাশের সিটে ঠেস দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় হাত-পা রেখে ঘুম-জাগরণ-স্বপ্ন-ঘুম করে করে রাত বরষীয়সী হচ্ছে। আকাশে আবার মেঘেদের উড়ো চিঠি চালাচালি শুরু হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না উঁকি দিতে চাইছে আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে না পেরে। না, কোথাও ব্যাঙের ডাক নেই। কিঁঝিও কী নেই? বর্ষার পোকা-মাকড়? কত কী হিজিবিজি স্বপ্ন দেখেছি পরদিন আর মনেই করতে পারলাম না। এ রকমই হয়। রাতে উঠে অন্ধকারে বসে তো স্বপ্ন লিখে রাখা যায় না। মনে না থাকুক, স্বপ্ন যে দেখছি সেটাই অনেক। সকাল সাতটা থেকে বাসে, আরো কত ঘন্টা থাকতে হবে আমরা কেউ জানি না। আমাদের ড্রাইভারও না, গাইড দু' জনও নয়। স্বপ্নও বলে দিতে পারবে না। বুদ্ধও বলবে না। তাঁর 'প্রতীত্যসমুৎপদ' দর্শন সে-কথাই বলে।

ভোর তিনটায় বাকস-পেঁটরা ও জিনিসপত্রের অরণ্য টপকে বাস থেকে নামলাম। না, প্রকৃতি রুদ্ধ হলেও একেবারে বঞ্চনা করে না। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় মেঘ ও আকাশ রূপসীর সেরা হয়ে উঠেছে। একেবারে পশ্চিমে চলে গেছে চাঁদ। ওকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অনুমান করতে পারছি। পানির হু-হু শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আরো অবিশ্বাস্য কাণ্ড এই যে খাটে শোওয়া কণককান্তির নাসিকা নীরব। তার বদলে অন্য কে একজনের মৃদু স্কোভ প্রকাশ পাচ্ছে নাক থেকে। বাসের ভেতর মেয়েদের নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে। ওকি ক্লান্তি! আবছা ধোঁয়াটে পরিবেশ আর জলের বিপুল গর্জন। হালকা ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রলেপ গায়ে লাগছে। কোথায় কোন পাড়াগাঁয়ে ও জুলাইয়ের ভোরে একা জেগে আছি। কোথায় চট্টগ্রাম,

কোথায় ওসাকা বা কোলকাতা। আকাশের বৃষ্টি, সর্পধারী, হারকিউলিস, বীণা ও বকমগুলের তারারা, প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়েরা। ব্যাংককে আলো ফুটেছে। তোকিওতে সকাল, লন্ডনে রাত, গুয়াতেমালায় বিকেল চারটা হবে। বাসে একুশ ঘণ্টা হয়ে গেল, আমার দীর্ঘতম বাসযাত্রা, আর এটিই সুদীর্ঘতম হবে বুঝতে আর বাকি নেই। এখন থেকে ঠিক ঠিক চলতে পারলেও আগামীকাল সকাল নয়টা নাগাদ ফের ইয়াঙ্গুন পৌঁছতে পারব অনুমান করছি। তার অর্থ সময় আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সময় ধরে আমি আগামীকে মাপতে চেষ্টা করছি। কোথায় যেন ঘণ্টা বাজল, এরি মধ্যে পূব আকাশ মরা জ্যোৎস্নাকে স্নান করে আরেক রকম ফর্সা হয়ে উঠেছে। ঘড়িতে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে। উল্লিঙ্গ যামিনী। সুপ্ত বাসে গিয়ে উঠলাম। চোখ বুজে ঘুমের মহড়া বা লড়াই করছি, ঘুমের সঙ্গে ঘুমের জন্য সখ্য। ৩ জুন, ভোর সাড়ে পাঁচটা। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙার কোনো কারণ নেই। অত পাখিই নেই যে গান গেয়ে মাতিয়ে তুলবে। বিস্ময় মানছি। সাত-আটটা গাড়ি জমে আছে। ডুবে যাওয়া রাস্তা ও ছোট পুল ভেঙে গেছে। খলখল ছুটছে বানের পানি। এরি ফাঁকে আমাদের কেউ কেউ প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নিয়েছে। রেস্টুরাঁর মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের শৌচাগার সবাইকে পরম স্বস্তি দিয়েছে। আস্তে আস্তে সাফ-সুতরো হওয়া গেল। ঘুমহীন রাতের পর ভালো করে হাত-মুখ ধুতে পারলেও আরাম। গা ধুতে পারলে তো কথাই নেই।

আবার ফিরছি মিথিলার পথে। তারপরও বিপত্তি। মিথিলা শহরের লেকের বাড়তি পানি সরে নি। সেতু ডুবে আছে। কাজেই গি (Gyi)-এর পথ ধরে থাজির (Thazi) পথে চললাম। এটি পাগান যাওয়ার পথ নয়, ইয়াঙ্গুন যাওয়ার সরাসরি রাস্তাও নয়। ঘুর পথে ইয়াঙ্গুনের রাস্তা ধরব। অনেক পথ ঘুরতে হবে। সেই একই ভোগান্তি। মাঝে মাঝে রাস্তা ডুবে আছে। তবে সমতল ও বিল বলে স্রোত তেমন নেই। জলমগ্ন সমতলভূমি বা উপত্যকা বলা যায়। আমরা মান্দালয় পরিযন্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ছিলাম বলে ১ জুনের রাতে বুঝতে পারি নি যে সে-রাতে কত বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টি তো হয়েছেই তার ওপর পাহাড়ের ঢল এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

গত রাত তো গাড়িতে কাটল। তেমন বৃষ্টি পাই নি। রেস্টুরাঁয় পিন্টু চৌধুরী ছিল। সে নিজের থেকে রেস্টুরাঁর মালিকিনকে এক হাজার চ্যা বকশিশ দিল। আর দিল সি জু তুম্বারে। ধন্যবাদ।

থাজি পৌঁছে রেস্টুরাঁ পেলাম। তেলে ভাজা নলাকার লম্বা পরোটা, আর সমোচা। আছে তেলে ভাজা কড়কড়ে পরোটা ও ডিমের ওমলেট। গরুর দুধের সরসহ চা। আহা, চমৎকার! বড্ড চিনি। তবুও ভালো। রাস্তায় একা গাড়ি। সব ঘুম ভাঙছে অন্যান্য দোকানের। নুডল্‌স্-এর এক ধরনের খাবার আছে। সেই মংডুতে যা খেয়েছিলাম। ক্যাসেটে বর্মী প্রেমগান বাজছে। প্রেমের গানের ভাষা সারা বিশ্বে

বোধহয় এক রকম। বর্মীদের গলায় এক ধরনের বিষণ্ণতা আছে, বা সুরে আছে বিষাদ। এ আমার ধারণা। সম্ভবত এটি মঙ্গোল জাতির বৈশিষ্ট্য। ওরা যখন হাসে তখন উচ্ছল, সুন্দর, খোলামেলা। আর না হাসলে মুখের ভাব হয় বিষণ্ণ। এটি তাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য! তরুণীদের ব্লাউজ ঠেলে বক্ষসম্পদ বেরিয়ে আসে না। বয়স্ক স্থল রমণীর কথা আলাদা। নিতম্ব সুগঠিত কিন্তু নিচের দিকে ও পেছনে প্রসারিত। হয়তো পাহাড়-পর্বতে কাজ করতে করতে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। তাও লক্ষ লক্ষ বছরের অর্জন।

সোয়া নয়টা। চ্যোনা (Kyona) পেরিয়ে গেলাম। দক্ষিণ দিকে ছুটছি। বাঁয়ে নির্দেশিকায় দেখা যাচ্ছে তুয়াং গি (Tuang Gyi) শহর। রেলপথ আছে। পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ হচ্ছে। পাহাড়ে ক্যাকটাস। ওদিকে ছাগলের পাল। বড় বড় কাঠের ড্রাম গরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে। ওতে খাওয়ার পানি। মেঘের উড়ন্ত কার্পেট। পাহাড়ের শিখরে নেমে এসেছে এক প্রান্ত, আরেক প্রান্ত উড়ছে, যেন পাহাড় বসে বসে মেঘের ঘুড়ি ওড়চ্ছে। বিশাল বিশাল রাস্তা। রাস্তা যত না বড় তার চেয়ে দু' পাশের সীমা তিন গুণ বড়। দু' পাশের সীমায় দু' সারি করে গাছ রুয়ে ঘিরে দিয়েছে। এই বর্ষায়ও গাছের পরিচর্যা করেছে। গোড়ায় যাতে পানি না জমে তাই সরু নালা কেটে দিচ্ছে। গোবর সার দিচ্ছে। রাস্তা বড় হলেও ভালো নয়, ভেঙেচুরে কাহিল। ধানজমি তৈরির প্রথম পর্ব শেষ। জমি এক চাষ দিয়ে ফেলে রেখেছে। বিশাল বিল, পুরো বিল চাষের আওতায়। বিলে মাঝে মাঝে বাবলা গাছ। তেঁতুলও আছে, ঝাঁকড়া মাথা। আগাম ধান ছিটিয়ে কোথাও-বা চাষ করেছে। মাঝে মাঝে অগভীর ডোবা। গাছপালা খুব কম। গ্রামও খুব ছোট এবং অনেক দূরে দূরে। তেপান্তরের মাঠ বলাই ঠিক। লোকজন এত কম যে আমিই শঙ্কিত হয়ে পড়ছি। আমরা ভিড় দেখে এবং ভিড়েই বোধহয় স্বস্তি পাই। সেই কতক্ষণ আগে যে পাখি দেখেছি, ছোট এক ঝাঁক বক বিলে মাছ খুঁজছে। ব্যাস্, ওই পর্যন্তই। আগাম চাষ করা ধানে মেয়েরা নিড়ানি দিচ্ছে। হাল দিচ্ছে পুরুষেরা। এখানে অন্য জায়গার মতো মোষ দিয়ে চাষ নেই।

মধ্য দুপুর। শোয়ে দা (Shwe Da) গ্রাম। গ্রামগুলো একেকটি টাউনশিপের অধীনে ন্যস্ত। এটি ইয়া মেল থিং (Ya Mel Thing) টাউনশিপ। একটা রেস্টুরাঁ পেয়ে বাস থামল। মুখ-হাত ধুয়ে সোজা টেবিলে। সরু সরু, কড়ে আঙুল থেকে সরু করে ছাগলের মাংস ভাজা হয়েছে। আঙুল পরিমাণ লম্বা। চিপসের স্টিক যেন। সঙ্গে লেপ্ পে ছউ ও ভাজা বাদাম। লাল লঙ্কা বাটা। এর বেশি দিতে পারল না। তাই সই। মুটমুট করে মাংস ভাজা চিবুছি। লঙ্কা বাটা দিয়ে ভাত খাচ্ছি। এর স্বাদ একেবারে আলাদা।

সুশ্রী এক তরুণী আঙুর বিক্রি করছে। ২০ চ্যা দিয়ে বড় দু' থোকা আঙুর। আমাদের দু' টাকা। উপরি দিতে বলাতে বিরক্তি প্রকাশ করল ভুরু কুঁচকে। গায়ে

আটোসাঁটো গেঞ্জি। না হাসলে মুখ গোমরা বলতে হয়। আঙুর নিয়ে ৫০ চ্যার নোট দিলাম, খুচরো আছে ২০ চ্যা। বাকি ১০ চ্যার আঙুর নিতে বলে দিল। শেষে বাকি ১০ চ্যার আঙুর নিতেই মুখে হাসি ফুটল অমলিন। আক্রমণাত্মকও বলা যায়। অমনি প্লেট নিয়ে দোকানের কলসি থেকে পানি দিয়ে ধুয়ে এনে দিল। তারপর ওপাশে মিয়ানমার যুবকদের সঙ্গে দিব্যি আড্ডা জমিয়ে তুলল। যখন হাসে না মুখশ্রী বিষাদের কাছাকাছি থেকে গভীর গভীরে চলে যায় আস্তে আস্তে। তবুও ওর ভঙ্গি খুব সুন্দর। তাকিয়ে থাকতে হয়, আকর্ষণ করে, জ্বালাও আছে। যখন হাসে এবং একবার তো ভুবনমোহিনী হাসিতে ঝড় তুলল। সুন্দর করে চুল বেঁধেছে। সামনে দু' গাছি কপালের পাশে নেমে মাঝে মাঝে বিভ্রামাত্মক ও উসকানিমূলক লাফ-ঝাঁপ দেখাচ্ছে, মণিপুরী নৃত্যের মতো কখনো ধীরস্থির। চোখ দুটি ঠিক তার উপযোগী। ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ও বোঝাতে গলদঘর্ম। সামনে দুটি মোমবাতি জেলে আমার টেবিলে বসেছে। আঙুরে মাছি বসছে। একটু পানসে, মাঝে মাঝে সামান্য টকসে। মোমবাতি কেন জ্বালল কিছুতেই বুঝতে পারি না। শেষে দেখি মাছি সরে গেল। তাই, মাছি দূর করতে মোমবাতি ও দেশলাই রেখেছে টেবিলে! খুব মাছি টেবিলে। আমাদের দেশে অনেক রেস্টুরায় এ রকম। এক মিয়ানমার যুবক, ওর চেয়ে বয়সে বড়, বলল, আই লাভ ইউ। অমনি মেয়েটি তার পা ধরে উল্টে দেওয়ার অবস্থা। বেশ জাঁহাজ মেয়ে। সুগঠিত বাহ ও কবজি। শক্তি উপছে পড়ছে। ওর নাম মা ওয়ে। অনেকক্ষণ ধরে ওদিকে পানের দোকানের ছোট্ট মেয়েটির পাশে বসা তরুণটি, চায়ের দোকানের দুই তরুণ ও অন্য এক তরুণীর সঙ্গে বকর বকর করছিল। বুঝতে পারছি ঠাট্টা-মশকরা চলছে। জীবনীশক্তি খরচ করছে, ঘুমুবার আগে যেমন শিশুদের দুরন্তপনা।

পাশের যুবকটি বলল, না, মা ওয়ে অবিবাহিত। বয়স কুড়ির মতো। একটু বেশিও হতে পারে। অন্য তরুণটি তন্দ্বী, ছোট খাটো। সেও সমানে দুষ্টমি করছে যুবকদের সঙ্গে। ভাষার জন্য বুঝতে পারছি না এক বর্ণ। যতক্ষণ ছিল মাতিয়ে রাখল রেস্টুরা এবং সেই সঙ্গে আমাদের। জীবনীশক্তিতে ভরপুর। সোজা-সরল বলে গ্রাম্যতা-দুষ্ট বলা যায়? কিন্তু যৌবনের ধর্ম তো গ্রাম-শহর বাহ-বিচার করবে না। আমি শহুরে বলে ওর ব্যবহারে গ্রাম্যতা আছে বলতে দুঃসাহস দেখাচ্ছি। আর ও-তো গ্রামের মেয়েই। সামান্য লেখাপড়া হয়তো শিখেছে। আঙুর বা নানা জিনিস ফেরি করে। ওর সারল্য বা গ্রাম্যতা খুব ভালো লাগছে বলব। আমাদের ডেপুটি গাইড এসে ওকে কি যেন বললেন। অমনি সে চুপসে গিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ এখন সে তথাকথিত সভ্য হয়েছে, তার স্বভাবসুলভ সারল্য গুটিয়ে নিয়েছে। আঙুর খাওয়া হয়ে গেল। আবার এক ঝলক এসে কত কী বলে গেল বর্মী ভাষায় তার স্বদেশীদের। মনে হলো সে আমাদের নিয়ে নিঙ্কলুষ রসিকতা করেছে। এজন্যই কী বলে, 'বর্মী মেয়ে কত ঠমক জানে, ঝুঁড়ার আগাত পানের খিলি, ইসারাতে টানে।'।

দোকানের ছোট মেয়েটিও তাই। সে আসতে-যেতে বর্মী যুবককে পিঠে আদর করছে কিল মেরে, বুকে চিমটি কাটছে। কিন্তু খুব সাবলীল, কোনো আবিলতা নেই কারুর মধ্যে। যুবকটি কি তাকে প্রশ্ন দিয়েছে?

এরি মধ্যে দলের লোকজন টুথপেস্ট, ব্রাশ, আচার, ব্যাগ, সাবান ইত্যাদি কত কী উজাড় করে কিনল! ছোট দোকান, স্টক থাকে কম, একজন কিনল তো সেই জিনিস শেষ। আর কেনে দু'-একটা নয়, স্টক উজাড় করে। আমি বাঁশের ইজি চেয়ারে শুয়ে আয়েশ করছি। খাওয়ার সময় গলা তো একটু ভিজিয়েছি সবার সঙ্গে। ওই যে পেট ঠিক রাখার অভ্যুহাতে! মহাথেরো বাসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। রেশুরার এক তরুণীর নাম টে টে। সব রেশুরায় মা-মেয়ে-ছেলে এক সঙ্গে কাজ করে। একটা বাস আসতেই টে টে হকার হয়ে ছুটে গেল বাসের দিকে। দু' গালে সেনেকার। কমণীয় বাহুলতা ব্লাউজের বাইরে লতিয়ে আছে। অন্য সময়ে সে দোকানের বিক্রয়-বালিকা।

ওপাশের একটা দোকানে গিয়ে এক টিন বিয়ার গলাধঃকরণ করে নিলাম। ২৫০ চ্যা। আরো এক টিন চেখে দেখব নাকি। লন্ডন সিগারেট ২০০ চ্যা। আগে কিনেছি ২৫০ থেকে ৩০০ চ্যা। এখানে মাইন্ড সেভেন নেই! গাড়ির দুটি চাকার ফুটো সারাই হতে আর দেরি নেই। এখানে কোথায় কোন জিনিস কত দাম হবে তা কেউ বলতে পারবে না। একজন পাঁচশ' টাকা বদলে চ্যা নিল সিদ্ধার্থ থেকে। কেউ টুথব্রাশ, কেউ সৌখিন ব্যাগ, কেউ আম, অন্য কারুর হাত-ভর্তি অন্য রকম জিনিস। স্ত্রী তার স্বামীকে তাড়া দিচ্ছে, ওটা কিনলে না কেন? একজন টর্চ কিনে আনল ৬০ চ্যা দিয়ে। সে কী! এত সস্তা?

দোকানের মেয়েরা ভাবছে, কোন উজবুক দেশ থেকে এরা এলো রে বাবা! যা পায় কেনে। বিস্ময়ে তাকায় আর দরকষাকষি করে। আবার গিফটও দিচ্ছে। আমি ওই যে বুদ্ধ, হাতি, ব্যাঙ, পাথরের মালায় আটকে আছি। তার চেয়ে বসে বসে টাইগার গেলা অনেক মজার, দিবান্বপ্নে বৃন্দ হওয়া যায়। হে মহামুনি বুদ্ধ, তুমি আমাকে একটু একা করে দাও, আমাকে কোনো জাদুতে যদি বর্মী ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিতে পার?

সন্ধেয় বাস এসে থামল যে জায়গাটায় তার নাম কাওয়াটে। যাওয়ার পথে এখানে খেয়েছিলাম। বড় রেশুরা। খুব সুন্দর, ঝকঝকে। খোলা বারান্দায় বেসিন আছে হাত-মুখ ধোয়ার। একদল যাত্রী এলো। থাইল্যান্ড থেকে এসেছে। তরুণ-তরুণীরা। ফিটফাট পোশাক। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। ৭৫০ মি.লি হুইস্কি ৫৫০ চ্যা। কে জানে ওতে পানি নাকি আসল জিনিস আছে! মাত্র ৫৫ টাকা? গাড়ি আবার ছুটল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। তার অর্থ গাড়িতে বৃষ্টি পড়বে। কন্ডাক্টর ছিদ্র বন্ধ করতে চ্যাপটা টেপ সেন্টে দেবে। ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে বাসের গা মুছে দেবে, কাচের জানালার পাশ দিয়ে বৃষ্টি ঢুকবে। চোখে আলতো ঢুলুঢুলু ভাব জমবে। মেয়েরা হঠাৎ চোঁচিয়ে

উঠবে, ভিজে গেলাম বলে। তাদের স্বামীদের তৎপরতা বেড়ে যাবে। ঢুলুঢুলু স্বপ্ন-
নেশা কেটে যাবে। ছোট্ট সামান্য এক টুকরো স্বপ্নটা পুরো দেখা হবে না, মা ওয়ে
বা টে টে তো মায়া, স্বপ্ন ছায়া। সেই ছায়া নিয়েও ছায়াবাজি করা যাবে না।
পেছনে দেবশিশ এ সময় কেন যে 'স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর, তুমি-আমি দু'জন
প্রিয়' গেয়ে উঠল সে-ই জানে। তারও পেছনে পুলক বাসের ঝাঁকুনিতে তুর্কি নাচবৎ
লাফাচ্ছে। অন্ধকারে মিয়ানমার ভেসে যাচ্ছে, বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে বাসের ভেতরটা,
কভাস্টার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে চালের ফুটো বন্ধ করতে টেপ লাগিয়ে।

রাত সাড়ে বারোট। থিউ শহর। বাস থামল। ভালো একটি রেস্টুরাঁ পেলাম।
বাথরুম ও কফিমেট খাওয়া হলো। অমৃততুল্য স্বাদ। এক প্যাকেট কফি মোট টাকা
তিনেক বা ওরকম কিছু হবে। মা, তিন মেয়ে ও এক কিশোর বালকের দোকান।
না, এ দেশে থাকা যাবে না। যে দেশে সুন্দরী মেয়েরা রাত বারোট। পর্যন্ত
পুরুষদের জন্য দোকান খুলে রাখে, চা বা ভাত-ভাজা খাওয়ায়, ভুবনমোহিনী হাসে,
যেখানে এক বোতল ব্রাডির দাম মাত্র ৪০ টাকা, দরদাম করে জিনিসপত্র কেনার
পর চাইলে গিফ্টও দেয়, তারপর স্বপ্ন দেখায়, ভাষা না জানলেও চোখ ও হাসির
উসকানিমূলক ভাষায় সব পুষিয়ে দেয়—সে-দেশে থাকা যায় না। এত জায়গা ঘুরে
এলাম কোথাও কোনো ঝামেলায় পড়লাম না; না, এ আমার পোষাবে না, এত
সরল সোজা নিস্তরঙ্গ ধারায় আমি জীবন কাটাতে পারব না। টেনশন না থাকলে
ওটা আবার জীবন হল?

এমন সময় ড. প্রণব বড়ুয়া বলল, ভাগ্যিস কেনাকাটার দোকান বন্ধ। আচ্ছা,
দোকান না হয় বন্ধ হলো। এবার বেমক্লা বলে দিল, আচ্ছা, মিয়ানমার সরকার যদি
সুযোগ দেয়? তাহলে কে কে এখান থেকে বউ নিয়ে যেতে? কে কে? সবাই নীরব।
যাদের বউ আছে তারা চুপ।

আমি থাকতে পারলাম না। বললাম, যাদের বউ আছে তাদের মধ্যে
বাংলাদেশ-পাকিস্তান লড়াই শুরু হতো। মনে মনে। ঠাণ্ডা লড়াই তো বটেই।

ভোরের কাগজের অলক গুপ্ত বলেছিল ওর জন্য ওখান থেকে একটা বউ নিয়ে
যেতে। আমি অলককে বলেছিলাম, না, বউ-টউ আনা খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ,
বিপজ্জনক। কোথা থেকে কী হয়ে যায় বলা মুশকিল।

প্রশ্ন শুনে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমি হরদম মনে মনে প্রেমে পড়ে
যাই। যখন-তখন বলি, এক বউ নিয়ে জীবন কাটানো অনুচিত। এমনকি পরকীয়া
প্রেমেও আমার সায় নেই বলব না। এসব কথা এখানে বলা যায় না। আর প্রণব
বড়ুয়ার ছেলে আছে সঙ্গে, মহাথেরো ও দুই ভিক্ষু আছেন, শচীনদা ও প্রণব বড়ুয়া
বিপত্নীক, অন্যরা সবাই বিবাহিত। সবাই চূর্ণচাপ। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম,
না, বউ নিয়ে দেশে যাওয়া যাবে না, এখানেই থেকে যেতে হবে। আমাকে নিয়ে
আমার বউয়ের ভয়ও তখন সত্য হবে। আলোচনা আর এগোল না। বাসের পেছন

থেকে আমি সাড়া দিয়েছিলাম। তারপর কারো সাড়া না পেয়ে চূপচাপ বসে আছি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে আরো চূপসে গেলাম। এরি মধ্যে ৪২ ঘণ্টা বাসে বাসে কেটে গেল। অন্ধকার ও বৃষ্টি চিড়ে গাড়ির হেডলাইট পথ করে নিচ্ছে, বিদ্যুচ্চমকের মতো।

আস্তে আস্তে বৃষ্টি থেমে গেল। হঠাৎ দেখি ত্রয়োদশীর চাঁদ। মেঘের অসংখ্য চিঠিতে জ্যোৎস্নাকুমারী জবরদস্ত অগ্রাসের শিকার। ফিকে ফিরোজা রঙ বেরিয়ে এসেছে ওই টুকরো টুকরো চিঠির ফাঁক দিয়ে। থিউ শহর ফেলে এলাম পথে। জ্যোৎস্নাকুমারীর হাসির ফাঁক-ফোকর দিয়ে ওর আশপাশ দেখার কাজ চলছে। বর্ণনা আর নয়, এবার ঘুম এক-আধটু দরকার। আমাদের তো পেছনের আসন বরাদ্দ, পাশ থেকে সিদ্ধার্থ চলে গেছে, গাড়ির ইঞ্জিনের কাছে রাখা চাকার ওপর। বসে-শুয়ে ঘুম। শরীর এবার বেশ অসাড়, অনুভূতিশূন্য। কিন্তু মন বেশ উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভ্রমণশীল থেকে ফিরে এসেছে ক্লান্ত শরীরে। বাসের লক্ষ্যবিন্দু, ধাক্কা ও দুলুনিতে ঘুম ঘুম অচৈতন্যভাব ফিরে এসেছে।

কোথায় যেন কে বলল, উইন্ গে। ভেতরে এসো।

আমি বললাম, আ না যায় গী। তুমি দয়াবতী।

ও বলল, আ মা না বা নে। অপ্রতিভ হওয়ার কি আছে?

আমি বললাম, দা গে লা, আ হউ লা? সত্যিই?

সে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, হউ তে, দাগে বি। হ্যাঁ, সত্যিই।

আমি বললাম, এখানে কেউ এসে পড়বে না তো?

স্বপ্নে জড়ানোর মতো ওর কথাগুলো ভেসে এলো, দুপুরের সুগঠিত নিতম্বের মেয়েটির কথা মনে পড়ে?

মা ওয়ে? নাকি টে টে। ব্যথা সারলেও তার চিহ্ন কি থাকে না?—আমি ভাবলাম।

আমি আর থাকতে পারলাম না। যা বলব না ভেবেছিলাম সেটা বলেই দিলাম, ওই যুবকটির পিঠে এত কিল মারছিলে কেন, বুকে চিমটি?

টে টে বলল, সত্যি! ও তো আমার দাদা। মা ওয়ে-কে সে প্রেম নিবেদন করেছে। আমাকে বলছিল চিঠিটা দিয়েছি কিনা। আমি বলছিলাম, ওটা হারিয়ে গেছে। আর বলছিল তোমাকে আমার পছন্দ কিনা। তোমাকে অপছন্দ করার সাহস আমার নেই। একটু বয়স বেশি, এই যা। বড্ড চূপচাপ ধারালো তুমি।

আমি বললাম, সত্যি, ভাবতেই পারি নি আমাকে নিয়ে তুমি তোমার ভাইকে...।

টে টে বলল, তাড়াতাড়ি এসো! তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? সত্যিই?

ওর বদলে আমার চোখে অশ্রুবিন্দু রেখা টেনে দিতে চাইছে। আমি গভীর এক অনুরাগের চাদরে ঢাকা পড়ে যেতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারছি আমাদের দেশ

থেকে লোকেরা এসে কেন এখানে বিয়ে করে। আমার এক বিবাহিত আত্মীয় কাকা এখানে একটা বিয়ে করে। আর এক কাকার মেয়ে এখানে বর্মী বিয়ে করে থেকে গেছে। আমিও বিবাহিত। এখন আমি বুঝতে পারছি আমার কাকা বর্মী মহিলাকে নিয়ে কত সুখী ছিল। কাকাকে ছেড়ে আমার মন বেরিয়ে টে টে-র চারপাশে ঘুরতে শুরু করল। এখনি ঢুকে পড়বে। মন-মন্দিরের অজস্র বুদ্ধ আমাকে তুলে টে টে-র গলায় ঝুলিয়ে দিল। কিন্তু মনের গভীরে কী যেন বাধা পেল। ও আসলেই কি টে টে? মন-মন্দিরের বুদ্ধ কি এমন কাজ করতে পারে?

টে টে আমার মনের ভাব বুঝে বলে উঠল, ভুলে যাও তোমার বউয়ের কথা। ওসব কিছুই না, কোনো ব্যাপার নয়। কিচ্ছু না।

আমি চমকে উঠে বললাম, কি বললে?

টে টে ভোরের কুয়াশায় সদ্য ধোয়া সেন্না পাতার মতো চকচক করে ভেসে উঠে সবকিছু ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করে দিল। সে এক গভীর গ্রাহী হয়ে আমাকে তার উষ্ণ গভীর সুরভির মাঝে পুরোদমে ডুবিয়ে নিতে লাগল। আমি ভাবতেই পারি নি কোনো নারী এত নমনীয়ভাবে যত্ন করে আমাকে গ্রহণ করতে উৎসুক এবং পারঙ্গম। আসলেই কি ও টে টে? কই না তো, মঙ্গোল চেহারা, কিন্তু টে টে বা মা ওয়ে কেউই নয়। কী প্রীতিভরা তার চাউনি ও প্রতিধ্বনি। কী বিপজ্জনক কিন্তু সহানুভূতিশীল; ডাকসাইটে সুন্দরী এবং নমনীয়।

ও বলল, আর অমন করে দেখো না। বলল বটে কিন্তু নারীত্বের ঢেউ ছেড়ে দিল। সে ঢেউয়ের টানে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল, যেন ভাসিয়ে নেওয়া নয় আমার যুদ্ধজয়ের সফল অভিযান, যেন চাঁদ লুট করে নিয়ে এসে বুকে পুরে রাখা, না না, যেন ছায়াপথের দুধের নদীতে অবগাহন, যেন নক্ষত্রলোকের নীহারিকা মণ্ডলে ঘুরে বেড়ানো।

আধো-জাগা আধো-ঘুমেই শুনতে পেলাম পাখি ডাকছে। এই প্রথম মিয়ানমারে এক সঙ্গে অনেকগুলো পাখির ডাক শুনতে পেলাম। তাও কাক, দাঁড়কাক; জীবনে এত মিষ্টি আর কখনো মনে হয় নি ওদের। ভোরের আলোয় সেন্না গাছের পাতা এত চকচক করছে যে আমার স্বপ্নমাখা চোখ বুজে আসছে। গাড়ি আগেই থেমে গেছে। বৃষ্টিতে সেন্না গাছের নবীন পাতা এ-রকমই হয়। আর তার পাশে সোনালি ফুল ফুটলে কেমন লাগে তা আরো ভালোভাবে দেখার জন্য স্বপ্নের মঙ্গোলপ্রতিম নারীর উষ্ণ সুরভির মাঝে কল্পনায় আবার নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ায় সচেতন হলাম। বৃথাই সে চেষ্টা। সোনালি সেন্না ফুল বলে উঠল, জীবনের কোনো কিছুই যাবে না ফেলা। এই স্বপ্নও তোমার সঞ্চয় হয়ে থাকুক।

৪ জুন। ভোর রাতে একটানা দু' ঘন্টা চলার পর গাড়ি থামল ইয়াঙ্গুন শহরে ঢোকান মুখে। আশেপাশে কোনো দোকানপাট নেই। একজন রেগে গিয়ে বলল, এ কী কাণ্ড, কোনো চায়ের দোকানের পাশে থামলেও তো চা খেতে পারতাম। অন্য

একজন বলল, গাড়ির চাকা ঠিক করে তাতে হাওয়া দিয়েছে হার্ড করে, এজন্য গাড়ির গতি কমে গেছে। অন্যজন একটা বিশী গাল দিয়ে বলে উঠল, বাচ্চাটা গাড়িই চালাতে জানে না। আরও মন্তব্য এলো, দু' রাত পথে কেটে গেল, গাড়ির চালক একটা আস্ত শয়তান। অন্য মন্তব্য এলো, ড্রাইভার থাকুক, চলুন আমরা হেঁটে ইয়াঙ্গুন চলে যাই। কথাগুলো কি রসিকতা মাত্র? ড্রাইভার কি সত্যিই অযোগ্য? না, তা কোনোমতেই হতে পারে না। আমি বললাম, আপনারা সবাই হেঁটে গেলেও আমি না। ড্রাইভারের সঙ্গেই যাব। বলে আমি চূপ করে গেলাম। আমাদের দীর্ঘ ৪৯ ঘণ্টার অবিচল ভ্রমণ শেষ হতে চলল।

ড. প্রণব বড়ুয়া ও বিকিরণ চূপচাপ। সিদ্ধার্থ বলল, ড্রাইভার বলেছে, ছয়টা থেকে সাতটায় গাড়ি ইয়াঙ্গুন শহরে পৌঁছে যাবে। আমিও ড্রাইভারকে বিশ্বাস করি। সে সারা রাত জেগে গাড়ি চালিয়েছে। আমরা তো একটু হলেও ঘুমিয়েছি। দায়িত্ব তো ওর। দেরি করে ফিরলে ওর কোনো লাভ নেই। কষ্ট ওর সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তার সহকারী ম্যাও চটপটে হাসিখুশি। করিভকর্মাও বলা যায়। না, ওদের দোষ দেব না। বুদ্ধ বলেছে, সকল প্রাণীর প্রতি অপরিসীম মমতা ও করুণা পোষণ করতে, নিজের সম্ভানের মতো, মা যেমন তার সম্ভানকে তার সমস্ত আয়ু দিয়ে রক্ষা করে তেমনি করুণা করতে হবে সকল জীবের প্রতি। কেবল মানুষ নয় সকল জীবের প্রতি। এই ড্রাইভার ও ম্যাও-কে আমি পরিয়ন্তি শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার চ্যা দিয়েছিলাম কিছু জিনিস কিনতে তার থেকে অন্তত দেড় হাজার চ্যা ফেরত পাব। এখনো দেয় নি, আর দেবেও না। তারপরও কিন্তু ওর প্রতি কেন জানি বিরূপ হতে পারছি না। ওর যোগ্যতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

সকাল সাতটায় ইয়াঙ্গুনের ষষ্ঠ সঙ্গীতায়ন অতিথিশালায় বা কাবায়ে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। আমাদের ৪৯ ঘণ্টার সুদীর্ঘ বাস ভ্রমণ শেষ হলো। কত কথা আর ঘটনা যে বাদ গেল। পথে যে রেষ্টুরায় কুকুরে আমার বাঁ পায়ের প্যান্টের পা কামড়ে ধরেছিল সেটা ফেলে এসেছি রাতে। গৌরী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বিরূপ মন্তব্যগুলো কে কে করেছে সবই আমার নোট খাতায় রয়ে গেছে। না, সেই নামগুলো বলা শোভন নয়। আমার মেজাজও এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে পেছনের আসনে বসে মাঝে মাঝে তিরিফি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা-না-দেখা স্বপ্নগুলো আমাকে বাঁচিয়েছে। আধো-ঘুম ও জাগরণে আমার স্বপ্নরা আমাকে রক্ষা করেছে। মিয়ানমারের নিষ্পাপ বোনতুল্য কুমারীরা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। ওদের হাসি ও চোখ এক অমূল্য সম্পদ। আমাকে ওরা সহবত শিখিয়েছে, স্বপ্ন দেখতে উৎসাহী করেছে, কল্পনার জাল বুনতে সূক্ষ্ম তত্ত্ব সরবরাহ করেছে। আমার এই লেখায় প্রেরণা দিয়েছে। ওরা বলেছে, দেখো, তুমি একজন শিল্পী, তোমার মন ছোট করো না, আমাদের কলঙ্কিত করে কিছু লিখো না, সত্য কথা লিখো। তোমার লেখা না

পড়লেও তোমার বিবেকের ওপর আমরা আস্থা রাখছি। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। মিয়ানমারের কুমারীদের তুমি কতখানি দেখেছ বা চিনতে পেরেছ জানি না। তোমার লেখায় তারা উঠে আসুক কল্পনা আর বাস্তবের মিশেলে।

এখন আমি নিজেও বিস্মিত হচ্ছি যে এত সব কি আমি সত্যিই দেখেছি, নাকি সব স্বপ্ন! একই জায়গায় তিন সকালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাবায়ে ধর্মশালাকে মধ্যস্থ মেনে নিলাম।

ইয়াঙ্গুনের বড়য়ারা ও শ্রীকান্তের অভয়া

কাবায়ে ধর্মশালায় যেন ঘরের ছেলের মতো মনে হলো নিজেকে। শরীরের ক্লান্তি অনেকখানি কেটে গেছে স্নান করে। ধর্মশালার বিশাল হলঘরের এক পাশে দুটি কামরা। আরেক পাশে একটি দরজা এবং ভেতরে অনেকগুলো ঘর। সেদিকে আগাদের কোনো দরকার নেই। অন্য পাশে শৌচাগার। একদিকে মেয়েদের, পাশে পুরুষদের। দরজা একটি, কিন্তু ভেতরে আলাদা। হলঘরের সামনে প্রশস্ত ছাদ, খোলা বারান্দার মতো। ওখান থেকে সুউচ্চ প্যাগোডা, কুটিরশিল্পের দোকান, অদূরে খাওয়ার হলঘর চোখে পড়ে। ডান পাশে প্যাগোডায় ওঠার সিঁড়ি যথারীতি জম্যানো ছাদ দিয়ে ঢাকা। সিঁড়িঘরের ভেতরে দু' পাশে দু' সারি দোকান। সিঁড়ি উঠে এসেছে শহরের মূল রাস্তা থেকে। রাস্তা থেকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত প্রশস্ত সিমেন্ট করা উঠোন। উঠোনে দু' দিকে তিনটি বড় বড় চায়ের রেস্টুরা। উঠোনের মাঝখানে একটি ছোট ঘর, তার সঙ্গে একটি বাদাম গাছ। সেখানে রাজ্যের যত সুখী পায়রা। লোকজন এসে ওদের খাবার দেয়। সারাক্ষণ পায়রাগুলো 'গুড গার্ল গুড গার্ল' বলে সঙ্গিনীদের কাছে ভালোবাসা বিতরণ করে।

দুপুরে চট্‌থাম বৌদ্ধ সমিতি তাদের মন্দিরে নিমন্ত্রণ করেছে। গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম। ইয়াঙ্গুনের পথঘাট তো চিনি না। ভারি সুন্দর শহর। উঁচু-নিচু টিলায় ঘরবাড়ি। অনেকখানি চট্‌থাম শহরের মতো কিন্তু অত উঁচু পাহাড় নেই। নিচু টিলা রেখেই রাস্তা ও ঘরগুলো তৈরি। প্রচুর প্রাচীন গাছপালা আছে ফুটপাথের পাশে ও অফিসের সীমায়।

ইয়াঙ্গুনের প্যাগোডা ও মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে দীন এই মন্দির। বহু পুরনো, তা শতাব্দীর তো হবেই। (পরে জেনেছি ২০০২ সালে তারা এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন করবে।) চট্‌থামের বিভিন্ন থানার মানুষ আছে। রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া, বোয়ালখালি, সাতকানিয়া, ফটিকছড়ি সব থানার মানুষ আছে। সবাই যে-যার গ্রামের মানুষ ঝুঁজছে। চট্‌থামী ভাষায় মন খুলে কথা বলছে। এখানে আকিয়াবের মতো বড়য়ারা সম্ভব নয়। কে কবে এসেছে অনর্গল বলে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের

ছেলেমেয়েরা মন্দিরে আজ আসে নি। পরবর্তী বংশধরেরা বার্মাকে কি চোখে দেখে তা জানার উপায় নেই। এমন সময় সুন্দরী সুস্বাস্থ্যের ও দীর্ঘ চিকুরের অধিকারী দুই মহিলা এলো। একজন পা খুঁড়িয়ে হাঁটে, মুখটা ভারি মিষ্টি। পঞ্চাশের কোঠায় বয়স। অন্যজনও একই বয়সী, সুন্দরী। তার নাম পামেলা বড়ুয়া। বাবার নাম বিনোদবিহারী বড়ুয়া। ইয়াঙ্গুন ও চট্টগ্রামের এক সময়ের নামকরা মানুষ।

পামেলা বড়ুয়া একে একে সবার সঙ্গে কথা বলছে। আমি এদিকে আমাদের গাইডের সঙ্গে বসে সিগারেট খাচ্ছি। ভাস্তুরা ছোয়াইং খেয়ে বুদ্ধবেদির সামনে বসে বিশ্রাম করছেন। ছোট ছোট দলে নিজ নিজ এলাকার মানুষের সঙ্গে বসে গল্প হচ্ছে। দুঃখ-সুখের দোলায় বসে কথার মালা।

আস্তে আস্তে নজর-কাড়া ভঙ্গিতে পামেলা এগিয়ে এলো। আমি হলঘরের এক পাশে বসে আছি। পামেলা এসে নিজের থেকে পরিচয় দিল। ড. প্রণব বড়ুয়া আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। অমনি পামেলা তার পরিচয় কার্ড এগিয়ে দিল। আমিও দিলাম। দু'জনে পড়ে নিলাম। পামেলা পরিচয় করিয়ে দিল সঙ্গী সুন্দরী জায়ের সঙ্গে। পামেলা প্রিন্টিং প্রেসের মালিক, প্রেসের নাম এস. টি. পি অফসেট প্রিন্টিং প্রেস। ইংরেজি, বর্মী ও বাংলায় ছাপার কাজ করে। বাড়ি চাউকটাডা টাউনশিপ, ইয়াঙ্গুন। প্রেস বসুনপাত স্ট্রিট, পাবেদান টাউনশিপ, ইয়াঙ্গুন। কথা বলতে বলতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন খাওয়ার ঘরে। সবাই বসে গেছে। পামেলার টেবিলে আমিও বসলাম। সেই চিরাচরিত হাতখানেক উঁচু টেবিল, মেঝেতে বসে খেতে হবে।

পামেলা বলল, রান্নাবান্না আমিই করেছি, দেখুন কেমন হলো, খেতে পারেন কিনা।

আমি বললাম, সুন্দরীর হাতের রান্না কখনো খারাপ হয় না, এটা জ্ঞানীশুণীদের কথা, সত্যবাদীদের কথা কখনো বিফলে যায় না।

পামেলা বলল, কী মুশকিল বলুন তো! আপনি না খেয়েই প্রশংসা করছেন—বলে তার ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পঁচিশ-তিরিশ বছরের দীর্ঘদেহী সুন্দর যুবক। আমাদের পরিবেশন করছে। মুখে হাসি লেগে আছে প্রসাধনের মতো।

পামেলা বলল, দেখুন, আমার দুই ছেলেমেয়ে। স্বামী নেই। ছেলেমেয়েরা কিছুতেই আমাকে ব্যবসা করতে দিতে চায় না। আমি ইতোমধ্যে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছি। ঘরে বসে থাকব কেন? দেখি না বড়লোক হতে পারি কিনা। এখানে মেয়েরা বসে থাকে না। পুরুষেরাও ঠাকানোর জন্য ওত পেতে থাকে না।

আমি সমর্থন করে বললাম, এখানে তো মেয়েদের রাজত্ব। আপনিও পারবেন।

আপনি কী করে জানেন যে পারব? বলে সুন্দর নির্মল আবেদনঘন ও প্রাণময় বিভঙ্গে হাসল।

আপনার সপ্রতিভ ভঙ্গিই বলে দেয় আপনি বুদ্ধিমতি। আপনার হাসিও।

আপনি তো খুব প্রশংসা করলেন। সেই বিখ্যাত রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসটি এখন আমার এস. টি. পি প্রেস বুঝলেন মশায়! আপনার প্রশংসা শুনতে খুব ভালো লাগছে।

আমি বললাম, তাই? রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসের ডজনখানেক বই আমি দেখেছি। আমার কাছে চার-পাঁচটি আছে। কিছু বই তাইওয়ান থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়ে হাতে এসেছে। ‘সন্ধর্ম্ম-রত্নাকর’ ছাপা হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। তখন আমার জন্মই হয় নি।

আমি চেষ্টা করছি প্রেসটাকে বাড়াতে। যদি পূর্ব গৌরবের কিছু ফিরিয়ে আনা যায়।

পামেলা খেতে খেতে বাঁ হাতে আমার হাত ধরে বলল, সত্যি করে বলুন রান্না কেমন হয়েছে? রুই মাছটা?

আমি দ্বিতীয়বার ঘণ্ট ও রুই মাছের প্রশংসা করলাম। অনেক দিন পর বাঙালি রান্না খাচ্ছি। তার ওপর যিনি রুঁয়েছেন তিনি আমার পাশে রাজরানীর মতো বসে আছেন। বাঙালি রসনা কি প্রতিদিন নাপ্রসাদে সন্তুষ্ট হয়? আপনার পাশে বসে খাওয়ার সুযোগ কি পাব আর কোনোদিন!

আপনি বর্মীদের বদনাম করছেন? আর সৌভাগ্য তো বলতে গেলে আমারই।

না। তাহলে আমার জিভ খসে যাবে। ওদের আন্তরিকতার তুলনা হয় না। আমি প্রত্যেকবার খাওয়ার পর ওদের কাছে নিজে গিয়ে প্রশংসা করেছি। সব খাবার ঠিক আমাদের রুচির সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না। তারপরও ভালো। তবে প্রতিদিন প্রায় একই পদ্ধতিতে রান্না খাবার তো!

তার অর্থ এখান থেকে গিয়ে আমার রান্নাও...?

আমি ওর বড় বড় চোখের গভীর ভুরু ও পাপড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, শ্রীমতী বড়ুয়া, যাদের ভালো লাগে তাদের রান্না এবং ব্যবহার সবই ভালো লাগে। তাদের গালমন্দও।

আমি আবার কবে গালমন্দ করলাম।

আমি আপনার চারটি ছবি তুলে নিয়েছি। আপনাকে চিঠি লিখলে উত্তর দেবেন তো? আমাকে ভুলে যাওয়ার কথাটিই গালমন্দ মনে করুন না কেন!

চিঠি লেখা খুব একটা কঠিন কাজ। ব্যবসা থেকেও কঠিন। তবে কথা দিচ্ছি।

ঢাকায় আসবেন?

ইচ্ছে আছে।

কথা বলতে বলতে জানতে পারলাম এখানে বড়ুয়ারা বর্মী নাম রাখছে তাদের ছেলেমেয়েদের। এমনকি কেউ কেউ নিজেদের নামও পাল্টে ফেলেছে। বর্মী বিয়ে করছে, বর্মীদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে। দোকানপাটের নাম রাখছে এই

দেশীয় রীতিতে । ছেলেমেয়েরা ওদের পোশাক পরে ।

আমি বললাম, আপনি তো শাড়ি পরেছেন ।

সে বলল, আকিয়াবে কি দেখেছেন? শাড়ি পরা কাউকে দেখেছেন?

না ।

ইয়াঙ্গুনে এখনো এইটুকু বজায় রেখেছে বড়ুয়ারা । আমার ছেলেমেয়েরা চট্টগ্রামী ভাষা ভালো করে জানে । কিন্তু অনেকের ছেলেমেয়েরা কোনোমতে জানে । বাংলা পড়তে পারে না । পারলেও বর্মী টান আছে । বর্মী ভাষা তো জানেই । আর এমন হওয়াই তো স্বাভাবিক ।

খাওয়ার শেষে এলো আম । আবার সে বলল চিঠির কথা । হাত মোছার জন্য টিসু কাগজ এগিয়ে দিল । বাড়িতে নিয়ে যেতে পারল না বলে দুঃখ প্রকাশ করল । আর আমাদের সময় একেবারেই নেই । তারপর প্রণববাবুর সঙ্গে কথা শুরু করল । বছরখানেক আগে চট্টগ্রামে গিয়েছিল বলল ।

এমন সময় সাগরিকা দিদি এলো । আমাদের গ্রামের এবং রক্ত সম্পর্কের দিদি । সঙ্গে মেয়ে । ব্যাস, আমাকে জড়িয়ে ধরল । দিদিকে স্কুলে পড়ার সময় বাবা এখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের পাশের গ্রামের যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেয় । তখন থেকেই ইয়াঙ্গুনে । আমি তখন হয়তো পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ।

দিদি নিজের মুখেই বলল, দেখ, আমার ও তোর জামাইবাবুর নাম বর্মী হয়ে গেছে । ছেলেমেয়েদেরও তাই । ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে । মেয়ে টেনে টেনে চট্টগ্রামী ভাষায় কথা বলছে । দিদির মেজদা গ্রামে আছে । অন্য দু' ভাই সেই পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় চলে গেছে । বড়দা কলকাতার নামি ফুটবল খেলোয়াড় ছিল । তিন ভাই ফুটবল খেলত । গ্রামের কত কথা । আমাদের একই পাড়াতে বাড়ি । সেই পাড়া ইছামতী নদী ভেঙে নিয়ে গেছে । আমরা সবাই পূর্ব পাড়ায় চলে গেছি । এক জীবনে এমন কত কিছুর ওলোটপালোট হয়ে যায় ।

সময় শেষ হয়ে গেল । আমাদের ছুটতে হবে বর্মার সজ্জরাজ বা প্রধান ভিক্ষুর কাছে । দিদি আমাকে শোয়েডাগ ও মহামুনি বুদ্ধের পাঁচখানা বড় ছবি দিল । একটি লুঙ্গি দিল । এখনো কি সুন্দরী! বয়সের সঙ্গে সৌন্দর্যও বয়োপ্রাপ্ত হয় । গৌর তনু আরো উজ্জ্বল হয়েছে । মুখে লাবণ্যময় হাসি, আমার জন্য কত মমতা । খুব দুঃখ করল ওর বাড়িতে দু'-এক দিন থাকতে পারলাম না বলে । আমারও দুঃখ কম নয় । তাহলে আমি অন্তত চট্টগ্রামের বাঙালিদের অবস্থা গভীরভাবে দেখতে পেতাম । সেই সঙ্গে বর্মীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অল্প হলেও জানতে পারতাম ।

আমাদের এই ভ্রমণে দেখতে পেয়েছি শুধু প্যাগোডা আর বিহারগুলো । সেই সুবাদে আশপাশের কিছু বর্মীদের, তাও বাইরে থেকে দেখেছি । গভীরে প্রবেশ করা হলো না ।

কীন্তি পঞএগা ভিক্ষুর কল্যাণে আমাদের গাইডের কাছ থেকে ছুটি মিলল । তাও

কি সহজে হয়? তাঁর সঙ্গে আছেন পঞ্চাঙ্গা তিলোক ভিক্ষু। তিনিও চট্টগ্রামের ভিক্ষু। তাঁরা থাকেন 'দ্য ওয়ার্ল্ড বুদ্ধ শাসন সেবা সঙ্ঘ' বিহারে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের উ সা লা ভিক্ষু স্থাপন করেছেন। মিয়ানমারের দুই নম্বর সামরিক শাসনকর্তা এই বিহারের জমি দান করেছেন সরকারিভাবে। এজন্য এই বিহারের ভিক্ষু হিসেবে কীন্তি পঞ্চাঙ্গা ভিক্ষুকে আমাদের গাইড সমীহ করেন।

কিন্তু গাইড প্রথমে ঘোরতর আপত্তি করলেন আমাকে ছুটি দিতে। আমি বইয়ের দোকানে যেতে চাই কিছু বই কেনার জন্য। মিয়ানমার সম্পর্কিত ইংরেজিতে লেখা বই। যত প্যাগোডায় গিয়েছি তার আশপাশের দোকানে বেশির ভাগ বই বর্মীভাষায় লেখা। বর্মী সাহিত্যের বই কোথাও পাই নি। শোয়েভার্গ প্যাগোডায়ও পাই নি। মান্দালয়ের প্যাগোডায়ও না।

গাইড সরাসরি বললেন, মি. বড়ুয়া সাংবাদিক, তাঁর হাতে জুম লেন্সের ক্যামেরা, তাঁকে কী করে ছাড়ব?

কীন্তি পঞ্চাঙ্গা বললেন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, দু' ঘণ্টা পরে আমি নিজে ফেরত দিয়ে যাব। ক্বায়ে ধর্মশালায় অথবা লোকছন্দা লাভা নুনি প্যাগোডায় গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল। সাগরিকাদির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পামেলা বড়ুয়াকে বললাম, আপনার কথা মনে থাকবে।

পামেলা বলল, মনে রাখার মতো এমন কিছু তো করতে পারি নি।

বললাম, কোনো কিছু না করলেও কেউ কেউ মনের মধ্যে জায়গা করে নেয়। 'মন ধর্মের পূর্বগামী, মন শ্রেষ্ঠ, মন মায়াময়।'

আপনি তো বুদ্ধবাণী বলছেন। ধর্মপদের শ্লোক।

হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল। মন সম্পর্কে এমন সুন্দর কথা আর হয় না।

এজন্যই সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ। আপনি তো আমার সঙ্গে পরিচয় করতে আসেন নি, আমিই এগিয়ে গেছি।

আমি হাত জোড় করে বললাম, এ আমার স্বভাবের দোষ। কিন্তু আপনি মন্দিরে পা দিতেই আমার ইচ্ছে হয়েছিল আগে গিয়ে পরিচিত হবো। কিন্তু আপনি সবার সঙ্গে এত বেশি ধরে কথা... বলছিলেন, তাতে আমি হতাশ হয়ে গেলাম।

এ আমার স্বভাব-দোষ। আর আমাকে প্রশংসা নয়, অনুগ্রহপূর্বক।...

আমরা এক সঙ্গে হেসে উঠলাম। পামেলা এবার আরো কাছে এসে বলল, শোধবোধ হয়ে গেল। এবার আপনি যেতে পারবেন। কীন্তি পঞ্চাঙ্গা আপনাকে ডাকছেন। নমস্কার, হে সাহিত্যিক বন্ধু। বহুদিনের মধ্যে আজ একটি স্মৃতিময় দিন।

আমি শুধু হাত জোড় করে নমস্কার জানাব, নাকি উত্তরে কিছু বলব। কী বলব খুঁজে পাচ্ছি না। কোনো শব্দ বা বাক্য পছন্দ হচ্ছে না, খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ওই

এক দোষ। প্রয়োজনের সময়েই যথাযথ শব্দটা খুঁজে পাই না। প্রশয় পেয়েও নাগাল ঠিকমতো ধরতে পারলাম না।

অন্য কেউ শুনতে না পায় মতো ছোট করে বললাম, রবীন্দ্রনাথের একটি গান হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বলব?

বলুন, প্রিজ। একদম কিছু ভাববেন না। রবীন্দ্রনাথ আমার খুব প্রিয়। বলুন—
ওলো সই, ওলো সই,

আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই ॥

ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি কোণে বসে কানাকানি,

কভু হেসে কভু কঁদে চেয়ে বসে রই।

শুনে পামেলা দেবী নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ। এই প্রথম ওকে নীরব হতে দেখলাম। আমার দিকে আবার সরাসরি তাকিয়ে পাশে নেমে আসা কাকটাকে দেখল। ওর জা পাশে এলো ওদিক থেকে। আসলে আমি পুরো গানটি বলি নি, প্রথম চার কলি বলেছিলাম।

পামেলা বলল, আপনি যাওয়ার সময় ভালো একটি গান মনে করিয়ে দিলেন। আর আমি যে খুব বকবক করি তার ইঙ্গিত করলেন কি! তাতেই-বা কী এসে যায়।

আমি বললাম, তার উল্টোটাও মনে করুন। আমারও মনের কথা বলার ইচ্ছে করে।

আপনি তো সবসময় বলতে পারেন। লেখার মধ্যে আপনার মনের কথা অকপটে বলেন। লোকে পড়ে। কত লোকে পড়ে বলুন তো? কতভাবেই-না আপনি বলতে পারেন। সরাসরি, লুকোচুরি করে, আভাসে-ইঙ্গিতে, প্রতীকী! আর আমাদের বকবক করে শোনাতে হয়। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে শুনতে চায় না। আপনিও প্রথমে আমার কথা বলা ভালো চোখে দেখেন নি। বলুন বুকে হাত দিয়ে!

অমন করে বলবেন না। আপনার বোঝার ক্ষমতা গভীর। আপনাকে ছুঁয়ে বলছি।

তবে এইটুকু থাক। কীন্তি পঞ্ঞা ট্যান্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কোথায় যাবেন আপনারা?

বই কিনতে।

নমস্কার, হে ক্ষণিকের অতিথি! দেশের মানুষ দেখলে কি এ দেশে যে ভালো লাগে!

নমস্কার, আমারও খুব ভালো লাগল। ওর জা-কেও নমস্কার জানালাম।

এক কদম যেতেই প্রায় ফিসফিস করে বলল, চিঠি দেবেন তো হে ক্ষণিকের অতিথি?

আমি আর উত্তর দিলাম না। শুধু ফিরে তাকালাম। ওর পরিমিত প্রসাধন করা দু' গালে তখন মনের মুকুরের অবদমিত রাঙা আভা। গৌরতনু মানুষের মনের ভাব

ও রাগ অমনি তাকে ফুটে ওঠে। আমি তো একটু বেশি কল্পনা করে ফেলি। আসলে পামেলা দেবী দেশের মানুষের প্রতি মায়া কম প্রকাশ করাকে দোষের মনে করে। এটা তার কথা এবং আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। হাজার হোক ইয়াঙ্গুন তো বিদেশ। আবার ভীষণভাবে নিজের দেশ বলেও মনে করে। আর এটাই তো স্বাভাবিক ভাবনা।

আমি ট্যান্সিতে উঠে ভারাক্রান্ত ও উদ্যত সত্যটিকে চেপে রাখার জন্য দাঁতে দাঁতে চেপে মনে মনে 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানের প্রতিটি লাইনের অর্থ খুঁজছি। পুরো গানটাই আমার কাছে নতুন অর্থে ভালো লেগে গেল।

কীন্তি পঞ্ঞা ও পঞ্ঞা তিলোক পেছনে বসেছেন, আমি সামনে। কীন্তি পঞ্ঞা পালি শব্দ, অর্থাৎ কীর্তি প্রজ্ঞা। পঞ্ঞা তিলোক হলো প্রজ্ঞা ত্রিলোক অর্থাৎ ত্রিলোকের প্রজ্ঞা।

কীন্তি পঞ্ঞা বললেন, এখানে বড়ুয়া বা মুসলমানদের সরকারি চাকরি পাওয়া কঠিন। এজন্য বড়ুয়ারা ব্যবসা করে। উচ্চশিক্ষা নিতে পারলে, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে চাকরি। উচ্চশিক্ষা নিতে হলে আর্থিক সচ্ছলতা দরকার। বড় কঠিন সেই দৌড়।

আমি বললাম, সাগরিকাদির ছেলে সিনেমা তৈরি করেছিল। কিন্তু উঠতে পারল না। এখন আর সিনেমা করছে না।

কীন্তি পঞ্ঞা বললেন, তবুও বৌদ্ধ শাসনে আছি। হীনমন্যতায় ভুগতে হয় না। বাংলাদেশে তো আমরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

তা ঠিক।

প্রত্যেক ভোটে হিন্দু-বৌদ্ধরা মার খায়। মেয়েদের শরীর অতিক্রম করে এবং ধরে নিয়ে যায় আর বলে ভারতে চলে যাও।

পৃথিবীর সব দেশেই কি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের একই চিত্র!

এখানে বার্মার লোকেরা সামরিক শাসন নিয়ে বিব্রত নয় মনে হলো। ওরা না থাকলে ধর্মের অনুশাসন থাকবে না। সাধারণ বর্মী নাগরিক সামরিক শাসনের পক্ষে।

তার মানে?

শ্রীকান্ত উপন্যাসে অভয়া শ্রীকান্তকে ইয়াঙ্গুনে বসে কী বলেছিল? 'পৃথিবীতে কোনো অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্য হয়, তাহলে কি তারা অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠেছে, আর আপনারা ন্যায়ধর্মের আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেছি, কিন্তু এর মধ্যে আমি দেখেছি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্ছে। শুনেছি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে এক ঘর মুসলমানও বাস করে নি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরি হয় নি। আমরা হয়তো চোখে দেখে

যেতে পাব না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্র আসবে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বার্মা দেশটাও একটা মুসলমান-প্রধান স্থান হয়ে উঠবে।’

অভয়া সেটা হিন্দুধর্মের কঠিন সংস্কার ও সমাজ-বন্ধন নিয়ে বলেছে। বার্মার সমাজ তো এত কঠিন নয়। ওদের বিয়ের ব্যবস্থা আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মতো যে-কোনো নর-নারী তিন দিন একত্রে বাস করে তিন দিন এক পাত্র থেকে খেলেও তা বিবাহ। সমাজ তাদের অস্বীকার করে না। সেই হিসেবে মেয়েটিকে কোনো মতেই ছোট করে দেখা হয় না।

বার্মাদের মধ্যে শ্যাম-চীনা বংশোদ্ভূতদের ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা আছে। আবার অন্য অনেকের মধ্যে বিদেশিদের বিয়ে করার প্রবণতা দেখা যায়। এসব বিষয় নিয়ে সরকার স্বাভাবিকভাবে চিন্তিত হতেই পারে। অং সান সুচির বিদেশি বিয়ে করাকে ওরা হয়তো মেনে নিতে পারে নি। এজন্য ওর আন্দোলন দানা বাঁধছে না।—পঞঞা তিলোক বললেন।

বিদেশি বিয়ে করেছেন বলে?

হ্যাঁ, সারা বিশ্বে এখন যে-যার ধর্ম রক্ষায় ব্যস্ত। নিজের ধর্ম নিয়ে লড়াই করে মরছে। মিয়ানমার এই নিয়ে চিন্তিত। আপনিও ধর্মীয় প্রসিদ্ধ স্থানগুলো দেখতে এসেছেন। বৌদ্ধরা ধর্মের জন্য লড়াই করে না, একথাও সত্য।

তা তো ঠিকই। এভাবে ছাড়া এখানে আসা কঠিন হতো। এত জায়গা দেখতে পেতাম না। পাশের দেশের মানুষকে দেখার সুযোগ তো পেলাম। বার্মা সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তার মানে আপনি এক ধরনের কপটতার আশ্রয় নিয়েছেন।

আমি চুপ করে গেলাম। কী উত্তর দেব আমি, কোনো উত্তর তো আমার জানা নেই। আমি অবিশ্বাসীর মতো অনেক আচরণ করেছি। ধর্মের এত আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সাধারণ মানুষ বাঁচবেই-বা কী করে। তাদের অবলম্বন তো চাই। আমার কথা তো বাদ। আমি আসলেই তো প্রতিবেশী, মানুষ ও এই দেশটিকে জানতে এসেছি। ধর্ম গৌণ।

গাড়ি এসে থামল। ইয়াঙ্গুনের ব্যবসাকেন্দ্র। তোকিওর গিনজা যেমন। তবে সে রকম মানুষে গিজগিজ নয়। ঘুরতে ঘুরতে বইয়ের দোকান পেলাম। ইন্নওয়া হাউজ, সুলে প্যাগোডা রোড, চ্যান্কটাডা (Kyanktada) টাউনশিপ, ইয়াঙ্গুন। সব জিনিস এখানে পাওয়া যাবে। সারা ইয়াঙ্গুনের মধ্যে কিছুটা জনাকীর্ণ এলাকা। পাঁচটা বইয়ের দোকান ঘুরে আটটা বই ও পুস্তিকা পেলাম। তার মধ্যে একটা মিয়ানমার ক্রনিক্যাল। একটি তিব্বতি লোককাহিনী। দু'একটা দু'নট মিয়ানমার, প্রেজেন্টিং মিয়ানমার, কালারফুল মিয়ানমার, মিয়ানমার ট্র্যাডিশন্যাল ফেস্টিভাল ইত্যাদি। জাপানি সাহিত্যিক মিচিও তাকেয়ামার ‘হার্প অব বার্মা’ উপন্যাসটি তাকের ওপর জ্বলজ্বল করছে। তোকিও ও ফুকুওকায় এটি পেয়েছিলাম। তখন

কিনি নি। প্রকাশক চার্লস ই টাটেল কোম্পানি, তোকিও। যাক, এবার আমি মিয়ানমার সম্পর্কে কিছু জানতে পারব। আগে বিভিন্ন প্যাগোডা থেকে কয়েকটা পুস্তিকা পেয়েছিলাম। আরো কে কে যেন ভাস্তেকে কিছু অসচরাচর জিনিস কিনতে দিয়েছিল। সেগুলো কেনা হলো ঘুরে ঘুরে। প্যান্ট পরা মানুষ এখানেও খুবই কম। মেয়েদের মধ্যে হঠাৎ দু'-চারজন। বাইক চালিয়ে গেল এক দুর্দান্ত যুবতী। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এক বিষণ্ণ মহিলা। ট্যাক্সি ক্যাব আছে। ভাড়া কমই। মিটার আছে, দরদস্তুর করে কমিয়ে নেওয়া যায়। শুনেছি হোটেল ভাড়াও দরদস্তুর করে কমানো যায়।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা তিনজন চেপে বসলাম। গাড়ির ভিড় কম বলে দ্রুতই চলেছি। রাস্তাঘাট তো চিনি না। দরকারই-বা কী। কীন্তি পঞ্ঞা ও পঞ্ঞা তিলোক তো আছেন। রাস্তাঘাট চেনা আমার কোন কাজে লাগবে!

চারটায় পৌঁছলাম লোকছান্দ লাভা নুনি প্যাগোডার পাদদেশে। পাহাড়ের ওপর প্যাগোডা তৈরি হচ্ছে। মাটির সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। পরে বাঁধানো সিঁড়ি হবে, তার ওপর থাকবে ছাউনি। পাহাড়ে উঠতে গেলে বুক ধুকপুক তো করবেই। উঁচু তো একেবারে কম নয়। আরো লোকজন উঠছে। সব প্যাগোডায় প্রচুর লোক সমাগম হয়। কাজকর্মও কি এদের নেই? সকাল-দুপুর হিসাব নেই। নারী-পুরুষ-শিশু বা ভিক্ষু-শ্রামণ অবিরত ও অবিরত। তবে বিদেশি খুবই কম।

জেড পাথর দিয়ে তৈরি হচ্ছে বুদ্ধ। একেবারে দুধ-সাধা নয়। ক্রিম সাদা। সর্বত্র একরকম নয়, কোথাও বেশি কোথাও কম ক্রিম রঙ। মান্দালয়ের উত্তর অঞ্চল থেকে আনা একক পাথর। মান্দালয়ের শিল্পী উ ট ট তৈরি করছেন। এখন শেষ বারের মতো টুকিটাকি পালিশের কাজ চলছে। উচ্চতা ৩৭ ফুট ৯ ইঞ্চি, ওজন ৫০০ মণ। বিশ্বে এত মূল্যবান একক পাথরে এত উঁচু বুদ্ধ আর নেই। বুদ্ধের কোলে বাঁ হাতটি খোলা। তাতে বসে একজন আঙুল, অন্যজন ভারায় দাঁড়িয়ে বাহু পালিশ করছে। বাঁ দিকে আর একজন। সামনে ভক্তরা প্রার্থনা করছে। জগতে প্রার্থনারত সব মানুষের মুখ-চোখ থাকে কমণীয়তায় ভরা। কেউ চোখ বুজে করে, কেউ চোখ খুলে রেখে। কত জনের কত কী চাওয়ার আছে! মনে মনে একান্ত আবেগে প্রার্থনা করছে ইস্ট-সিদ্ধির আশায়। কীন্তি পঞ্ঞা ও পঞ্ঞা তিলোক অনেকক্ষণ প্রার্থনা করলেন।

বাইরের দোকানে জেড পাথরের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট টুকরো পাথর থেকে ছোট ছোট বুদ্ধ তৈরি করে বিক্রি করছে। অনেক দাম। কেন যে একটা কিনে আনি নি সেই আফসোস কোনো দিন শেষ হবে না। স্মৃতি ও স্মারক হিসেবে রেখে দিতে পারতাম। নেমে এলাম মাটির সিঁড়ি বেয়ে। নিচে রাস্তার পাশে হাট বসেছে। খাবারদাবার ও শিল্পদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। আমাদের দল আগে এসে দেখে ফিরে গেছে। আমরা ট্যাক্সি নিয়ে ক্বাবায়ে ধর্মশালায় ফিরে এলাম।

রাস্তায় নেমে টেলিফোন বুথ খুঁজে ফোন করলাম কলকাতায়, আমার মেয়েকে। মেয়ে জয়ী খুব খুশি। ছেলে বাইরে। রুবী আছে। সে আরেক ঝঙ্কি। বিদেশে এখান থেকে ফোন করা বড় কঠিন। ফ্যাক্স একেবারেই না। ভেবেছিলাম এবং কথাও দিয়েছিলাম ভোরের কাগজে ফ্যাক্সে নিয়মিত লেখা পাঠাব। হলো না। আজব দেশ। সোনার দোকানে ঢুকলাম। না, পাথর নেই। রুবি পাথর কেনার খুব ইচ্ছে ছিল। কাকে নিয়ে দোকানে যাব! কীত্তি পএএএ বললেন, এখানে ভিক্ষুরা সোনার দোকানে যায় না। মেয়েদের সঙ্গে ছবি তোলে না। দলগতভাবে নারী-পুরুষের সঙ্গে তোলা যায় কিন্তু একাকী ভিক্ষু ও মহিলা কখনো না। সাধারণ মানুষেরা ভিক্ষুদের সঙ্গে চেয়ারে বসে না, সম্মান ভরে হাঁটু মুড়ে নিচে বসবে সাধারণ মানুষ।

ক্বায়ে ধর্মশালায় চলে এলাম। শেষ বিকেলের আলো মেঘে জড়িয়ে আছে। ক্লাস্তিতে শরীর মার্ভাবান সাগরের মতো ভরপুর। দুই দিনের দীর্ঘ ভ্রমণ, দুপুরে বা রাতে বিশ্রাম ছিল না। তবুও কী এক অজানা শক্তি শরীরে ভর করে আছে জানি না। খুব ইচ্ছে করছে আর একবার জগতের বিস্ময় শোয়েডার্গ প্যাগোডা দেখতে যাই। রাতের আলোয় কেমন দেখতে হবে? এদিকে খাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। এক সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে দণ্ডবৎ হাজির থাকা চাই। তার ওপর আমি মার্কা মারা। গাইড আমাকে চোখে চোখে রাখে। আমার চোখে ভাসছে বুদ্ধের হাতের আঙুলে বসে পালিশরত শিল্পীর ছোট্ট শরীরটি। মানুষের সৃষ্টির তুলনায় মানুষ কত ছোট, কত বড় বড় কাজ মানুষ করে চলেছে ভূবিশ্বে! গ্রহাণ্ডরে।

সন্ধেয় সবাই এলো। ইয়াঙ্গুনে বিদায় ঘনিয়ে আসা শেষ সন্ধের খাওয়া। মহাথেরো আছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাংলা এক বাড়িতে। একতলা বাড়ি। তিনি আগামীকাল ইয়াঙ্গুন থেকে সোজা ঢাকায় যাবেন আকাশপথে। আমরা ফিরব আগের পথে ইয়াঙ্গুন থেকে আকিয়াব বা সিটউই। সেখান থেকে স্টিমারে ইচিদং ফেলে ভুচিদং, ভুচিদং থেকে পিকআপ গাড়িতে মংডু। মংডু মানেই প্রায় বাংলাদেশ, ওপারে টেকনাফ। মাঝখানে নাফ নদী। আমি ভাবছি শেষ রাতে ও সকালের মধ্যে জীবনের স্মরণীয় কিছু-একটা কি ঘটতে পারে না?

এখন বর্মী খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। স্যুপ খাই ভাতের ফাঁকে ফাঁকে পানির মতো। স্যুপ খাওয়ার জন্য ছোট কাপ থাকে। এই কাপ দিয়ে পানির মতো জিন ওয়ে জা চা খাই। স্যুপের নাম হিন জো। পোড়া লঙ্কা ভর্তা এখন আরো বেশি টানে। বালিয়াচং ও স্যুপ দিয়ে শেষ সন্ধের ভোজ সমাপন করলাম। পা ফেলে বসে খাওয়া, সেই যেমন ছেলেবেলায় বাড়িতে খেতাম। কিন্তু নিচু টেবিল আমাদের দেশে প্রচলন নেই। তার বদলে আছে ভোজনবের। এক ফুট উঁচু কাসার গোল জলটোঁকিবিশেষ। তবে ছাউনি থাকে না। তাতে থালা বসে থাকে। প্রত্যেকের জন্য একটি থাকে। খাওয়া শেষ হলো। ইয়াঙ্গুনে শেষরাত্রি আমাকে নিয়ে মায়ার খেলা

খেলছে। নাকি আমারই বিভ্রম!

মহাথেরোর শরীর ভালো নেই। সর্দি হয়েছে আর জ্বর। তাঁকে দেখে চলে এলাম কাবায়ে ধর্মশালায়। রাত আটটা, সন্ধ্যাই বলা চলে। বেরিয়ে পড়লাম। পাশেই তো রাস্তা, রাস্তার পাশে সারি সারি দোকান। দেবাশিস এটা-সেটা কিনল। এবার কী করি! সামনেই পড়ল দক্ষিণ ভারতীয় এক দোকান। সেখানে কোমল পানীয় ও বিয়ার আছে। ভাতও আছে। তামিল দুই বোন। ওরা হিন্দি জানে। দেয়ালে বোন লক্ষ্মী ও গণেশের ছবি, সামনে তাক, তাতে ফুল দেওয়া আছে।

তামিল তরুণী মান্দালয় বিয়ার এনে দিল পাশের ঘর থেকে। মেরুস্নিগ্ধ শীতল। ভেতরে কুচি কুচি বরফকণা জমে গেছে কি? ফ্যানের হাওয়া বেশ তপ্ত। বৃষ্টি নেই। আষাঢ়ে বৃষ্টি না হলে ঢাকা যেমন তপ্ত হয়ে ওঠে ইয়াঙ্গুন সে কথা মনে করিয়ে দিল। সবেধন নীলমণি একটি মাত্র রাতের মৃত্যুই বাকি। তার ওপর কাবায়ে ধর্মশালার চৌহদ্দি থেকে কোথাও যেতে পারব না। রাতের ইয়াঙ্গুন কেমন দেখা সম্ভব নয়। মানুষ যত রকম নিয়মকানুন তৈরি করেছে সবই তাকে লোহার নিগড়ে বেঁধেছে। বিদেশি বলে আমাদের কতকিছুই না মানতে হচ্ছে। আবার ইয়াঙ্গুনবাসীও আইনের শৃঙ্খলে বাঁধা। সামরিক শাসকেরাও নিজের সৃষ্ট জালে বন্দি। ভালোবাসাও বন্ধন। প্রেমের প্রশ্রয়ও আটপেট্টে বাঁধার জন্য এ রকম মায়াময় ছিলনা। মানুষ এতসব আইনকানুন ছাড়াও নিজের হৃদয়কে নিজে কতভাবেই না শাসন করে।

রাত উড়ছে। যত পার খাও। সিদ্ধার্থ ও দেবাশিস তর্কে মেতে উঠল। এক সঙ্গে খায়-দায়, পুরো সফরে ওরা মানিকজোড়। দেবাশিসের বাবা ড. প্রণব বড়ুয়া ছেলের জন্য সবসময় শঙ্কিত। সিদ্ধার্থকে বলেছে পাহারা দিয়ে রাখতে। দেবাশিস চট্টগ্রামের নামি দৈনিক পূর্বকোণের খেলাধুলোর সম্পাদক। চট্টগ্রাম আবাহনীর ডিফেন্ডার ছিল। এখন খেলা থেকে অবসর নিয়েছে। সিদ্ধার্থ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট।

শেষ রাতের খাওয়া চলছে। পানশালায় ঢোকার সময় চতুর্দশী কুমারী চাঁদ ম্যাডোনা-রূপ নিয়ে অপাঙ্গে বিদ্ধ করেছিল আমাকে। তামিল তরুণী তার ছোট বোনকে খাবারের থালা বাড়িয়ে দিয়ে নতুন খদ্দেরের জন্য বিয়ার আনতে গেল পাশের ঘরে। ওর কালো রূপ সামলে রেখেছে জামা ও স্কার্টের তীব্র বন্ধনে। চাঁদের সঙ্গে শোয়েডার্গ মনে এসেছে উঁকি দিয়ে। আহা এ সময় যদি শোয়েডার্গের বিশাল চতুরে আবার যাওয়া সম্ভব হতো। পৃথিবীর চতুর্দশ সুন্দরী বলে শোয়েডার্গকে, বর্মীরা। তামিল তরুণী আরেক দফা বাদাম দিয়ে গেল কোনো দিকে না তাকিয়ে। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল। দেয়ালের ওপাশে ওদের ঘর। রাত্রি দশম ঘণ্টার ঘরে তার নিজের শরীর টেনে নিয়ে চলল আমাদের পাস্তা না দিয়ে।

কণ্ঠের নিচে টলটল করছে তরল সোনালি মান্দালয় পানীয়।

রাস্তায় নেমে পড়লাম। সিদ্ধার্থ আকাশের ঘোলাটে মেঘ ও জ্যোৎস্না দেখে বলল জোর গলায়, এই রাত শেষ রাত...

দেবাশিস সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গাইল, 'এই রাত শেষ রাত/হয়তো এ জীবনে/একটু আমার কাছে আরো থেকে যাও...'।' মান্না দে-র গান।

ইয়াঙ্গুন, গোস্টেন ল্যান্ড বা সুবর্ণ ভূমি, ওদিকে কাবায়ে ধর্মশালার পাশ দিয়ে শির তুলেছে সোনার প্যাগোডা, ফয়ার রাজ্য, বেগম রোকেয়ার নারীস্থান। শ্রীকান্ত উপন্যাসের অভয়ার স্বামী বলেছিল সুঘিয়ামার দেশ, এখন কেউ কেউ বাড়িয়ে বলে সামরিক জাভা বা কারান্তুরালের দেশ। পাদ্রী মানরিক বলেছিল, দ্য ল্যান্ড অব দ্য গ্রেট ইমেজ। আমি বলি অপরূপ কুমারী মিয়ানমার। আর এই পর্যন্ত আসতে আসতে বার্মা সম্পর্কে আমার আগের মত অনেক পালটে গেছে। আমি ভালোবেসে ফেলেছি কুমারী মিয়ানমারকে। আমার আত্মজার মতো, ভালোবাসার প্রবল স্নিগ্ধতার মতো, মনো-দৈহিক প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির মতো আমি তোমাকে ভালোবেসে যাব। একথা মিয়ানমারের গৌতম বুদ্ধের মতো আর কেউ জানে না।

রাস্তায় আনন্দ ভেসে এলো। দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। মেয়েরা দোকানের ভেতর ও বাইরের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। দোকানের সামনে যেসব জিনিস দর্শনীয় করে রেখেছিল সেগুলো এবং ফুটপাথে যেসব ছিল। বাংলাদেশেও তাই। ফুটপাথের দোকানদারদের দিনের কাজ শেষ হচ্ছে রাতে। ইয়াঙ্গুনের রাত উড়ছে চাঁদের ঘোলাটে অভ্র আলোয়। কাবায়ে ধর্মশালা এলাকার চারপাশ নির্জন। বড় বড় গাছপালায় ভরা আলোছায়া বাঁধানো চত্বরে পড়ে জাফরি-কাটা ঝিলিমিলি খেলছে। কুকুর ডাকছে। প্যাগোডার চুড়ো ইউনিকর্ণের মতো অলৌকিক শিং তুলে আছে। পামেলা দেবীর কথাগুলো বঙ্গোপসাগরের সুস্বিঞ্চ হাওয়ার মতো ভেসে যাচ্ছে। এবার শরীরও জানিয়ে দিচ্ছে ঘুমের দরকার। শেষতম রাত্রি উড়ছে। কাবায়ে ধর্মশালার দোতলায় সেগুন কাঠের মেঝেয় বিছানা করে সারি সারি শুয়ে আছে, ক্লান্ত অবসন্ন যাত্রীরা সঙ্গী। গৌরী দেবী বসে কি যেন খুঁজছে বিছানায়। আমারও বিছানায় ঘুম খুঁজতে হবে। তার আগে শরীরটার একটু ধোয়া-মোছা দরকার। দিনের ঘামের ক্রন্দ সাফ করা চাই। শরীরও একটু সুখ চায়। স্নানঘরে গিয়ে পানি পাওয়া গেল। অল্পতেই হয়ে যাবে। অল্প নিয়েই এখন তুষ্ট হচ্ছি। বারান্দায় গিয়ে চাঁদটাকে টুক করে আবার পলকে দেখে এলাম। মেঘের আড়াল থেকে ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে এসে, হামাগুড়ি দিয়ে, ফিং দিয়ে, পিচ্ছিল দৌড়ে, এমনকি জোর করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে উদ্ভিন্ন জ্যোৎস্নাবালিকা। ওর বয়স চোদ্দ হয়ে গেল।

বিছানায় পড়তেই ঘুম জোর করে চেপে ধরল। ঘুমের আগে এক দফা প্রমোদ-স্বপ্ন এসে আমাকে লালন করবে, তারপর অন্য কাত হলে গভীর প্রশান্ত ঘুম। সেই রাতে স্বপ্নে এলো অচেনা কিন্নরী। অচেনা সেই কিন্নরীদের কাহিনী পরদিন ভোরেই হারিয়ে ফেলেছি, ভুলে গেছি। ভালো ভালো স্বপ্ন এভাবে কত যে হারিয়ে যায়, মনে থাকে না। মনে থাকে ভয়ের স্বপ্নগুলোই বেশি। কে আমাকে এত ভয় দেখায়, এত রাতে কোথায় যেন কে ভয়ে বা বিহ্বলতায় কাঁদে! কে ডাকে!

ওধু মনে আছে কিন্নরীরা ভারি সুন্দরী ও মায়াবতী ছিল। স্বপ্নসমুদ্রের কিন্নরীদের নিয়ে বিলাসী অবগাহন হবে না জাগরণে।

চিঠি দিও

৫ জুন, ইয়াঙ্গুনে শেষ সকাল।

ওর নাম খিন থিডা টুন। অষ্টাদশী ও ছাত্রী। ইয়াঙ্গুনে কাবায়ু টেম্পল ধর্মশালার পেছনের চায়ের দোকানে দেখা। সামনে বেশ খোলামেলা চত্বর। চত্বরের মাঝখানে একটা বাদাম গাছ। তার নিচে ছোট্ট একটা দোকান। তার এক পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা। বুনো বা জালালি কবুতর। লোকজন ওদের খাবার দিচ্ছে। একটু ভয় পেলেই ফুরুৎ ফুরুৎ করে গাছটার ডালে আশ্রয় নেয়। দু'-এক মিনিটের মধ্যে আবার নেমে পড়ে। চত্বরে পূব-দক্ষিণ দিকে তিনটি চায়ের দোকান। বিশাল এলাকা নিয়ে। সঙ্কেয় এখানে মানুষে মানুষে জমজমাট থাকে। বেশির ভাগ সময়ে তরুণ-তরুণীদের ভিড়। ওরা চা খেয়ে খুব আড্ডা দেয়। এটি এখন ওদের অবসর বিনোদনের অঙ্গন।

টুন মাঝের চায়ের দোকানে একটি টেবিলে বসে আছে। সকাল আটটা। এগারোটায়ে আমাদের ইয়াঙ্গুন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। বিহঙ্গের সময় হয়ে গেছে ঘরে ফেরার। টুন একটা টুলের উপর বসে আছে। গোল টেবিলের পাশে প্লাস্টিকের টুলে এক হাতে ভর দিয়ে বসে আছে। ভারি সুন্দর ঈষৎ বাঁকা ভঙ্গি। চুল লম্বা নয়। কানে ছোট্ট রিঙ। গলায় ক্রশ। হাতে ঘড়ি বা চুড়ি কিছু নেই। লাল লিপস্টিক মেখেছে। চুলে দুটি লাল ব্যান্ড। ঘন নীল রঙের ফ্যাশনদার ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরেছে। হাতে একটা বটুয়া। হয়তো তার বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করে আছে। অথবা বন্ধু। ইয়াঙ্গুনের বয় ফ্রেন্ড হতে পারে। কত কিছুই তো হতে পারে।

সঙ্কেচ ফেলে দিয়ে ওর কাছে গেলাম। ছবি তুলতে চাইলাম। অনেক ভাবল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে পায়রাদের দিকে চেয়ে রইল। হয়তো ভাবছে কী বলা উচিত। অথবা চায় না। অথবা সঙ্কেচ। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে লড়ছে।

আমিই বললাম, না?

টুন বলল, না।

হাসিখুশি মুখেই বলল। আমার মনে হলো আসলে 'হ্যাঁ' বলছে। লাজুক কিন্তু অনমনীয় ও অমলিন হাসি। আমার কার্ড দিলাম। সে দেখল। বললাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি। কার্ডে লেখা আছে সাহিত্যিক। ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানালাম। এবার সে উসখুস করে উঠল। আমার ভয় হলো পাছে চলে যায়। লুঙ্গি বা থামি ঠিক করে নিল। আমার সামনেই ডান হাত বাঁ হাত ঘুরিয়ে লুঙ্গির প্যাঁচ

খুলে দু' হাতে মেলে ধরে ঠিক করে পরে নিল। দাঁড়িয়ে মুখোমুখি, সুরক্ষিত ও মেয়েলি ভঙ্গিতে।

বললাম, তুমি যদি কথা বলতে রাজি না থাকো চলে যাচ্ছি।

তখনো সে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি পায়রাদের ছেড়ে আরো দূরে চলে গেছে। আবার বসল। অপেক্ষা, অপেক্ষা। অপেক্ষার চেয়ে উদ্বেগ, কষ্ট বা বিরক্তিকর বা মধুর বুঝি আর কিছুই হয় না। আমিও নাছোড়বান্দা। আমি আমার টেবিলে চলে এলাম। আমার সঙ্গে চা খেতে বললাম।

রেস্তারার চুলোয় তেলে-ভাজি হচ্ছে। ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ। টুন ও আমি ছাড়া রেস্তারায় আর কোনো খন্দের নেই। টুন কথা বলছে না। অথচ ওকে দেখে রেস্তারায় এসেছি। এবার খারাপ লাগতে শুরু করল। কী হয়েছে মেয়েটার?

ছোট এক শ্রামণ এলো, ভিক্ষুর জন্য সামনে দাঁড়াল। মুখে ভিক্ষা চাই বলার রেওয়াজ নেই, তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিখ্যাত গোলাকার ঢাকনিসহ ভিক্ষাপাত্র। নাম ছাবাইক। লাক্ষার তৈরি। গৌতম বুদ্ধের সময় সম্ভবত কাঠের তৈরি ভিক্ষাপাত্র ছিল। শ্রামণের বয়স বারো-তেরো হবে। নিষ্পাপ মুখ। চোখ নিচু করে রেখেছে। পঞ্চাশ চ্যা দিলাম ছাবাইকে। এটাই নিয়ম। চলে গেল। টুন একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার প্রবল বিক্রমে প্যাগোডার প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে আছে। বাঁ দিকে টিলার উপর কাবায়ে প্যাগোডা। তার নিচে কাবায়ে ধর্মশালা, যেখানে আসতে-যেতে চার রাত থেকেছি। রেস্তারার ডান দিকে বড় রাস্তা। সেখান থেকে প্যাগোডা যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে। তিন-চারশ' ফুট দীর্ঘ হবে। সিঁড়ির দু'পাশে পাকা দোকান। ওপরে পাকা ছাদ সিঁড়িসহ ঢাকা। এখানে সব প্যাগোড়ায় ওঠার জন্য এরকম একাধিক সিঁড়ি থাকে। হাজার ফুট উঁচু পাহাড় হলেও অন্তত তিনটি সিঁড়ি থাকবে এরকম।

টুন তেমনি বসে আছে। হয়তো যার জন্য অপেক্ষা করছে তার হৃদয়হীন বর্ণা তাকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

মিয়ানমারের রীতি অনুযায়ী নিচু টেবিল নয়। আবার হেলান দেওয়া চেয়ারও নেই। আছে উঁচু টুল। আমার টেবিলে সমুচা এলো, গোলাকার লম্বা পরোটা। বেশি তেলে কড়াইয়ে ভাজা হয়। খাব না। তবুও রেখে গেল। মাছি বসছে। এই খাবার আবার অন্যকে দেবে। ঠাণ্ডা। প্যাগোডা এলাকা বলে এখানে বিয়ার বা হুইস্কি থাকে না। নানা ধরনের কোমল পানীয় আছে। ক্যাসেটে বর্মী প্রেম-সঙ্গীত বাজছে। সঙ্কেয় এই গান হয় আরো উঁচু পর্দায়। রাস্তা দিয়ে বাস ছুটেছে গর্জন করে। সবই জাপান ও কোরিয়ায় তৈরি গাড়ি। রাস্তায় অনেক মেয়ে। মেয়ে-পুরুষ প্রায় সমান। টুন বসেই আছে। আমার দিকে একটুও তাকাচ্ছে না। কিন্তু সব দেখতে পাচ্ছে। ওর পাশের টেবিলেই আমি। দুই গুচ্ছ করে চুলে গার্ডার দেওয়া। কপাল ও জুলফি বেয়ে কিছু কালো চুল ছেঁড়া মেঘের মতো ঝুলে সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। ঘন নীল

পোশাকও কালোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তাতে ফুল তোলা। ব্লাউজের হাতা ও নিচের খুলে সাদা লেস বসানো। শিরদাঁড়া খাড়া করে প্রবল ব্যক্তিত্ব ও লাবণ্য নিয়ে বসে আছে। কখন ওর প্রতীক্ষা শেষ হবে দেখার জেদ চেপে যাচ্ছে আমার।

আরো দু'জন শ্রামণের ছবি তুললাম। টাকা দিলাম। আরো একজন এলো। আমি সুবিধেজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। আমার 'শ্রামণ গৌতম' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করব ভাবছি। ধ্রুব এষকে দেব।

এবার টুন হ্যা বলল। খুব ভালো লাগল। হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে কাছ থেকে ছবি নিতে গেলাম। কাছ থেকে জুম করলাম। পরপর তিনটি নিলাম। দৃষ্টি সেই দূরে। একবার মিষ্টি করে হাসল। আবার চিন্তা। আবার বিষাদ। বিষাদ সৌন্দর্যের আরেক প্রয়োজনীয় শর্ত। দু' হাতে ভর দিয়েছে টুলে। বুকের ওপরে সাদা অন্তর্বাস শুকতারার মতো উঁকি দিল। যে বিষণ্ণ হতে পারে না, বা জানে না, বা বিশ্বাসের অস্ত্রের কথা জানে না সে চুম্বনযোগ্যও নয়। আরো একটি। ঝটপট আরো একটি তুলে নিলাম।

এবার প্রায় অনুনয় করে হাত তুলে বলল, সত্যি, আর নয়। আমার খুব লজ্জা করছে। ক্ষমা করো। নয়তো আমি মরে যাব।

আন্তরিকভাবে সে অনুনয় করল। আর একজন শ্রামণ এলো। আবার একজন। খুব সুন্দর ভঙ্গি করে বসে আছে টুন। এখন অনেক সহজ। চোখাচোখি হতে হাসল। লজ্জায় ঠোঁট ফুলে উঠল। পাশ দিয়ে একটা লোক যেতেই বাদাম গাছে উঠে গেছে পায়রাগুলো। গতকাল পায়রার ছবি তুলেছি। আমারসহ তুলে দিয়েছে সিদ্ধার্থ। টুনের বটুয়া অসহায়ভাবে ব্যর্থ প্রেমিকের মতো টেবিলে পড়ে আছে।

কী সুন্দর মেঘহীন সকাল। কী মায়াময় ইয়াঙ্গুন। প্রায় ভালোবাসায় পড়ে গেছি। ইস্ আর মাত্র দু'-আড়াই ঘণ্টা। ফেরার সময় হলে সাধারণত ঘরের প্রবল টান পড়ে। এবার উন্টো টানছে ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার, কুমারী অপরূপ মিয়ানমার। চারদিকে লোকজন, তারুণ্যের ঝলমল প্রকাশ, কুমারী মেয়েরা প্যাগোডায় ছুটছে একা একা। হাতে জপমালাও আছে দু'-একজনের। এই বয়সে কিসের টানে ওরা প্যাগোডায় বুদ্ধের সামনে বসে বসে ধ্যান করে, মালা জপে? ওরা জুটি বেঁধে আসে না। জোড়ায় জোড়ায় যারা আসে তারা এক পাশে বসে বসে গল্প করে। কোনো রকম অশালীন কিছু দেখি নি আমি। ওদের এই মাত্রাজ্ঞান আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়। ফুল নিয়ে আসছে একজন। দোকানে বিক্রি করবে। পায়রার ঝাঁকে একটি ছোট্ট মেয়ে ঢুকে পড়েছে। পায়রাগুলো ওকেও একটা পায়রা মনে করছে না ঠিকই, কিন্তু কোনো ভয় তাদের নেই। স্বর্গের সুসমা ঝরছে। নায়ন পূর্ণিমার প্লাবন নামবে আজ রাতে। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, সামনে আসছে ওয়াসো বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা। আজ অনেকেই শ্রামণ হবে শোয়েডার্গ ও বিখ্যাত সব প্যাগোডায়।

আমি বিদেশি। আবার টুনের সঙ্গে চোখের মিলন হলো। এবার আমাকে

দুষ্টমিতে পেল। অনেকখানি নোট লেখা হলো। নয়টা বেজে গেছে। প্রথম কাপ চা খেয়ে বিনি পয়সার গরম জিন ওয়ে জা খাচ্ছি। কয় কাপ হলো? পেছন দিকে সেইম পেন্ গাছে কৃষ্ণচূড়ার রক্তলাল বক্ষবিদারণ দেখতে পাচ্ছি। টুনের মনের গভীর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি মনে হলো। হ্যাঁ, ওর বন্ধু কোনো কাজে ফেসে গেছে। আমাকেও দুষ্টমিতে পেল। এবার চোখাচোখি হতেই টুনকে শাসিয়ে দিলাম। টুন হেসে উঠল।

এক শ্রামণকে দশ চ্যা দিলাম। দোকানদার এক হাজারের নোটের ভাঙতি দিল। সেটাও শেষ। টুন দিচ্ছে না। এবার সে ও আমি একই টেবিলে হয়ে গেলাম। ভাষা যে কি প্রয়োজনীয়, ভাষা ছাড়া কত কথা বলা হয় না। ইংরেজি শব্দ হাতড়াতে হয়। আমাদের তো আর ইংরেজির চর্চা হয় না দেশে। এতক্ষণ আমরা কথা বলেছি চোখে চোখে। সে দিব্যি ইংরেজিতে ঠিকানা লিখে দিল। তাহলে তো ইংরেজি জানে। কথা চলবে। ৭৬৩ শোয়েডার্গ প্যাগোডা। কাতোমাদে স্ট্রিট। ইয়াঙ্গুন। প্রথমে ডার্গ লিখেছিল। পরে সঙ্গে সঙ্গে তার আগে শোয়ে যোগ করল। কী দুষ্ট মেয়েরে বাবা!

দু'-একটা করে ইংরেজি শব্দ বলা শুরু করল। এতক্ষণ কথা বললে উপন্যাস লেখার মতো অনেক কথা হয়ে যেত। কীভাবে হেলায় একটি ঘণ্টার বেশি সময় নষ্ট করে দিল। ওর দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকাতেই এখন আমার লজ্জা হচ্ছে। না তাকিয়েও উপায় নেই। পাঁচ-সাতটা সিগারেট শেষ। মাইন্ড সেভেন। সে প্যাকেটটা ওপাশে সরিয়ে রেখে হাসল। কী সুন্দর অমলিন, তীক্ষ্ণ, সুন্দর দৃষ্টি! আবার সচেতন, শাসনপ্রিয়, চঞ্চল, দুষ্ট, সপ্রতিভ ও দুর্দান্ত। সবকিছু ছারখার করার আগুন ওর মধ্যে আছে। জানি না সে এই সম্পর্কে সচেতন কিনা। ওর প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করে আছে? ওর ভাই বা বান্ধবী! জোর করে ভেবে নিলাম বান্ধবী। অথচ যে-কেউ হতে পারে। আমি জানতে চাইলাম না, জিগ্যেস করলাম না। অদৃশ্য প্রতিপক্ষ প্রবল হলেও পাস্তা দিতে নারাজ আমি। ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল প্রথম থেকেই।

মেঘের উড়ো চিঠির মতো একগুচ্ছ চুল এসে হামলে পড়ল কপোলে। সরিয়ে দিল অলস ভঙ্গিমায়ে। ঝুঁটি শালিকের মতো কপোলে চুল খাড়া হয়ে আছে বা ওখানে সৌন্দর্যের প্রহরীর মতো জেগে আছে। আমার সময় ছুটছে। এয়ারপোর্টে যেতে হবে। বিদায় জানাতে হবে ইয়াঙ্গুনকে।

বললাম, আমার তো সময় আর নেই। ফিরে দেখা হবে না কোনো দিন।

কী বিষণ্ণ অমলিন দুরন্ত হাসি! ঠোঁট খুলল। একটু ফোলা ফোলা ওরা। আমার চোখের সমতল থেকে একটু নিচুতে ওর চোখদুটি। দৃষ্টি ও ঠোঁট প্রসারিত করল। কিছু না বলে অনেক কথা এভাবে কেন বলল? বুকের স্ফীতির ঠিক উপরে গলার একটু নিচে ওর ক্রশ দুলে উঠল। আলোর দুটি ছড়াল এক লহমা।

সি জু তুম্বারে। ধন্যবাদ। তোমার সান্নিধ্য খুব ভালো লাগল।

সে হাত বাড়িয়ে দিল। সাধারণত মিয়ানমারের মেয়েরা এরকম করে না। বলল, সি জু তুম্বারে।

ওর করতল কঠিন ও কোমলের মাঝামাঝি। উষ্ণ ও বিদ্যুৎবাহী। গভীর চাপ দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। বাঁ হাতটা আমার ডান হাতের পিঠের উপর রাখল। আমি তার ওপর আমার বাঁ হাত রাখলাম।

টুন চোখে চোখ রেখে বলল, সি জু তুম্বারে।

তারপর ঝট করে ছেড়ে দিল। বসে পড়ল টুলে। ওর চোখ তখন পায়রার বাকবাকুমের দিকে চলে গেছে। আমি ওর দৃষ্টি দিয়ে তৈরি পথ অনুসরণ করে ওখানে চলে গেলাম। ওখানে এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে।

টুন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, প্লিজ গো!

অমনি বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটে গেছে। বিষণ্ণ হেসে চোখের কোণে ইঙ্গিত করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। এত দ্রুত নিজেকে সংযত করা কি সম্ভব! আমার ধমনির রক্তপ্রবাহ তখন দ্রুত নিষ্পত্তির কাজে ব্যস্ত। মিনোলটা তুলে নিলাম। এত দ্রুত কি সবকিছু করা যায়?

টুন নীরবে যেন বলল, উচিত উচিত।

টুন আবার জ্বড়ঙ্গি করে বলল, উচিত। তুমি যাও।

আমি বললাম, কী করে, কী করে!

সে বলল, পারবে। বলে সে যুবকের দিকে ইশারা করল। ওর থেকে কাগজের বাস্তিলা নিয়ে এসো।

এবার সবকিছু দিবালোকের মতো পরিষ্কার টলটলে। আকাশের কোনো ভাবান্তর নেই। ইয়াঙ্গুনের শোয়েডার্গ প্যাগোডা, এবং শত শত প্যাগোডার সোনা রঙে একটু মালিন্যের মেঘ-ছায়া পড়ে নি। ব্যস্ত ইয়াঙ্গুন কোনো তোয়াক্কা করল না। পায়রাগুলো খুঁটে খুঁটে দানা খাচ্ছে নির্ভয়ে। শিশু একাডেমিতে একবার রানী ঐশ্বরিয়া এসেছিলেন। আমি তখন সেখানে চাকরি করি। রানীর ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। তিনি চা-মিষ্টি খাচ্ছিলেন। রানীর নেপালি দেহরক্ষী এসে বললেন, আমরা রানী-মায়ের খাওয়ার সময় ছবি তুলি না। রানী ঐশ্বরিয়া তখন আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। রাজরানীর মতো হেসে মাথা নিচু করে নেন। হ্যাঁ। রানী বা সুন্দরী মহিলার খাওয়ার সময় ছবি তুলতে নেই।

টুনের হৃদয়ের নিরাপত্তা এখন পেয়ে গেছে! সে আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না। সে হঠাৎ দৌড় দিল, হাতের বটুয়াটা টেবিলে পড়ে আছে, রাস্তায় বাস গর্জন তুলে যাত্রী নিতে থামল। চকিতে মনে পড়ল একটা ছবি তুলে রাখি টুনের ছুটে যাওয়ার। কিন্তু ছেলেটি চলে যাচ্ছে কেন? টুনকে দেখেও দৌড় দিল কেন? ছেলেটির হাতে কাগজের একটা বাস্তিলা রয়েছে।

আমিও বটুয়াটা নিয়ে টুনের পিছু ছুটলাম।

ছেলেটি প্যাগোডার সীমানা তোরণ অতিক্রম করে যাচ্ছে। টুন পায়রাদের কাছে চলে গেল। সব পায়রা পাখা ঝাপটে স্বভাবজাত আত্মরক্ষার তাগিদে প্রায় এক সঙ্গে বাদাম গাছে গিয়ে বসল। গাছতলা শূন্য। দু'-তিনশ' পায়রা এক সঙ্গে হঠাৎ উঠে গেলে পাখার গভীর শব্দ হয়। ওদের গুটুর-মুটুর শব্দও তার সঙ্গে মিশে ছিল। টুন বাদাম গাছের নিচে চলে গেল। ছেলেটি রাস্তার বিশাল ফুটপাতে। ওখানে অনেক মানুষ।

টুন চিৎকার করে ডাক দিল। একটা ট্যাক্সি ক্যাব এসে দাঁড়াল ছেলেটির সামনে। এক মহিলা নামল। টুন ছুটল। ছেলেটি ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। টুন দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে দিল। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে আমার সামনে আমাকে ধরে নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করছে। অক্ষম প্রয়াস। ওর চারদিক থেকে যেন অজস্র কান্না ওকে একসঙ্গে জাপটে ধরল মর্ত্যবানের জলোচ্ছ্বাসের বিক্রমে।

এমন কান্না কী ওকে মানায়? সহ্য করা যায়? অধরটি ফুটে উঠেছে অভিমানে। বোঝা যাচ্ছে ওর এখন সহানুভূতি দরকার, যার সঙ্গে অভিমান হয়েছে ঠিক তার। আমি তো তা পারি না। কী করে ওকে, ওর কোমলতাকে জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে বলতে পারি! আমার মনে হলো আমি ওকে না বুঝে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। ও কথা বলতে চাইছিল না, আমাকে চলে যেতে বলল, অথচ ওর পিছু নিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছি সামনে। কাপুরুষের মতো। কিন্তু সে আমাকে আর দোষ দিল না।

টুন এই সময়ের ব্যবধানে আরো যেন সুন্দরী ও পরিপক্ব হয়ে উঠেছে; দুঃখের মধ্যে এবং ওর বুকের গভীরের কোনো দুঃখে। কিন্তু কেন ছেলেটি ওভাবে চলে গেল—আমিও বুঝতে পারলাম না। এর মধ্যে আমি জড়াতাম না। শুধু বটুয়াটা ওর হাতে দেওয়ার জন্যই। আমার সময়ও নেই।

বটুয়াটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, আমি খুবই দুঃখিত। আমার জন্যই তোমার এই দুঃখ। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি সব অপরাধ। আমার জন্যই তোমার এই বিপত্তি।

টুন বলল, তা মনে হয় না আমার। আসলে ওর সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া চলছে। আমি ওকে বলেই দিয়েছি। আমার কিছু চিঠি আছে ওর কাছে। তার জন্যই আজ এখানে আসা। ও সেটা দিতে চাইছে না। বাহানা করছে। পালিয়ে গেল সুযোগ পেয়ে। ওর হাত থেকে চিঠির বাউলটা তোমাকে আনতে যেতে বলেছিলাম।

টুন, আমাকে এবার যেতেই হবে। আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। কী নিষ্ঠুর সময়!

খিন থিডা টুন বলল, যাও। চিঠি দিও। চিঠি।

বিদায় ইয়ান্নুন

নিদাঘের দুপুর। ইয়ান্নুন বিমানবন্দর। ফ্লাইট নম্বর ৪০৯ জে, মিয়ানমার এয়ারওয়েজ। প্রায় দু' ঘণ্টা লাগল সব রকম সুরাহা করতে। বিদায় দিতে এলেন ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর মহিলা। নামটি মনে পড়ছে না, লিখেও রাখি নি। অবিবাহিতা, পঞ্চাশের মতো বয়স। আমাকে মিয়ানমারের ইংরেজি পত্রিকা *দ্য নিউ লাউট অব মিয়ানমারের* কিছু কপি দিয়েছেন। ২৬ মে সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার নিচে বাঁ দিকে উল্লিখিত হয়েছে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ২৪,৯৬৭ কপি। মিয়ানমার বর্ষ ১৩৬৩, ভল্যুম ৯, সংখ্যা ৪০। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে। এক রঙে ছাপা। প্রথম পৃষ্ঠায় দেশের খবর। বিদেশি খবর তৃতীয় পৃষ্ঠায়। বিশ্বে যত বড় ঘটনাই হোক তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় থাকতে পারে যদি মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কযুক্ত খবর হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠা ১২। ১১ পৃষ্ঠার নিচে প্রকাশক ও অফিসের ঠিকানা আছে। সরকারি পত্রিকা, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, সম্পাদকের নাম নেই। মূল্য কোথাও বুঁজে পেলাম না। প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় থাকে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রতিদিন একটি নীতিমূলক কবিতা থাকে। রোববার থাকে ক্রোড়পত্র। তাতেও রাষ্ট্রের প্রচারমূলক লেখা থাকে। এছাড়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং সংহতিবিষয়ক প্রচার আছে।

তবুও তো পাওয়া গেল। সেদিন বই কিনতে গিয়ে কোনো দোকানে ইংরেজি পত্রিকা পাই নি। একটাই ইংরেজি পত্রিকা বের হয় ইয়ান্নুন থেকে। অবাক লাগল। নিচয়ই মান্দালয়েও একটা থাকবে, নাকি সবই সরকার নিয়ন্ত্রিত কে জানে!

গাইড দু' জন ও মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ভেতরে ঢুকে চা ও সিগারেট খেয়ে বসে আছি। ছোট বিমানবন্দর। জাঁকজমকের তেমন কিছু নেই। আমাদের ভাড়া ৩৯৮৫ চ্যা। সম্ভবত আমাদের কাছ থেকে কম টাকা নিয়েছে। এমনিতেও ভাড়া কম। আমাদের মতো গলাকাটা নয়।

আড়াইটায় বিমান ছাড়ল। ফোকার এফ ২৮ বিমান। আমাদের অভ্যন্তরীণ রুটের বিমানগুলোর মতো। মিয়ানমার বিমান-সুন্দরীরা ব্যস্ত। শীতাতপ যন্ত্র তেজী নয়। কিছুতেই গা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। যাওয়ার সময়ও এ রকম ছিল। ১৫ মিনিটে ২৯ হাজার ফুট উঠে যাব ঘোষণা দিল। ভালো করে বোঝাও যাচ্ছে না ক্যাপটেন কী কী বলছে। ৫০ মিনিট আমাদের ভ্রমণ। সিটউই টেকনাফের কাছেই বঙ্গোপসাগরের কূলে। কিন্তু মংডু থেকে সড়ক পথে সিটউই যাওয়া যায় না। সোজা সড়কপথে যাওয়া গেলে বড় জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা। কিন্তু বাসে ও স্টিমারে একদিনের ধাক্কা।

তিনজনের আসন একদিকে। আমার সাত সি, এ থেকে শুরু। গিয়ে জানালার কাছে বসে সিটবেল্ট বেঁধে নিলাম। মীরা ও আলপনা এসে বসল। কুয়াশার মতো

সাদা মেঘগুলো ভীত বেগে ছুটে যাচ্ছে। এক সময় ঝাপসা হয়ে গেল সব। কুয়াশার মেঘ কেটে গেল। দূরে কত রকম মেঘ। স্তম্ভের মতো ওপর থেকে ঝুলে পড়া মেঘ। চাঁদোয়ার মতো। পাতলুনের মতো দু' পাওয়ালা, ভেড়ার লোমের মতো জমাট বাঁধা, পাহাড়ের মতো। হিরোসিমার আণবিক বিস্ফোরণের মতো বিশাল বটগাছ। এলোচুল মেয়ের মতো, নীল জলরাশিতে ঘেরা দ্বীপের মতো। অরণ্যের ডালপালার শীর্ষের মতো। উত্তর সমুদ্রে হাঁ করা সিটাস দৈত্যের মতো আকৃতি নিয়ে একঝণ্ড মেঘ দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের কাছাকাছি মেঘ নেই। মার্তাবান সাগর পেছনে ফেলে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করছি। ইরাবতীর মোহনা সুন্দরবনের মতো, অজস্র মুখ। ঢেউয়ের সাদা বলয়। সুনীল জলরাশি। খিন খিড়া টুনের কাল্পা কানে এলো। ওর দুঃখের কাহিনী সম্পূর্ণ শোনা হলো না। ইংরেজি ও বর্মী ভাষা মিলিয়ে কত কী বলে গেল! সিটউইর কচ্ছপ মুখ নদীর মোহনা ও অসংখ্য দ্বীপ কত সুন্দর। একটি চমৎকার প্যাগোডার চারদিকের চত্বর যেন পানিতে টলটল করছে। নীলচে টাইলস্ বসানো চত্বর হবে, তার চারদিকে সীমানা দেয়াল। পরে প্যাগোডাটি দেখেছি। নাম লোকনন্দা প্যাগোডা।

আকিয়াব ও কুকুরের কাজ

আকিয়াব বিমানবন্দর থেকে সোজা নদীর কূলের সেই ভিউ পয়েন্ট হোটেলে গেলাম। খুব সাধারণ মানের হোটেল। জিনিসপত্র রেখে আবার গাড়িতে উঠলাম। পিলো চান্দা প্যাগোডা দেখা হলো। দেয়াল ও স্তম্ভে কাচের কারুকাজ। প্যাগোডার চারদিকে বিশাল চত্বর। মাথার ওপর উঁচু ছাদ। একপাশে মাইক লাগানো স্টেজ, কাদের যেন অনুষ্ঠান হয়েছিল। বর্মী ভাষায় লেখা ব্যানার ঝুলছে।

চট্টগ্রামী বড়ুয়াদের ক্যাং-এর নাম নোয়া ক্যাং। ৩০০ ঘর বড়ুয়া আছে। পাশে চমৎকার একটু মুচকুন্দ চাঁপা গাছ। মীরা বড়ুয়ার ঠাকুরদা আকিয়াব আসে। সে দশম শ্রেণীতে পড়ে এখন, বাংলা বলতে পারে না জানিয়ে দিল। বর্মী ভাষা ও ইংরেজি বলতে পারে। ওরা বর্মীদের সঙ্গে মিশে গেছে। সবাই লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে। আমাদের আসার খবর পেয়ে অনেক বড়ুয়া মেয়ে এলো। কিন্তু কারুর গায়ে শাড়ি নেই। বর্মী পোশাক ওদের এখন নিত্যসঙ্গী।

লোকনন্দা প্যাগোডার চারপাশ অপরূপ। সূর্য ডুবতে বসেছে। এটিও কিছুটা শোয়েডাগঁ প্যাগোডার অনুকরণে করা, কিন্তু সেই জাঁকজমক নেই। প্যাগোডার চারদিকে বুদ্ধ আছে। তরুণী মেয়েরা বসে প্রার্থনা করছে, রাস্তা দিয়ে দেখেছি দু' তিনজন করে তরুণীরা আসছে প্রার্থনা করতে। এক তরুণীর চুল হাঁটুর নিচে নেমে গেছে। সামনে থেকে দেখে বুঝতে পারি নি। আমাকে অতিক্রম করে যেতেই দেখি

পিঠ থেকে ঝুলে পড়েছে কালো চুলভার। ঘোর কেটে যেতেই ভাবলাম একটি ছবি নেওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি ছবি তুলে নিলাম পেছন থেকে। ওদিকের বর্মী ছোট ছেলেরা হেসে উঠল। সম্ভবত পেছন থেকে ছবি নিয়েছি বলেই। আমার তো পেছনের অলকসম্ভার দরকার। আহা, এজন্যই তো সে চুল খোলা রেখেছে। পেছন থেকে চুল পড়ে লুঙ্গি ঢেকে ফেলেছে। দু'পাশে দুই তরুনী, মাঝখানে সে। না, একবারও সে ফিরে তাকাল না। দরকার কী! আমি তো ওদের খোলা চুলের ফাঁসে আটকে পড়েছি। সাধারণত বেণি বাঁধে না ওরা কেউই। বেণি বাঁধা কুমারী মেয়ে দেখি নি আমি।

সময় দ্রুত কেটে যাচ্ছে। আঁধার নেমে আসছে। লোকনন্দা প্যাগোডায় ঢোকান মুখে উঠোনের বাঁ পাশে মোহা উইয়া (Moha Wyia) ক্যাং। ছোট কিন্তু খুব প্রাচীন বুদ্ধ। কাচের বাস্ত্রে আবদ্ধ দু' ফুট উঁচু বুদ্ধ।

বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে এসে দাঁড়াল এক মাঝবয়সী মহিলা, ফুল বিক্রি করছে। ওর পোশাক সচরাচর বর্মীদের মতো নয়। গায়ের রঙ বাঙালির মতো কালো। জিগ্যেস করতেই বলল সে মুসলিম।

বললাম, তুমি এখানে সবসময় ফুল বিক্রি করো?

বলল, হ্যাঁ।

তুমি তো মুসলিম।

তাতে কি? আমাকে তো কিছু করে খেতে হবে।

তুমি প্যাগোডার ভেতরে যাও?

হ্যাঁ, যাই।

কেউ বাধা দেয়?

না তো। ওদের মতো আমি একদম ভেতরে যেতে পারি। সবাই আমাকে চেনে। আমাকে ফুল বেচতে মানা করে না।

সন্ধেয় ফুল কেন?

হ্যাঁ। নয়তো আসব কেন?

বাঙালি ও বাংলাদেশে বিকেলে বুদ্ধকে ফুল দেয় না। বাতি ও ধূপ দেয়। ওর কাছে ধূপকাঠিও থাকে। মোমবাতিও।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এতে তোমার সংসার চলে?

সে বলল, ওই যে, গেটের মুখে আমার মেয়ে চা বিক্রি করছে।

ছোট্ট মেয়ে আট-দশ বছর হবে। খোলা আকাশের নিচে কেতলি ও কাপ নিয়ে বসেছে। বিস্কুটও আছে। সিগারেট-দেশলাইও দেখলাম।

এক কাপ চা খেলাম। দলের সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আন্তে আন্তে এসে জড়ো হচ্ছে। আঁধার নেমে এসেছে। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম রাত। বিজলি বাতির আলোয় লোকনন্দা মায়াময় হয়ে উঠেছে। বর্মী মেয়েরা প্যাগোডার চারদিকে

পরিক্রম করছে। এতেও পুণ্য হয়। লাল গেলি ও প্যান্ট পরে এক তরুণী এলো, যেন আগুনের শিখা। তরুণী তরুণী। এই বয়সের মেয়েদের হয় নির্মদ শরীর। পিঠে খোলা চুল। কেউ কেউ একা অথবা সঙ্গী-সইকে নিয়ে ঘুরছে। রাতেও এরা নির্ভয়, অন্ধকারে কৌমার্য হারানোর ভয় এদের নেই। মেয়েদের এ এক স্বর্গরাজ্য। ছেলে বন্ধু নিয়েও হাঁটছে। কিন্তু হাত ধরাধরি বা অশালীন কিছু চোখে পড়ে নি। আগুনে-শিখা মেয়েটিকে দেখ, ড. প্রণব বড়ুয়া বলল, খুব মানিয়েছে, তাই না?

গাড়ি চলল সাউথ পয়েন্টের দিকে। ওখানে না গেলে আকিয়াব সম্পর্কে আমার ধারণাই থাকত ঘিনঘিনে নোংরা পরিবেশ আর ঘিঞ্জি এক শহর হিসেবে। আকিয়াবের বনেদি পাড়া। ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। ঘরের চারদিকে প্রচুর জায়গা পড়ে আছে। গির্জাগুলো ছবির মতো ঝকঝকে। গাছপালা ও ফুলে ভরা অঙ্গন। আলো জ্বলছে। এখানে বিজলির আলো থাকে, দশটায় যায় না। বনেদি এলাকার নিয়মকানুন আলাদা। হু-হু ছুটছে গাড়ি। সাউথ পয়েন্টে সমুদ্র ও নদীর মোহনা, শহর আকিয়াবের এটি দক্ষিণ বিন্দু। অনবরত ঢেউ এসে তেঁকোণা কূলে আঘাত করছে। পাড় বাঁধানো, দাঁড়ানোর জায়গাও পাকা। একটি পুরনো দিনের কামান আছে। অবজারভেটরির মতো উঁচু জায়গা আছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে অনেকে। ছবি তুলছে, ফ্লাশ জ্বলছে। পূব আকাশে টিপ হয়ে উঠে এসেছে চাঁদ।

ভিউ পয়েন্ট হোটেলের পাশে আরেকটি হোটেল আছে। তার দু' পাশে দুটি রেস্টুরাঁ। সব ধরনের পানীয়ে ভরপুর। ভিউ পয়েন্টের সামনের ছোট চত্বরে হেলানে চেয়ারে বসেছি। সামনে রাস্তা, তারপর কচ্ছপ-মুখ নদী, বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। নদীর মোহনায় পাহাড়-দ্বীপ আছে কয়েকটি। জ্যোৎস্নায় ওরা ফুটফুট করছে। জ্যোৎস্না তো নয় তরল রূপো, না না ও যে চাঁদের মমতা, না না আমার বান্ধবী এসেছে আকাশ-গাং পাড়ি দিয়ে। চেকটিউ, মহামুনি, কামউদ, উ পঞ্ঞসি, শোয়ে চি মে, সুসান্টো, সুতাউং পাই, কুতুডাও ও শোয়েডার্গ প্যাগোডা ছুঁয়ে জ্যোৎস্না-বান্ধবী এসেছে।

সাড়ে সাতটায় একবার অস্থিরতায় পেল। কী কারণে বুঝতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে হোটলে গেলাম। সিদ্ধার্থ বা দেবাশিষ কেউ নেই। হোটেলের সামনে বাস ও ট্রাক এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে। কাদা এড়িয়ে এগিয়ে এলাম। ওখানে অন্ধকার ও আলোছায়া। সোজা এসে রাস্তায় না উঠে বাঁ দিকে আঁধার পেরিয়ে রেস্টুরাঁয় যাচ্ছি। ওখানে আমাদের দু'-তিনজনকে দেখতে পাচ্ছি, চেয়ারে বসে আছে। ঘণ্টা দুয়েক আগে টিপটিপ বৃষ্টি হয়েছিল, চতুরটা পিছল হয়ে আছে। সতর্ক হয়ে পা ফেলছি। হঠাৎ পেছন থেকে অন্ধকারে কালো কুকুর, মেফিস্তিফিলিসের সাঙাত এসে বাঁ উরুর পেছনে ঘাপ করে কামড় বসিয়ে দিল। সারা শরীর একসঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। ভয় জাপটে ধরল। চিৎকার করে উঠলাম। বুঝতে পারলাম সর্বনাশ হয়ে গেছে। চিৎকারে কুকুর পিছু হটে গেল। দুই

লাফে রেস্টরায় ঢুকে পড়লাম। বাইরের লনে এক বর্মী যুবক বিয়ার খাচ্ছে একা একা। অন্য এক টেবিলে দুই যুবক গ্রাস নিয়ে বসেছে।

সিদ্ধার্থ, প্রদীপ ও দেবাশিস বসে আছে আমাদের স্থানীয় গাইডকে নিয়ে। কামড়ের জায়গায় জ্বালা হচ্ছে। বুঝতে পারলাম দাঁত বসেছে। রক্ত ঝরছে। দেখতে হলে প্যান্ট খুলতে হবে। রেস্টরার তরুণীরা তাকিয়ে আছে। ওদিকে চলছে বিয়ার, পানোৎসব। গাইডকে এক বোতল বিয়ার দিতেই সে তিন চুমুকে শেষ করে উঠে চলে গেল। একবার ইচ্ছে হলো বাথরুমে গিয়ে প্যান্ট খুলে দেখে আসি। বিদ্যুৎ নেই, মোমবাতি টিমটিম জ্বলছে। মালকিনকে বলে বাথরুম খুঁজব নাকি ওভাবেই থাকবে। প্যান্টে দুটো ফুটো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি দশ-পনেরো দিন তো সময় পাচ্ছি, ভেরোরাব ভ্যাকসিন নিতে তো হবেই। সেই কলেজ জীবনে আমাদের গ্রামের বাড়িতে একসঙ্গে আমাদের চার-পুরুষকে কুকুরে কামড়েছিল। ঠাকুমা, বাবা, আমি ও বড়দার ছেলে জিতু। বাবা ডাক্তার। শহর থেকে ভ্যাকসিন এলো। কিন্তু গ্রামে ফ্রিজ কোথায় যে ওগুলো রাখব। খাটের নিচে ঠাণ্ডা জায়গায় কাগজের প্যাকেটে করে রেখে দিয়েছি। প্রতিদিন সকালে বড় জামাইবাবু ডা. প্রীতিপ্রসূন এসে নাভির চারদিকে একে একে ভ্যাকসিন দিচ্ছে এক একজনকে, মোট একশটিতে কোর্স। নাভির চারদিক ব্যথায় ফুলো ফুলো হয়ে গেছে। আমি জানি এখন ফ্রান্সের ওষুধ এসেছে। পাঁচটি নিলেই হয়। হাতে দেবে। সিদ্ধার্থ আহা উহো করল। এমন সময় খবর এলো কালো কুকুরটি আরো একজনকে কামড়েছে। ব্যাস্, ওরা তাকে পিটিয়ে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তার অর্থ কুকুরটা পাগল হয়েছে। ওর শরীরে বিষ ছিল। কিন্তু আমি তো দেখি নি, সত্যিই পাগল নাকি কোনো কারণে ক্ষেপে গেছে। কেউ ত্যক্ত করেছে? আষাঢ় শেষ হতে চলেছে, ওদের এখন রাগ-অনুরাগ ও মিলনপর্ব শুরু হতে চলেছে। ওদিকে অনেক কুকুর ও কুকুরী ঘেউ ঘেউ করছে।

সিদ্ধার্থকে বললাম, হুইস্কি ফরমাশ করো। দোকানের তরুণী এলো। সিদ্ধার্থকে আবার বললাম, জলদি খাওয়াও নয়তো তোমাকে কামড়ে দিতে পারি। সিদ্ধার্থ কৃত্রিম ভয় পাওয়া দেখিয়ে বলল, এক্ষুনি খাওয়াচ্ছি। তরুণী কিছু না বুঝে হাঁ করে গোল গোল চোখে তাকিয়ে দেখল। এমন সময় রোহিঙ্গা কালো যুবকটি এসে পড়লে তাকে চট্টগ্রামী ভাষায় বুঝিয়ে বলল সিদ্ধার্থ। তরুণীকে কথাগুলো সে তর্জমা করে দিল। এক বোতল ৬৫০ চ্যা। আহা, যেন স্বর্গোদ্যানে বসে আছি। প্রায় মুফৎ।

চেয়ারের ওপর ক্ষতস্থান চেপে আছে। জ্বালা করছে। কথাটা বলাও তো লজ্জাকর। কে যেন একবার বলেছিল ধুয়ে আসতে। আরেক টেবিলে এসে বসেছে কণককান্তি বড়ুয়া। ওকে ডেকে নিলাম। কুকুরের কামড়ের খবর শুনে বাপ্ বলে উঠল। ইনজেকশন এটা-ওটা কি করতে হবে এক নিশ্বাসে বলে দিল। আমি মনে

মনে বললাম, হে শাক্যমুনি, তুমি এই অবিশ্বাসীকে যত পার শাস্তি দিও, কিন্তু বেড়ানোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত করো না। আমি তো পাপীতাপী, প্রথাসিদ্ধ ভক্তিশ্রদ্ধা খুব একটা নেই, দানধর্ম খুব একটা করি নি সবার মতো। সোনা-দানা তোমার গায়ে লাগিয়েছি। তুমি তো সব জানো, আমি এসেছি মানুষ দেখতে, পার্শ্ববর্তী দেশটিকে, ধর্ম নয়।

কে যেন বলল কুকুরে কামড়ালে মাংস খেতে নেই। আমি খেয়ে চলেছি, আম, মাংস ও পেয়ালা-ভর্তি আসব। গ্রহের ফেরে দুনিয়াটাই যদি উল্টে যায়, তাই আগেভাগে খেয়ে নিচ্ছি। এরা আম সহযোগে আসব পান করে। পায়ে জ্বালা করছে বলে সবার আনন্দ মাটি করতে চাই নি। আমি আবার ভাবছি সেই চেকটিউতে ডান পায়ের জুতোর পেছনের বেষ্ট খেয়ে ফেলা, অন্য এক রোস্তরায় প্যান্ট কামড়ে ধরা, আর এখানে এসে একেবারে কামড় দিয়ে বসল, এর কোনো নিগূঢ় কারণ থাকা সম্ভব কি?

ভিউ পয়েন্টের সামনে তখন মেয়েদের আসর বসেছে। আকাশে যুবরাজ চাঁদ, তার গায়ের চমৎকার শৌর্য ও সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যেতেই ড. প্রণব বড়ুয়া আঁতকে উঠে চুপ করে গেল। তিনি কুকুরকে তার ভীষণ ভয়। আলপনা, স্মৃতিরেকা, মীরা এক ডজন নিষেধের তালিকা আউড়ে গেল। টক, দুধ, মাংস, ডিম, ইলিশ ও আরো কী কী সব খেতে পারব না। চট্টগ্রামের কোথায় কার কাছে কুকুরের কামড়ের ধমন্তরি ওষুধ আছে বলে দিল। ঘি খেতে হবে বলল। গৌরিদি ব্যাথাভরা চোখে তাকিয়ে আছে। অমিতাদি পান চিবুচ্ছে। প্রীতিদি চুপ। ওরা সবাই জানে আমি পাপীতাপী তাই আমাকে কামড়েছে। ওরা ঠিক ধরেছে। আমাদের ডাক্তার সদস্য কিছু বলল না। বিমলেন্দু বড়ুয়া কী যেন বলতে চাইল। মীরার উদ্বেগ আমাকে সিক্ত করে গেল। কে যেন বলল, তোমাকে বারবার কুকুরে পায় কেন? আমি হাঁফিয়ে উঠলাম। একটু অবাক হলাম এই ভেবে যে কেউ বলল না একবার ডাক্তার দেখানো উচিত বা সে-রকম তাৎক্ষণিক কী কী করা দরকার। সিদ্ধার্থকে নিয়ে উঠে এলাম। হোটেলে গিয়ে ডেটল ও খাওয়ার পানি নিয়ে বাথরুমে গেলাম। সে মোমবাতি নিয়ে এলো। প্যান্ট খুলে ডেটল দিয়ে ঘসে ঘসে ধুয়ে দিল। রসিকতা করতেও ছাড়ল না।

সে বলল, রোস্তরায় কেন ধুলেন না? সুন্দরী মেয়েগুলো ধুয়ে দিত।

বললাম, হ্যাঁ, তাহলে মরলেও দুঃখ থাকত না। তুমি বোধহয় তখন ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েছিলে। আমাকে তাই ওদের বাথরুমে নিয়ে গেলে না।

আমি বললাম, এটা কি কুকুরবর্ষ?

তার মানে?

চীনা ও মঙ্গোল জাতিদের কুকুর, গুয়োর, ড্রাগন ইত্যাদির নামে বর্ষ আছে। তিব্বতিদের হিসাবমতে জল-অশ্ব বর্ষ বা ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম।

সে-রকম কাষ্ঠ-সর্প বর্ষ, দ্রুম-পুরুষ অশ্ব বর্ষ, দ্রুম-মেঘ বর্ষ, লৌহ-মকর বর্ষ, লৌহ-সর্প বর্ষ ইত্যাদির মতো এটিও সম্ভবত সারয়ের-সুবর্ণ বর্ষ হবে। সুবর্ণ হলো গোস্তেন ল্যাভ বা মিয়ানমার। সেখানেই তো আছি। সব নসিব। বদ-নসিব।

সিদ্ধার্থ বলল, আপনার হাতের তুলো দিন। টিপে রক্ত বের করে দেব?

না, রক্ত বন্ধ হয়েছে যখন থাক, ওকে আর জাগিয়ে না। ঘুমুলে কাউকে জাগাতে নেই।

আপনি হোটেলে গিয়েছিলেন কেন? একা একা কীসের লোভে?

তোমাদের খুঁজতে। তোমরা আমাকে ফেলে গেলে বলেই তো আমি একা হয়ে পড়েছিলাম। আর জানো তো একা পেলে পরীরাও মানুষকে পেয়ে বসে, একলা মানুষকে নানাভাবে কাফ্ফারা দিতে হয়।

কিন্তু?

কিন্তু আর কি! মিয়ানমারের পরীতে তো পেল না। তার বদলে মেফিস্তিফিলিসের অনুচর কুকুর। কুকুরটিও কালো ছিল। চোখ ছিল গনগনে। আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল।

অন্ধকারে দেখলেন কী করে? তবে অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলে ঠিকই বলেছেন।

অন্ধকারে ওকে স্পষ্ট কালো দেখলাম। কালোর সম্ভান কালো।

নিন, আমাদের মোমবাতি শেষ হয়ে এলো বলে। প্যান্ট পরে নিন।

ধন্যবাদ, তুমিই একমাত্র দেখলে আমাকে। আরো আগে ধুয়ে নেওয়া উচিত ছিল। লালা ধুয়ে ফেলা, আর যাতে ঘা না হয় সে জন্য সতর্ক হওয়া। আমি সব জেনেও একটু গৌয়ার্জুমি করেছি। কুকুরে ও সাপে কাটা মানুষের কত সেবা করেছি। নিজের বেলায় ভুলে গেছি।

সে হেসে বলল, চলুন রুমে গিয়ে আরেকবার টোস্ট করা যাক। আপনার আরোগ্য কামনা করে নেব। চলুন, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আর এদিকে শুনুন 'কিউপিডে' গান চলছে। রজনী জমছে। উতলা যামিনী। উতল পবনও বইছে।

রেস্তরাঁয় ভাত খেয়ে কিউপিডে এসে বসলাম। দুই বর্মী যুবক। তিরিশোস্তর বলা যায়। একজন যন্ত্রে বসেছে। আমি একা ঢুকে পড়লাম। আমাদের হোটেলের সামনে গাড়িগুলোর দক্ষিণ দিকে একটু আলাদা ছোট হলঘর। সিডি-তে মিউজিক বাজছে আর টিভি পর্দায় ছবি। কণ্ঠ দিচ্ছে এক যুবক। সিডিতে গানসহ মিউজিকও আছে। একটি গান শুনতে ৫০ চ্যা।

টিভি পর্দায় ভেসে উঠল একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা। না, আলিঙ্গন, হাত ধরা বা চুম্বন নেই। কিন্তু গভীর প্রণয় আছে ওদের মধ্যে। মাইক্রোফোন নিয়ে যে যুবক গাইছে তার গলা ভালো। সুর তাল পর্দার সঙ্গে নিখুঁত মিলে যাচ্ছে। পর্দার যুবকের ঠোঁটের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। মনকাড়া সুর। দ্রুত

লয়ের এবং তালের গান। মর্ম বুঝতে পারছি কথা নয়।

দ্বিতীয়-তৃতীয় গানের পর আশা ভোঁশলের গান দিল। না, আশার গান শুনব না। এ সময় সিদ্ধার্থ ও দেবাশিস এলো। না, মিয়ানমারের এসে হিন্দি গান শোনার মানে হয় না। বর্মী দ্রুত লয়ের প্রেম-গান চাই। তাই হলো। আরো পাঁচটা শোনার পর দশটা বাজতে চলল ওরা থামল। কিউপিডের মালিকের সঙ্গে কথা হলো। দু' জনের মধ্যে একজন মালিক। বার্মায় এ রকম স্টুডিও বা হলঘর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখানে ছায়াছবিও দেখায়। দর্শকদের পছন্দমতো গান শোনায়ে। সঙ্গে দর্শকরা নাচে। যেন ক্যাবারে নৃত্য। তরুণ-তরুণীরাই এর আসল শ্রোতা। অনাবিল আনন্দ। দশটায় সাধারণত বন্ধ হয় না। আজ শ্রোতা কম বলে একটু আগে বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তো গানের অর্থ বুঝতে পারছি না। তবে মালিক-যুবক গানের কলিগুলো ইংরেজি করে দিয়েছিল। সুন্দর লিরিক। ভালোবাসার, মিলনের। বিরহের একটিও নয়। এটি বর্মী প্রেম-গানের বৈশিষ্ট্য। বিরহের গান ঐতিহ্যগতভাবে খুব কম।

এবার ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন তো ঘুরলাম দেখলাম। এদিকে বিচ্ছেদের ঘন্টা বেজেই চলেছে। আর মাত্র দুটি রাত আয়ু, জীবন্ত মানব পরীর দেশ ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাব, যেখানে নারী স্বাধীনতা তো বটেই, পুরুষের স্বাধীনতাও বিপজ্জনক প্রাপ্তসীমায়। পাগলা কালো কুকুরের কামড় হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। খিন খিড়া টুন ও পামেলা বড়ুয়া হানা দিয়ে গেল ঘুমের আগে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে পামেলা বলল, কোথায় তোমার কষ্ট? সময়মতো ভেকসিন নিও। ইয়াঙ্গুনে হলে আমিই সব ব্যবস্থা করতাম।

মনের মানুষকে কখনো পাবে না

৬ জুন, স্টিমারে ফেরা।

উ খিঅ টুন সেইন (U Kyaw Tun Sein) করিরাজি ওষুধের পরিবেশক। ওর কোম্পানির নাম শিন হোপ কোম্পানি লি। বয়স ৬০। দেখে মনে হয় সত্তরোর্ধ্ব। হাত দেখতে জানেন। স্টিমারের তিন তলায় সারেংয়ের পাশে বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছেন। গিয়ে পাশে বসলাম। কথা শুরু হলো। রাখাইন। কক্সবাজার গেছেন। কোনোমতে চট্টগ্রামীতে কথা বলতে পারে। সকাল সাড়ে নয়টা। এরি মধ্যে চৌ সেতু পার হয়ে গেলাম। এটি একমাত্র সেতু এই নদীর উপর।

এটা-ওটা কথা বলতে হাত দেখার প্রসঙ্গে এলাম। প্রথমে দেখল সিদ্ধার্থকে। বলল, তুমি অফিসে সবচেয়ে বড় কর্তা হবে। একজন রোহিঙ্গা ছেলেকে দোভাষী নিলাম। উ খিঅ বলল, হাত দেখার জন্য দরকার ভাষা। একজনের প্রশ্ন আরেকজন

না বুঝলে খুব অসুবিধে। সিদ্ধার্থ বলল, কী করে হবে? আমার পক্ষে আমার অফিসের প্রধান হওয়া খুব কঠিন। অত জনকে ডিঙিয়ে যাব কী করে! উ থিঅ বলল, হবে, তোমার উপরে আর কেউ থাকবে না। তারপর সম্ভবত দুটি বউয়ের কথা বলল। কিন্তু কী আশ্চর্য! তিন মাস পরে সিদ্ধার্থের সঙ্গে ঢাকায় যখন দেখা হলো তখন জানতে পারলাম চাকরি ছেড়ে দিয়েছে এবং একটি চার্টার্ড একাউন্টেন্সি ফার্মের সে প্রধান হয়ে বসেছে। আমি তো অবাক!

দেবাশিসকে বলল, তুমি জল নিয়ে কারবার করবে। সেই সম্পর্কিত ব্যবসায় তোমার উন্নতি। জল বলতে জাহাজ, মৎস্য ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝায়। নুন তুলে ব্যবসা করাও বোঝায়।

আমি না না করেও হাত মেলে দিলাম।

প্রথমেই বলল, যাকে তুমি বেশি ভালোবাসো তাকে তুমি পাবে না, কোনোদিন না।

বলল, তুমি তো মানুষের মন বেশি বোঝ। মেয়েদের মন নিয়ে তোমার লেখায় উন্নতি। তারপর গার্ডেন অব ভেনাস রেখাটি দেখিয়ে বলল, তোমার অতি আদরের মেয়েটি কোনোদিন তোমার হবে না, তুমি তাকে পাবে না। সে তোমার থেকে অনেক দূরে থাকে। এই যে রেখাটি (গার্ডেন অব ভেনাস) ভালো নয়। সেটি তোমাকে তোমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলতে দেবে না।

আবার অনেক চিন্তা করে বলল, দুর্ঘটনায় তোমার মৃত্যু নেই।

দেহিতে তোমার যশ, কীর্তি ও উন্নতি।

যা করো তার দাম পাবে পরে। অনেক পরে।

আর তুমি কারো কথা শুনে চলো না। এটি তোমার স্বভাবধর্ম।

কী আশ্চর্য! লোকটি আমাদের সম্পর্কে কিছু জানে না, অথচ দিব্যি এতসব কথা বলে দিল? মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি যাকে খুব ভালোবাসি তাকে কোনো দিন পাব না? কাকে আমি এত ভালোবাসি? দেহিতে উন্নতি? আমি ভাগ্য ও হস্তরেখায় বিশ্বাসের সীমায় ঝুলতে লাগলাম।

মন ভালো নেই। মন পড়ে আছে ইয়াঙ্গুন-মান্দালয়-মিথিলার পথে পথে। টুনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সেই ছবি বিক্রেতা দুই বোন, বুদ্ধ বিক্রেতা ইংরেজি জানা মেয়েটি আর স্বপ্নে স্বপ্নে পাওয়াটুকু। যতই সামনে এগুচ্ছি সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কেবিন বাইরের লোকজন এসে দখল করে নিয়েছিল। স্টিমার কর্তৃপক্ষ তাদের বের করে দিয়েছে। মা থি ডা নামের মহিলা এক সরকারি কর্মচারীকেও বের করে দিতে চেয়েছিল। আর এক তরুণ দম্পতি ও কোলের বাচ্চাটিকেও স্টিমার কোম্পানির লোকও বের করে দিতে চায়। আমি বললাম, ওরা থাকুক না। কোনোমতে হয়ে যাবে। দলের কতজনের কত মত। আমাদের জন্য কেবিন রিজার্ভ, কেন ওরা থাকবে ইত্যাদি। আমি চোখ বুজে বলে দিলাম, সুন্দরী

সহযাত্রী থাকাও তো আনন্দের। সবাই হেসে এবং আমার প্রতি এক রাশ সন্দেহ ও ঘৃণা ছড়িয়ে উস্কানিমূলক কথা বলে চুপ করে গেল। প্রণববাবু আমাকে সমর্থন করল কেন জানি না। অন্যেরা দু'-একবার অবোধ্য কি যেন বলে বলে থেমে গেল। কে একজন বলল, ও-তো ধর্ম করতে আসে নি। এজন্য কুকুরে...। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, তাই তো!

আমিও জানি ধর্ম আমাকে গ্রাস করতে পারে নি, কামড়াতেও পারে নি। কিন্তু কুকুর তো জাগতিক, তার কামড় ইনজেকশনে যায়, ধর্মের কামড় ইনজেকশনে যায় না, কোনো ওষুধ নেই। আমি ড্রাইভারকে সমর্থন করি, গাইডদের কেউ বিদ্রূপ করলে প্রতিবাদ করি, ম্যাও-কে গলা বিকৃত করে ডাকলে নিষেধ করি, দলের কিছু অলিখিত নিয়ম থাকে তা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিই। এতে একে একে প্রায় সবাই আমাকে ভালো চোখে দেখে না বুঝতে পারি। মহাথেরো তবুও কেন যে আমাকে কাছে কাছে ডেকে নেন বুঝি না। তবে তিনি এখন ঢাকায় পৌঁছে গেছেন। তবুও আমার কাছে এ এক আশ্চর্য ভ্রমণ বলতে দ্বিধা নেই। পথের কষ্ট, বাসের পেছনের আসনে বসা, হোটেলে যেমন-তেমন একটা কামরা বরাদ্দ হওয়া, কিছুতেই আমার মনের জোর ও আনন্দ কমে নি। কমেছে ভাগাভাগি, ভালো আসন নেওয়ার প্রতিযোগিতা, ভালো খাবার আগে খেয়ে নেওয়া, ধর্মশালায় ভালো থাকার জায়গাটি জ্বর-দখল নেওয়া দেখে। রীতি অনুযায়ী সবসময় প্রার্থনায় বসি নি, বসলেও প্রার্থনা না করে চোখ বুজে থেকেছি অথবা বুদ্ধের দৈহিক সৌন্দর্য খুঁটে খুঁটে দেখেছি, প্যাগোডার ভেতরের কারুকার্য যতখানি সম্ভব দেখে নিতে চেষ্টা করেছি, ছবিতে ধরে রাখতে চেয়েছি। মনের অনুভূতি যথাসম্ভব নোট করে বা অনুভব করে নিয়েছি। ধর্মের চেয়ে আমার মনকে অন্য কাজে আমি বেশি প্রশ্রয় দিয়েছি। আমার কষ্ট হয়েছে দীর্ঘ ৪৯ ঘণ্টার ভ্রমণে সিদ্ধার্থ, দেবাশিস, পুলকের মতো গাড়ির পেছনে বসতে, যাওয়ার সময়ও পেছনে বসেছি। তবু সে-সব কষ্ট আমাকে রুষ্ট বা রাগাতে পারে নি, হীনমন্যতায় পায় নি। আমি আনন্দকে অনেক বেশি লুট ও গ্রাস করে নিতে চেষ্টা করেছি। করতে চেয়েছি চিরসঙ্গী এবং সুখ-স্মৃতি। অনেক কথা লিখি নি, লিখতে পারি নি। আমার নিজের দীনতা ও দোষ তো কম নয়। সে-সব আমার সঙ্গীরা দেখেছে। অনেক কিছু নোট করা হয় নি। একসঙ্গে এত দেখা মনে রাখা খুব কঠিন, তার ওপর একের সঙ্গে অন্য ঘটনা এবং আগুপিছু হওয়া—তারপরও ওরা সকলে একসময় অমৃতবৎ মৃতসঞ্জীবনী হয়ে গেছে।

মিয়ানমারের কুমারী-হৃদয় এক চঞ্চল, রঙিন ও মায়াবি অধরা; সে এক বনের হরিণী, ছেলেবেলা থেকে ছিল আমার মনের গভীরে এতদিন। সে দেখতে দেখতে পালিয়ে বেড়ায়, পালিয়ে যেতে যেতে ধরা দেয় অমানবী বিভ্রমে, বন্ধন থেকে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়ে আবার আহ্বান জানায় ছোঁয়া দেবে বলে—সে আমার স্বপ্নবাস্তবতা, বাসনা-বিস্ময় স্নিগ্ধ মায়া-জ্বর।

জাহাজ চলল। আকিয়াব থেকে ভুচিদং। সেখান থেকে মংডু। মংডু মানেই ঘরে চলে আসা, নাফ নদীর এপারে বাংলাদেশ। মংডু অপরিচ্ছন্ন একটি বড় বাজার, চট্টগ্রামী রোহিঙ্গাও রাখাইন-বর্মীদের গঞ্জ। সেই যে প্রথম দিন আলো-আঁধারিতে তার হৃদয় একটু ছুঁতে পেরেছিলাম—আর তেমন করে পাই নি। দু’ দিন পরে খুব ভোরে মংডু থেকে ভুচিডং যাওয়ার সময়ও তার সৌন্দর্যের কণাটুকু চকিতে উছলে উঠেছিল। সৌন্দর্য ও আনন্দ বোধ করি এ রকম ক্ষণস্থায়ী। এমন ক্ষণিকের টুকরো টুকরো আনন্দ কম জমে নি, ব্যথা-বেদনাও তার ফাঁক-ফোকর ভরে তুলেছিল।

মংডু থেকে সেদিন সকালে যখন বোটে উঠেছিলাম তখন ছিল ঘরে ফেরার আনন্দ ও মিয়ানমারের জীবন্ত স্মৃতিগুলো বুকে বহন করার দুঃসহ আনন্দ, নাকি বেদনাও ছিল? বেদনা ছিল। ছেড়ে আসার বেদনা। এত বাধ্যবাধকতার মাঝেও অন্যরকম এক সুখ ছিল। এমন আতিথেয়তা, এত সম্মান কে আর দেবে? গরিব দেশের মানুষ আমি, মিয়ানমারও গরিব দেশ। কিন্তু ওদের জনসংখ্যা কম বলে বাড়তি অনেক সমস্যা থেকে তারা মুক্ত। অন্তর ভালো তাদের। আনন্দকে সঙ্গী করে জীবন কাটিয়ে দেয়ার প্রবণতা আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এটি তাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, খুব বড় সম্পদ। এখনও তাদের মধ্যে এই সম্পদ আছে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এজন্য ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট হয়েছে। কারণ, এই সম্পদ আমরা অর্জন করতে চেষ্টা করি না, এক সময় আমাদের মধ্যে এর ছিটেফোঁটা ছিল, সেই তলানিটুকু হারিয়ে এখন আমিও হতসর্বস্ব।

বিদায় অপরূপ মিয়ানমার।
